
একটি
প্রত্যাশার
উন্মেষ
এ কে এম হারুন আল রশিদ

একটি প্রত্যাশার উন্মেষ

এ কে এম হারুন আল রশিদ

এই বইটি একজন রেড ক্রস-রেড ক্রিসেন্ট কর্মীর আত্মকথা। মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্ত্র তুলে নিলেও পরিস্থিতির কারণে তিনি তদানীন্তন আন্তর্জাতিক রেড ক্রস-রেড ক্রিসেন্টের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং ভয়াবহ যুদ্ধের সময় যুদ্ধাহত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তিনি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের হৃদয়বিদারক স্মৃতিকথা এবং উপকূলীয় বিপদাপন্ন মানুষের প্রস্তুতি ও প্রশমনের নানা সমাধানের কথা লেখকের লেখায় সাবলীলভাবে উঠে এসেছে। স্বেচ্ছাসেবার প্রেরণা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মনোবাসনার কথা লেখক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

পুরোটা বইতে বিধৃত একটার পর আরেকটা ঘটনা পড়তে পড়তে পাঠক আনন্দ বোধ করবেন, কখনো বিস্মিত হবেন আবার বেদনার্তও হবেন। একটা গভীর দায়বদ্ধতা নিয়ে কি ভাবে একজন যুবক ঐ সময়ের বিরূপ পারিপার্শিকতার মধ্যেও মানবসেবার অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেছেন সেই সন্ধানও মিলবে এই বইতে।

একটি প্রত্যাশার উন্মেষ



এ কে এম হারুন আল রশিদ

একটি প্রত্যাশার উন্মেষ

এ কে এম হারুন আল রশিদ

প্রকাশ কাল:
ভাদ্র ১৪২৮, অক্টোবর ২০২১

প্রকাশক:
শামীম আরা
মগবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ:
আবুল হাশিম

বর্ণ বিন্যাস ও অলংকরণ:
শেখ মাহ্‌তাব আহমদ

মুদ্রণ:
শব্দকলি প্রিন্টার্স
নীলক্ষেত, ঢাকা

মূল্য: টাকা ৩০০

আই.এস.বি.এন. ৯৭৮-৯৮৪-৩৫-১২৩৫-২

Ekti Prottashar Unmesh by A K M Harun Al Rashid
Published by Shamim Ara, Moghbazar, Dhaka
ISBN: 978-984-35-1235-2
Price: Taka: 300, US$ 15

জীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু
আমার মা ও বাবার
অকৃত্রিম ভালবাসায় সিক্ত
আমার হৃদয়–আমার অস্তিত্ব ।

তাঁদের প্রতি নিবেদিত আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি

সূচি

প্রাসঙ্গিক কথা

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) একটি প্রাণবন্ত ও গতিশীল মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বাস্তবায়নের প্রথম দিন থেকেই এই কর্মসূচির সাথে আমার সম্পৃক্ততা। অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে এর কার্যকর বাস্তবায়নের পথে সচল রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গতায় সিপিপি-র সাথে আমি নিবিড় ও মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছি ।

আমার নিজের কাছে নিজের অঙ্গীকার ছিল যে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করবো। এই প্রসঙ্গটি সহকর্মীগণ মাঝে মধ্যেই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। চলতি বছর জুন মাসের শেষের দিকে আহমাদুল হক ভাইয়ের সাথে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে কথা প্রসঙ্গে তিনি সিপিপি-র অভিজ্ঞতা নিয়ে বিস্তারিত কিছু লেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

এরপর সিপিপি নিয়ে কিছু লেখার প্রতি আমি মনোযোগী হলাম। সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার অসীম রহমতে বিগত তিন মাসে পাণ্ডুলিপিটি সমাপ্ত করতে সমর্থ হলাম।

পুস্তকটির প্রথমাংশে মুক্তিযুদ্ধের কথা বিধৃত হয়েছে কারণ মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম আর সিপিপি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম একই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা না বললে সিপিপি-র ঐ সময়ের ইতিহাস বর্ণনা পূর্ণ হবে না।

মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা আমার স্মরণে না থাকলেও আমি ঐ সময়ের সহকর্মী জাপানিজ রেড ক্রস ডেলিগেট মিঃ তাদামাসা ফুকিউরার লিখিত ‘চি-তো দোরো-তো’ নামক বইয়ের বাংলা তরজমা প্রথমা প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত ‘রক্ত ও কাদা’ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি। সিপিপি-র অনেক কথা রয়েছে যা এই বইতে বলা হয়নি, আশা করবো আগামীতে যারা সিপিপি নিয়ে লিখবেন তাঁরা সেই অভাব পূরণ করবেন।

পরিশেষে, আমার এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নকালে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে সার্বিক সহযোগিতার জন্য শ্রদ্ধেয় সাইদুর রহমান, তাদামাসা ফুকিউরা, রফিকুল আলম, গোলাম রব্বানী, রফিকুল ইসলাম, খন্দকার আব্দুল হক, রুহুল আমিন প্রমুখ মানব দরদীদের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পুস্তকটির বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণের জন্য স্নেহপ্রতীম শেখ মাহ্তাব আহমদ এবং প্রচ্ছদ রূপায়নের জন্য আমার দীর্ঘদিনের সুহৃদ শিল্পী আবুল হাশিমের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পাঠকবৃন্দের কাছে বইটি সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

এ কে এম হারুন আল রশিদ
৮ অক্টোবর ২০২১

রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটিতে যোগদান

১৯৭০ সালের কথা। নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ। দেশের উপকূলীয় এলাকার উপর দিয়ে প্রলয়ংকরী এক ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। 'ভোলা সাইক্লোন' নামে খ্যাত ঐ ঘূর্ণিঝড়ে পাঁচ লক্ষেরও অধিক মানুষের প্রাণহানীসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ সহায় সম্বল হারিয়ে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ঝড় পরবর্তী সময়ে প্রাণহানীর সংখ্যা দশ লক্ষ ছিল বলে অনেকেই বিবৃতি দিলেন। ঐ সংবাদ শুনে আমি ভীষণ মর্মাহত হলাম। তখন সবেমাত্র কলেজ জীবনের পাঠ সমাপ্ত করে সাময়িক সময়ের জন্য আমার প্রিয় শহর মানিকগঞ্জের সন্নিকটে একটি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছিলাম। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এরই মধ্যে শহরের সন্নিকটে তরা ঘাট বরাবর কালীগঙ্গা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ কোম্পানির অধীনে আমার আরো একটি চাকুরির সংস্থান হলো। রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত গ্রেভইয়ার্ড শিফ্‌টে টাইম কিপারের চাকুরি। একই সাথে ঐ দুটি চাকুরি সম্পাদন করতে আমার নিত্যদিনের অনেক অভ্যাস পরিবর্তন করতে হলো। তখন বুঝিনি যে দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আমার জীবনের দীর্ঘ একটা সময় অতিবাহিত হবে।

প্রলয়ংকরী 'ভোলা সাইক্লোন' সংঘটিত হবার মাত্র তিন সপ্তাহ পর ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পরও শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনে বাঁধা দেয়ার মাধ্যমে এই ভূখণ্ডের মানুষের প্রতি পশ্চিমাদের অবহেলো ও বঞ্চনার ভয়াবহ চিত্রটি চূড়ান্তভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। পাকিস্তানের মোট ৩০০ আসনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। কিন্তু পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি মাত্র ৮১টি আসন পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনে বাঁধা প্রদান করে চললো। বাঙ্গালীদের স্বতঃসিদ্ধ ও ন্যায্য দাবীর প্রতি অসম্মান জানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অন্যায্য স্বার্থসাধনে অনঢ় থাকলো। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পশ্চিমাদের এহেন বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো।

অভূতপূর্ব এক উত্তেজনার মধ্যে সময় অতিবাহিত হতে থাকলো। একসময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটা সঙ্কটময় মুহূর্তে এসে দাঁড়ালো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং গণহত্যার নির্মমতায় মেতে উঠলো। অন্যায়ের প্রতিরোধে গর্জে উঠলো বাংলার মানুষ। শুরু হলো সশস্ত্র সংগ্রাম – আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ।

এই পরিস্থিতিতে স্কুল বন্ধ ঘোষিত হলো এবং তরা ব্রিজের কাজও অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিত্যক্ত হলো। আমার অন্যান্য বন্ধুদের সাথে একাত্ম হয়ে আমিও রাইফেল হাতে তুলে নিলাম। ক্যাপ্টেন হালিমের নেতৃত্বে আমরা দল গঠন করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। অবশ্য অস্ত্র বলতে একটা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল এবং পাঁচ রাউন্ড গুলি। এই অবস্থায় মাত্র কয়েকদিন পরই আমাদের অস্ত্রাদি ফেরত নিয়ে মুক্তি বাহিনীতে যোগদানকারী সেনা ও বিডিআর সদস্যদেরকে তা প্রদান করা হলো। আমাদেরকে বলা হলো যে ‘যুৎসই প্রশিক্ষণ নিতে পারলে আমাদেরকেও অস্ত্র দেয়া হবে’। উপায়ন্তর না দেখে তীর ধনুক বানাতে উদ্যোগী হলাম। আমার বন্ধু খোরশেদ আলম চৌধুরী লাবলু, খন্দকার জামান, মোঃ সিরাজ উদ্দিন, মাহমুদ আক্তার ময়না, সাহাগীর, শাখাওয়াত হোসেন বাচ্চু, আমার ছোট ভাই ফিরোজসহ আরো অনেকে আমার সহযোগী হলেন। কয়েকদিনের পরিশ্রমে পঞ্চাশ-ষাটটা উন্নতমানের ধনুক ও কয়েকশত তীর তৈরী করে ফেললাম। তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমরা ধনুকগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নিলাম।

এরপর একদিন আমরা চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটি দল তীর-ধনুক হাতে শহরে মিছিল করলাম। অনেকে আমাদেরকে তাচ্ছিল্য করে নানা ধরনের মন্তব্য করলো। প্রশিক্ষিত একটি সেনা বাহিনীর সাথে তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ? অনেকেতো বাঁধভাঙ্গা হাসিতে একবারে যেনো ফেটে পড়লো। আবার অনেকে আমাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে বললো, “সাবাস দামাল ছেলেরা, তীর-ধনুক হয়েছেতো কি হয়েছে, এতে উদ্দামতা ও দৃঢ়তার যে উপমা তোমরা দেখিয়ে দিলে তার মধ্য দিয়ে আগামীর আলো ঝলমল কাঙ্খিত একটা দিনের আভাসতো পাওয়াই যাচ্ছে”।

এরপর এপ্রিলের ৯ তারিখে যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের শহরে প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে তাদের নির্মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটালো তখন ব্রীজ নির্মাণ কোম্পানীর কর্মচারীদের বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য আমি তরা ঘাটে অবস্থান

করছিলাম। আমার মরহুম পিতা প্রমাদ গুনলেন এবং অনেক যত্নে তৈরী করা আমার সমুদয় তীর-ধনুক পুড়িয়ে ফেললেন। কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে পারলাম যে, পাকিস্তান বিরোধীদের তালিকা তৈরী হচ্ছে; ফলে আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চলাফেরা করতে হচ্ছিলো। আমাদের বাড়ীটি ছিল শহরের দক্ষিণে কালীগঙ্গা নদীর অতি সন্নিকটে। বাড়ীর পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে গ্রামীণ পরিবেশ ও ফসলের ক্ষেত থাকায় জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপদে লুকিয়ে থাকার জায়গার অভাব ছিলনা। তদুপরি গ্রামে-গঞ্জে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে লুকিয়েও থাকতে হলো বেশ কিছুটা সময়। এরই মধ্যে কয়েকটা মাস কেটে গেলো। অনেকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারতে পাড়ি জমালো। আমিও ভারতে যাওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম।

এমনতর পরিস্থিতির মধ্যে একদিন আমার বন্ধু খোরশেদ আলম চৌধুরী ওরফে লাবলু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাকে জানালো যে, পূর্ব পাকিস্তান রেড ক্রসের ঢাকা অফিস থেকে জরুরিভিত্তিতে কয়েকজন কর্মকর্তা নিয়োগের একটি বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে এবং আমরা সেখানে চাকুরির জন্য আবেদন করতে পারি। বিষয়টি আমার পিতা অত্যন্ত ইতিবাচক হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে আমাকে বললেন যে, দেশের বর্তমান ক্রান্তিকালে যুদ্ধতো শুধুমাত্র অস্ত্র দিয়ে হবেনা। এই যুদ্ধ নানামুখী ও বিভিন্ন ভাবে করতে হবে, অস্ত্র নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রেই যে যেখানে কাজ করছে সবাই মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করবে এটাই এই সময়ে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সুতরাং তুমি ঢাকা যাও এবং চাকুরিটা পাওয়ার চেষ্টা করো। আমার পিতার বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পেলাম। সম্মতি জানানের পর আমার বন্ধুটি যারপর নাই খুশী হলো।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ঐ সময়ে বাসে করে ঢাকা যাওয়ার সময়ে গাবতলী ও মিরপুরে বাস থামিয়ে বিহারীরা বাঙ্গালীদের নির্যাতন করতো এবং কখনো কখনো বাস থেকে তুলে নিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালাতো। আমরা ভয়ে ভয়ে গাবতলী পার হয়ে সেগুনবাগিচায় পূর্ব পাকিস্তান রেড ক্রসের প্রধান অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। আবেদন পত্র লিখে জমা দিয়ে আমার এক ছোট বোনের বাসায় রাত্রিযাপন করলাম। পরদিন আবার অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আমাদেরকে ডাকা হলো। তখন বুঝতে পারলাম যে চাকুরির প্রার্থী হিসাবে

আমরা দুজন ছাড়া আরো সাত-আট জন রয়েছে। একসময় আমার ডাক পড়লো। ইন্টারভিউ বোর্ডে ইষ্ট পাকিস্তান রেড ক্রসের উচ্চ পদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তা ছিলেন। অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্যে কেন রেড ক্রসের চাকুরিতে আগ্রহী হলাম তা জানতে চাইলে জবাবে আমি রেড ক্রস সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম, কারণ বিষয়টি আমার জানা ছিলো। মোটকথা, আমাকে যে কয়েকটি প্রশ্ন করা হলো আমি অত্যন্ত গুছিয়ে সবগুলোর উত্তর সঠিকভাবে প্রদানে সক্ষম হলাম। এরপর আমার বন্ধু লাবলুর পালা। কতক্ষণ পর ফিরে এসে সে বললো যে তাঁর ইন্টারভিউ ভালো হয়েছে।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হলো। আমরা দুজন অফিস থেকে বাইরে গিয়ে চা-নাস্তা খেয়ে নিলাম। দুপুরের পর আমাদের মধ্য থেকে মাত্র চারজনকে ডাকা হলো। আমি ও আমার বন্ধু দুজনই টিকে গেছি দেখে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা ছাড়া বাকি দুজন হলেন কে, জে, আহম্মদ ও মোঃ খালেদ। আমাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে বলে জানানো হলো এবং বলা হলো যে চাকুরিটি সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী ও সাময়িক। আগামী দু একদিনের মধ্যে আমাদেরকে মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণে যেতে হবে জানিয়ে পরদিন সকালে অফিসে আসার জন্য বলা হলো।

পরদিন সকালে আমরা চারজন যথারীতি অফিসে হাজির হলাম এবং আমাদেরকে একটা প্রশস্ত রুমে নিয়ে বসানো হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই রেড ক্রস ব্যাজ পরিহিত কয়েকজন বিদেশী নাগরিক রুমে প্রবেশ করলেন। মানবতার সেবায় নিবেদিত রেড ক্রসের কাজে যোগদানের জন্য আমাদেরকে স্বাগত জানানো হলো। পূর্ব পাকিস্তান রেড ক্রসের অর্গানাইজার এমদাদ হোসেনের সঞ্চালনায় ওরিয়েন্টটেশন ও আলোচনা শুরু হলো এবং বিদেশীরা বক্তব্য রাখলেন। রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের নীতিমালা ও এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করা হলো। এরপর উপকূলীয় এলাকায় বিগত ১২ নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ কার্য সম্পাদনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই আমাদেরকে উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন স্থানে জরিপ কার্য সম্পাদনের জন্য সফরে যেতে হবে বলে জানানো হলো। এভাবে পর পর দু দিন আমাদের ওরিয়েন্টেশন চললো।

রেড ক্রস সোসাইটিতে আমার চাকুরির প্রারম্ভকাল

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ যখন সকল বাঁধা অতিক্রম করে একটি ইতিহাস রচনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৯ তারিখে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটিতে ফিল্ড অফিসার হিসাবে আমাদের যোগদান সম্পন্ন হলো।

সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত আমরা চারজন কর্মকর্তা দ্রুততার সাথে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে নানাবিধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর তদানীন্তন লীগ অব রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (এলওআরসিএস) বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এণ্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি) এর কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়টাতে এলওআরসিএস এবং আইসিআরসি-এর বহুসংখ্যক বিদেশী ডেলিগেট ঢাকায় তাঁদের মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এই কার্যক্রমের মধ্যে ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানের জন্য এলওআরসিএস এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জনগণের সহায়তার জন্য আই সি আর সি তাঁদের নির্ধারিত কার্যক্রম ও তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের জনৈক ডেলিগেট আমার যোগদানের প্রথম দিনই আমাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে তাঁর সাথে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমি কোনপ্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাঁর সাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করলাম। সন্দিহানমুক্ত তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর মিশন সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল করলেন। তখনই প্রথম জানতে পারলাম যে ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের পর ব্যথিত বিশ্ববিবেকের শুভেচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অনুরোধক্রমে তদানীন্তন লীগ অব রেড ক্রস এণ্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ কর্তৃক বাংলাদেশের উপকূলীয় লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রস্তুতিমূলক একটি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে এবং এটি বাস্তবায়নের পুরধা হিসাবে রয়েছেন মিঃ ক্ল্যাস হেগস্ট্রম যিনি আমাকে তাঁর সাথে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছেন।



লীগ অব রেড ক্রস এণ্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ এর ডেলিগেট ক্ল্যাস হেগস্ট্রম

ছেলেবেলা থেকেই আমি এতদিন উপকূলীয় এলাকার সাগর সৈকতে অবস্থিত হাতিয়া, মনপুরা, সন্দ্বীপের নাম শুনে এক ধরনের রোমাঞ্চকর অনুভূতির মুখোমুখি ছিলাম, এখন এই পরিস্থিতিতে হেগস্ট্রমের প্রস্তাবে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

নির্দেশনামূলক ওরিয়েন্টশনের পর উপকূলীয় এলাকার দিকে আমাদের যাত্রা নির্ধারিত হলো। হাইস্পিড নেভিগেশনের কয়েকটি বড় মোটর লঞ্চ পূর্বেই ভাড়া করা হয়েছিল; যার বেশীরভাগই উপকূলীয় এলাকায় ত্রাণ বিতরণের কাজে নিয়োজিত থাকবে বলে জানলাম। এর মধ্যে একটি লঞ্চ হেগস্ট্রমের জন্য নির্ধারিত ছিল। যাত্রার দিন আমি এবং আমার বন্ধু লাবলু সকাল আটটায় সদরঘাটে এসে হাজির হলাম।

হেগস্ট্রমও সময়মতই চলে এলেন। আমার সাথে থাকা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটি বস্তা লাবলুর সহায়তায় ধরাধরি করে লঞ্চে তুলে ফেললাম। এই খাদ্যসামগ্রী হেগস্ট্রমের নির্দেশেই ক্রয় করা হয়েছিল। স্থানীয় রেড ক্রসের পক্ষ থেকে জনাব এমদাদ হোসেন সফরের খুঁটিনাটি বিষয় তদারকি করছিলেন। কিছুটা সময় পর আরো দুজন ডেলিগেট আমাদের সাথে যোগ দিলেন। তাঁরা মূলতঃ ত্রাণ কাজের জন্য আমাদের নির্ধারিত এলাকা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করবেন এবং এটা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল যে আমার বন্ধু লাবলু ঐ দুজন ডেলিগেটের কাজে তাঁদেরকে সহায়তা প্রদান করবেন।

সকাল নয়টা বাজার পূর্বেই আমাদের লঞ্চের সারেং উপকূলের দিকে যাত্রার আয়োজন চূড়ান্ত করলেন। মানবিক ও মহৎ এক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য হেগস্ট্রম আমাদেরকে নিয়ে 'তিলোত্তমা' নামের লঞ্চটিতে চেপে উপকূলীয় এলাকার দিকে ধাবিত হলেন। সঠিক তারিখটি স্মরণে না থাকলেও নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকের (সম্ভবত ২২ সেপ্টেম্বর) সেই শুভক্ষণটিই ছিল ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ। বুড়িগঙ্গার স্বচ্ছ পানি বয়ে চলেছে অবিরাম। তরতর করে এগিয়ে চলছে আমাদের লঞ্চ। আকাশে মেঘের আনাগোনা থাকলেও সূর্যের উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত চারিদিক।

হেগস্ট্রম একটা আরাম কেদারা নিয়ে লঞ্চের ডেকে বসে সিগারেট টানছেন আর নদীপারের সকালের দৃশ্য উপভোগ করছেন। আমিও রেলিং ধরে প্রকৃতির দৃশ্যপট উপভোগ করছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে তাঁর পাশে বসার জন্য বললেন।

একটা চেয়ার নিয়ে আমি তাঁর পাশে বসলাম। এরপর তিনি আমাকে শুধালেন যে আমি এর পূর্বে কখনও উপকূলীয় এলাকায় সফর করেছি কিনা? আমি না সূচক জবাব দিলাম। মাত্র দশ মাস পূর্বে ১২ নভেম্বরে সংঘটিত বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হলে আমি যা শুনেছি এবং জেনেছি তাই বললাম। এরপর হেগস্ট্রম ঘূর্ণিঝড়ের গতি-প্রকৃতি, এর ধ্বংস-ক্ষমতা এবং উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের বিপদাপন্নতা সম্পর্কে সবিস্তারে আমাকে অবহিত করলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বপর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় আমাদের কাজ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা আলাপচারিতায় নিমগ্ন থাকলাম।

যুদ্ধকালীন সময়টাতে নদীপথে চলাচলও সহজসাধ্য ছিলনা। বিভিন্ন বন্দরে পাকিস্তানি সেনাদের নজরদারীর মধ্যেই আমাদেরকে পথ চলতে হচ্ছিল। লঞ্চের দুই পাশে বড় আকারের রেড ক্রসের প্রতীক থাকা সত্ত্বেও নানা অজুহাতে তারা আমাদেরকে কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, লঞ্চে কি কি দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে ইত্যাদি প্রশ্নবানে জর্জরিত করছিল। এ সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে আমরা এগিয়ে চললাম এবং পটুয়াখালী পৌঁছে রাত্রিযাপন করলাম।

পরদিন সকালে গলাচিপা যাওয়ার পথে নদীর তীরবর্তী এলাকায় বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবলীলা চোখে পড়লো। অনেক পাকা স্থাপনা দেখলাম যা ভেঙ্গে পড়ার পর এখনো সেই অবস্থায় রয়ে গেছে। বড় বড় অনেক গাছ এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নদীপারের বাড়িঘরগুলো দেখলে বোঝা যায় যে ওগুলো পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। মনে মনে ভাবলাম যে ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার দশ মাস পরের দৃশ্য যদি এরকম হয়ে থাকে তবে ঘূর্ণিঝড়টি বয়ে যাওয়ার পর ধ্বংসযজ্ঞ কতই না ভয়াবহ ছিল। আমাদের সর্বপ্রথম এই লঞ্চ যাত্রায় আমরা গলাচিপা থানা সদরে এসে উপনীত হলাম এবং সার্কেল অফিসার ও কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করলাম।

হেগস্ট্রমের নির্দিষ্ট কতিপয় প্রশ্নের জবাবে কর্মকর্তারা বললেন, ঘূর্ণিঝড়টি অতিমাত্রায় শক্তিশালী ছিল এবং প্রবল বাতাসের সাথে জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় ক্ষয়-ক্ষতি বেশী হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত মহাবিপদ সংকেত রেডিওতে প্রচার করা হলেও জনগণ তা শুনতে বা জানতে পারেনি। চলমান সংকেত ব্যবস্থার সাথে মানুষ মোটেই পরিচিত নয় এবং তারা জানেইনা যে কোন্ সংকেতের

অর্থ কি। ঝড় ও বৃষ্টি এখানে অপরিচিত কোন বিষয় নয় তবু বলতেই হয় যে প্রকৃতির এমন রুদ্র বিধ্বংসী আচরণের চিন্তা কেউ কল্পনাই করতে পারেননি। ঝড়টি আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি এলাকায় সৃষ্টি হয়ে চারদিন পর উপকূলে আঘাত হেনেছে, এই সময়ের মধ্যে আবহাওয়াবিদরাতো এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছিলেন, তবু কেন তারা তাঁদের প্রচারিত আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তিতে তা তেমনভাবে উপস্থাপন করতে পারলেন না? আমাদের থানা প্রশাসনকে একদিন আগেও যদি তেমনভাবে জানানো হতো তবে অতি সহজেই ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে সতর্কবাণী প্রচার করা যেতো এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমানো যেতো। এই যে একটিমাত্র রাতের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হলো এর দায় নেয়ার মতো কাউকে এখন পাওয়া যাচ্ছে না।

ঝড়ের পর আমরা সচেষ্ট থাকার পরও ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারিনি। মার্চ মাসের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সহায়তা প্রদান মন্থর হয়ে পড়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের পর দশ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অগণিত মানুষ এখনও তাদের অসহায়ত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আপনারা যদি গলাচিপার দক্ষিণে অবস্থিত চরাঞ্চলসমূহ সফর করেন তবে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত মানুষের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে পারবেন। অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলাপ আলোচনার জন্য হেগস্ট্রম থানা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানালেন এবং পরের দিন চরাঞ্চলে যাবেন বলে জানালেন।

থানা পর্যায়ের আলোচনার পরদিন আমরা রাঙ্গাবলীসহ আশেপাশের দু-একটি চরাঞ্চল সফর করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, জেলে, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের সাথে ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় নিয়ে নানাবিধ আলাপ আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের স্পষ্ট ধারণাগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম। তদানীন্তন গলাচিপা থানার রাঙ্গাবালী, বড় বাইজদিয়া, ছোট বাইজদিয়া এবং কলাপাড়া থানার ধানখালী, লালুয়া সহ বিভিন্ন চর এলাকায় উপনীত হয়ে প্রায়শই স্থানীয় ছোট নৌকাযোগে এলাকার ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভূক্তভোগীদের অভিমত এবং একই সাথে মহিলাদের বক্তব্য ও নানাবিধ সুপারিশ আমরা গোচরীভূত হলাম। প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকার ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত জনমানুষের অভিজ্ঞতা বিশেষ করে মহিলাদের অভিমত গ্রহণে হেগস্ট্রমের আগ্রহ বেশী লক্ষ্য করলাম।

ঝড়কালীন কি ধরনের ব্যবস্থা থাকলে তাঁদের জান-মাল রক্ষার্থে সুবিধা হতো, কি ধরনের ব্যবস্থা থাকলে জীবনহানী রোধ করা যেতো, গবাদি পশু কি ভাবে রাখলে ক্ষয়ক্ষতি কম হতো, সম্পদ কি ভাবে রক্ষা করা যেতো ইত্যাদি বিষয় তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে জেনে শুনে বুঝে নিচ্ছিলেন।

একইভাবে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দসহ উপজেলা পর্যায়ের কমকর্তা, সমাজসেবক, স্কুল শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও অন্যান্য পেশাজীবী মানুষের বক্তব্য এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ক তাঁদের সুপারিশসমূহের সাথে আমরা পরিচিত হলাম। এ সকল বক্তব্য তরজমা করে আমি হেগস্ট্রমকে অবহিত করছিলাম এবং একই সাথে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বও যথারীতি পালন করছিলাম। আমার বন্ধু লাবলু ত্রাণ জরিপ কার্যক্রমে নিয়োজিত ডেলিগেটদের সহায়তা করে যাচ্ছিলেন। এভাবে সাগরের মোহনা ও বিস্তীর্ণ নদীপারের শত শত মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ ভাববিনিময় আমাকে এক অনন্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলো।

সাগরপারের এই বিশাল জনগোষ্ঠী ঝড়ে তাঁদের সর্বস্ব হারিয়েছে। কোন কোন পরিবারের পচিশ-ত্রিশজন সদস্যের মধ্যে দুজন বা তিনজন বেঁচে আছে। বিশাল ভিটা পরে রয়েছে কিন্তু ঘরগুলো সব ভেসে গেছে। ঘূর্ণিঝড়ের দশ মাস পরের চিত্রের মধ্যে যে ভয়াবহতা দেখতে পেলাম তার মধ্য দিয়েই ঘূর্ণিঝড়কালীন ও ঘূর্ণিঝড়ের অব্যবহিত পরের বীভৎস্যতা অনুমান করতে পারলাম। যুগে যুগে গড়ে তোলা সম্পদ, ঘরবাড়ি, সহায় সম্পত্তি যখন জলোচ্ছ্বাসের করাল আঘাতে এক মুহূর্তের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় তখন উন্নয়নের মাত্রাটা একেবারে শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। প্রিয় মুখগুলো হারিয়ে যায়; আর ফিরে আসেনা। কিন্তু এতকিছু হারানোর পরও জীবনের সংগ্রাম কিন্তু থেমে থাকে না।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর লঞ্চের ডেকে বসে এসব কথাই আমরা নিজেদের মধ্যে প্রতিদিনই আলোচনা করতাম। আমাদের এসকল আলাচনা ও পর্যালোচনার মূল হোতা ছিলেন হেগস্ট্রম। আলোচনার মধ্যে তিনি প্রশ্ন করতেন বেশী এবং তাঁর জানার পরিধি বাড়িয়ে নিতেন সবার অলক্ষ্যে। এভাবে বিভিন্ন এলাকায় আমাদের কার্যক্রম সম্পাদনের পর সপ্তম দিনের গোধূলীবেলায় আমাদের প্রথম সফরের ইতি টেনে আমরা ফিরে আসলাম। ঢাকায় আসার পর হোটেলের রুমে বসেই তিনি কাজ করতেন। উপকূলীয় এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করার

সময় কোন রেফারেন্সের প্রয়োজন হলে তিনি আমাকে ডাকতেন এবং আমার অভিমত জানতে চাইতেন।

অক্টোবর মাসে আমরা এভাবে আরো দুটি সফর আমরা সম্পন্ন করলাম। নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের মোহনা ও সাগর সংলগ্ন উত্তাল জলরাশিতে লঞ্চ ব্যবহার নিরাপদ না হওয়ায় আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের তত্ত্বাবধানে 'ডলফিন বে' নামে একটি মাঝারি আকারের সমুদ্রগামী বৃটিশ জাহাজ সিঙ্গাপুর থেকে ভাড়া করে আনা হলো। ঐ জাহাজে চেপে আমরা হাতিয়া, রামগতি এবং সন্দ্বীপ উপজেলায় আমাদের জরিপ সফর চালিয়ে গেলাম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঐ সময়টাতে লঞ্চ বা জাহাজ চলাচলের উপর জন-মানুষের উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো কারণ পাকিস্তানি নৌ-সেনারা অহরহ উপকূলীয় এলাকায় চলাচল করতো এবং স্থানীয় অধিবাসীদের অত্যাচার করতো। অবশ্য এলাকা জুড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আধিপত্য তখন সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত। ডলফিন-বে জাহাজের দুই পার্শ্ব বরাবর এবং ছাদের উপর বিশাল আকারের রেড ক্রসের প্রতীক সংযোজিত থাকায় জাহাজটি যে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত তা সবারই বোধগম্য ছিলো। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় বিশাল আকারের ত্রাণকার্য পরিচালনা এবং একইসাথে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন জনমানুষকে জেনেভা কনভেনশন মোতাবেক সহায়তা প্রদানের জন্য তদানীন্তন লীগ অব রেড ক্রস এণ্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেড ক্রস সম্মিলিতভাবে তাঁদের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত করে যাচ্ছিল।

'ডলফিন বে' জাহাজে সংঘটিত ঘটনা

ঐ সফরকালে সংঘটিত একটি ঘটনার মধ্যদিয়ে উপকূলীয় এলাকার জোয়ার-ভাটা ও জলস্রোতের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হলাম। অক্টোবর মাসের মাঝামঝি সময়ে ঘটনাটি যখন ঘটে তখন রামগতির উপকূল বরাবর আমাদের জাহাজ চলছিলো। ডলফিন-বে জাহাজের একজন বৃটিশ নাবিক মেদবহুল বিশাল দেহের অধিকারী ছিলেন। লম্বায় সাড়ে ছয় ফুটেরও অধিক, প্রায় চল্লিশ বছর বয়সী অত্যন্ত সুদর্শন এই মানুষটি যখন কানের নিচ পর্যন্ত প্রলম্বিত ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে হাঁটতেন তখন তাঁকে রূপকথার রাজপুত্রের মতই মনে হতো। তিনি জাহাজের মালিকের প্রতিনিধি বলে নিজেকে পরিচয় দিতেন।

সমুদ্রগামী ডলফিন-বে জাহাজে তখন আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সাত-আটজন ডেলিগেট অবস্থান করছিলেন। এদের মধ্যে সুইডেনের ক্ল্যাস হেগস্ট্রম, আমেরিকার ম্যাক্স মেরিক ও ডন হানা, নেদারল্যান্ডের এরিখ, ফ্রান্সের জাঁ পিয়ের গন্তার্দ, জাপানের তাদামাসা ফুকিউরা প্রমূখ ডেলিগেটবৃন্দ ছিলেন। তাদামাসা ফুকিউরার ডাকনাম ছিল ট্যাডি এবং তাঁর সাথে হাতিয়া দ্বীপে কাজ করার জন্য হেগস্ট্রম আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। রামগতির উপকূল এলাকা সফরের পর হাতিয়া অভিমুখে আমাদের জাহাজ চলছিল।



লীগ অব রেড ক্রস এণ্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ
এর ডেলিগেট তাদামাসা ফুকিউরা (ট্যাডি)

হঠাৎ করেই চলমান জাহাজের গতি শ্লথ হতে হতে একসময় একেবারে স্থির হয়ে গেলো। দীর্ঘদেহী মালিকের ঐ প্রতিনিধি আমাদের কাছে এসে জানালেন যে জাহাজের প্রপেলারে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এটা মেরামত না করে জাহাজ চালানো সম্ভবপর নয়। তিনি আরো জানালেন যে, ভাটা হলে ঘন্টাখানেক সময়ের মধ্যে মেরামত কাজ শেষ করা যাবে। জাহাজটা নদীতটের কাছাকাছি ছিল। ভাটা শুরু হলো এবং দুপুরের আগেই নদীটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেল। আমরা

দেখলাম জাহাজটা শুকনো বালুময় মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী কয়েকজন ক্রু নিচে নেমে মেরামতের কাজ শুরু করলো। তাঁরা প্রপেলারটা সম্পূর্ণ খুলে ফেলতে উদ্যোগী হলো।

কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে মেরামতের কাজ প্রত্যক্ষ করার জন্য দড়ির মই বেয়ে আমিও নিচে নেমে এলাম। জাহাজের উচ্চতা বিবেচনায় নিয়ে বুঝতে পারলাম যে উপরে উঠার সময় বেগ পেতে হবে। নোঙরের প্রলম্বিত মোটা ক্যাবলটি টানটান হয়ে ভাটার দিকে অবস্থানরত জাহাজটাকে ধরে রেখেছে। জাহাজের নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে হাসি-তামাসা করছে এবং ঢিলেঢালাভাবে কাজ করছে। অবশ্য পিতলের তৈরী বিশাল আকারের প্রপেলারটি খুলতে তাঁদের বেশ সময় লেগে গেলো।

শুকনো নদীতে স্তুরীভূত পলি ও বালুর উপর দিয়ে কিছুটা সময় হাটাহাটি করে জোয়ার ভাটার খেলায় লালিত নদীর অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করে ধন্য হলাম। অপার সৌন্দর্য ও অভিনবত্বের সমাহারে বৈচিত্রপূর্ণ প্রকৃতি ও পরিবেশের বিরাজমান আবহ এমন নিবিড়ভাবে উপভোগের সুযোগ পেয়ে মহান ও করুণাময় সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

কিছুক্ষণ হাটাহাটির পর দড়ির মই বেয়ে জাহাজে উঠতে বেশ ধকল পোহাতে হলো। এরই মধ্যে ঘন্টাদুয়েক সময় অতিবাহিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পথনির্দেশ করার জন্য নিয়োগকৃত জাহাজের বাঙ্গালী পাইলট উদ্বিগ্নতার সাথে আমাকে বললেন, ক্রুদেরকে সত্বর কাজটি শেষ করে জাহাজে উঠে আসতে বলুন কারণ জোয়ার যখন শুরু হবে তখন কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই নদীতে পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে, স্রোতের কারণে ওরা কোন কাজই আর করতে পারবে না।

সতর্কতামূলক এই সংবাদটা তাৎক্ষণিকভাবে আমি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে অবহিত করলাম। ক্যাপ্টেন ঠোঁট উল্টিয়ে কিছুটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, জোয়ারের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা ভাল করেই ওয়াকিবহাল এবং চিন্তার কোন কারণ নেই।

পাইলটের সতর্কতামূলক উক্তিটি আমি হেগস্ট্রমকেও জানালাম। তিনিও বিষয়টি নিয়ে ক্যাপ্টেনের সাথে পুনরায় কথা বললেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো যে পাইলটের উদ্বিগ্নতা ও সতর্কতা ক্যাপ্টেন তথা ক্রুদের মধ্যে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া

সৃষ্টি করতে পারলো না। তাঁরা জাহাজের মেরামত কাজ ঢিলেঢালাভাবেই করে যেতে থাকলো। এভাবে কয়েক ঘন্টা সময় অতিবাহিত হলো। এদিকে উদ্বিগ্ন পাইলট অবিলম্বে কাজ বন্ধ করে ক্রুদেরকে জাহাজে উঠে আসার জন্য তাগাদা দিতে আমাকে পুনরায় অনুরোধ জানালেন।

এবার আমি ডেলিগেটদেরকে বিষয়টি অবহিত করলাম। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য সবাই ক্যাবিন থেকে বাইরে এসে ডেকে জড়ো হলেন। এবার প্রথমবারের মতো ক্যাপ্টেন জাহাজের পেছন দিকে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ক্রুদেরকে দ্রুত কাজ শেষ করে উঠে আসার জন্য বললেন। উদ্বিগ্ন ও সতর্ক পাইলট এমনসময় চিৎকার করে বললো, 'ঐযে দেখুন জোয়ার শুরু হয়েছে এবং পানির প্রবাহ ছুটে আসছে'। অনেক দূরে উচ্ছ্বসিত একটা পানির প্রবাহ পর পর কয়েকটি ঢেউয়ের আকারে ছুটে আসছে দেখতে পেলাম। পাইলট বললো, 'সর্বাগ্রে ছুটে আসা উচ্ছ্বসিত ঢেউটি স্থানীয় ভাষায় 'সর' বলে পরিচিত এবং এর তোড়ে অনেক নৌকা ও ট্রলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ক্যাপ্টেন প্রমাদ গুনলেন এবং ছুটাছুটি করে অতি উচ্চস্বরে সবাইকে নির্দেশ দিতে থাকলেন। তবে পাইলটের সতর্কতা এড়িয়ে গিয়ে তিনি যে কতবড় ভুল করেছেন তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

এবার নিচে হইচই শুরু হলো। সবাই মিলে বিশাল প্রপেলারটা উঠিয়ে শ্যাফ্‌টের মধ্যে ঢুকিয়ে তা লাগানোর চেষ্টা করতে থাকলো। এমতাবস্থায় পানির প্রাথমিক ধাক্কা বা 'সর' জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়লো। এরপর আমরা এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড প্রত্যক্ষ করতে থাকলাম। মুহুর্মুহু পানির উচ্চতা বাড়তে থাকলো এবং স্রোতধারা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকলো। হঠাৎ করেই জাহাজটা দুলে উঠলো এবং দাঁড়িয়ে থাকা ক্রুরা স্রোতের তোড়ে প্রপেলারটি ছেড়ে দিয়ে দড়ি ধরে ভাসতে থাকলো। পাঁচজন ক্রুর মধ্যে তিনজন দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠতে সমর্থ হলো। বাকি দুজন বারবার চেষ্টা করেও উঠতে না পারায় দড়ি ধরে ভাসতে থাকলো।

অবস্থাদৃষ্টে পাইলট বললো, যদি স্রোতের তোড়ে নোঙর ছিড়ে জাহাজটি আলগা হয়ে যায় তবে পাগলা হাতির মতো এটি স্রোতের টানে ছুটে চলবে এবং প্রপেলার না থাকায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তখন নদীর পাড়, অন্য কোন জাহাজ বা ট্রলারের সাথে সংঘর্ষ ঘটিয়ে আমরা সবাই বড় কোন বিপদের মুখোমুখি হতে পারি। প্রার্থনা করি এমনটি যেনো না হয় এবং জাহাজের নোঙরটি যেনো সুদৃঢ় থাকে।

পাইলটের প্রার্থনা বিফলে গেলনা। পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় জাহাজটা ভেসে উঠে প্রবলবেগে স্রোতের অনুকূলে বিপরীত দিকে ছুটে গিয়ে নোঙরের টানে আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। ঝাঁকুনি বা জাহাজ থেকে ছিটকে পড়ার ভয়ে আমরা রেলিং আঁকড়ে ধরে নিজেদেরকে স্থির রাখলাম। ক্রমান্বয়ে পানির প্রবাহ প্রবলতর হচ্ছিলো। আমরা সবাই ডেকে দাঁড়িয়ে জোয়ারের পানি প্রবাহের দুরন্ত ও অভিনব দৃশ্য দেখছি। ইতিমধ্যে নদীর পারে অনেক উৎসুক মানুষের সমাগম হয়েছে এবং আমাদের জাহাজের ক্রুদের বিপদাপন্ন অবস্থা অবলোকন করছে।

এরই মধ্যে দুজন দুরন্ত ও সাহসী যুবক কিছুটা উজান থেকে ছোট্ট একটি নৌকা নিয়ে আমাদের জাহাজের দিকে ভেসে আসতে থাকলো। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো দড়ি ধরে ভাসমান দুজন ক্রুকে সহায়তা করা, কিন্তু ধারণাতীত গতিতে ছুটে আসা নৌকাটি জাহাজের গায়ে সজোরে আছড়ে পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। নৌকার যুবকেরা অক্ষত অবস্থায় মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে জাহাজে উঠে পড়লো। ছুটে আসা নৌকার আঘাতে ভাসমান একজন ক্রু মারাত্মকভাবে আহত হলেও ডলফিনের মতো শূন্যে উঠে সে ভগ্নপ্রায় নৌকার উপরে উঠে পড়লো। হাতের নাগালে পাওয়ায় ডেকে অবস্থানরত দুজন যুবক ঐ আহত ক্রুকে হাত দিয়ে ধরে ফেললেন এবং কয়েকজন ডেলিগেটের সহায়তায় তাঁকে তুলে আনলেন। তাঁর মাথা ফেটে রক্ত ঝরছিলো। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য সরিয়ে নেয়া হলো।

নৌকাটি ছুটে এসে জাহাজের গায়ে সংঘর্ষ ঘটার মুহূর্তে ভেসে থাকা অপর ক্রু দড়ি ছেড়ে দিয়ে সংঘর্ষ থেকে নিজেকে মুক্ত করলো এবং প্রচণ্ড গতিতে স্রোতের অনুকূলে ভেসে যেতে থাকলো। তাৎক্ষণিকভাবে জাহাজ থেকে একটা লাইফবয়া নিক্ষেপ করা হলো কিন্তু ভাসমান ক্রু তা ধরতে সমর্থ হলো না। এমতাবস্থায় দীর্ঘদেহী জাহাজ মালিকের প্রতিনিধি একটা লাইফ জ্যাকেট নিয়ে নদীতে লাফিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য ভেসে যাওয়া ক্রুকে উদ্ধার করা। ঘটনাগুলো একের পর এক এমনভাবে ঘটে যাচ্ছিল যে আমরা ডেকে অবস্থানরত সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না। জাপানিজ ডেলিগেট তাদামাসা ফুকিউরা তাঁর ক্যামেরার বিশাল জুম লেন্সে চোখ রেখে ভেসে যাওয়া দুজনের দূরত্ব নির্ণয়পূর্বক রানিং কমেন্ট্রি করে যাচ্ছিলেন। একসময় ভাসমান দুজন নাবিক আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেন। জাহাজে উঠে আসা স্থানীয় দুজন যুবক আমাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, ভেসে যাওয়া নাবিকেরা যদি ভাল

সাঁতার জানেন তবে চিন্তার কিছু নেই, ভাসতে ভাসতে কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁরা সহজেই তীরে উঠতে পারবেন কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই স্রোতের গতি কমে আসবে। আমি যুবকদ্বয়কে ভাসমান দুজনকে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানালাম। যুবকেরা আমাকে আশ্বস্ত করে বললো যে কয়েকজন স্থানীয় লোক ভাসমানদের সহায়তার জন্য নদীর পাড় বরাবর এগিয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে স্রোতের গতি কমে যাওয়ায় একটি পাটাতন বিছিয়ে পাড়ের সাথে জাহাজে সংযোগ স্থাপন করা হলো। যুবক দুজনার সাথে আমি জাহাজ থেকে নেমে এলাম, ভেসে যাওয়া দুজনের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় সে বিষয়ে স্থানীয়দের সাথে আলাপ করাটাই ছিল উদ্দেশ্য।

এমন সময়ে জাহাজের ডেকে তাদামাসা ফুকিউরার চেঁচামেচি ও দৌড়াদৌড়ি পরিলক্ষিত হলো। আমি পাড় থেকে ছুটে জাহাজে চলে এলাম। দেখলাম ফুকিউরা তাঁর ক্যামেরার জুমলেন্স দিয়ে বহুদূরে নদীর পাড় দিয়ে হেটে আসা ক্রুদেরকে দেখছে আর হাসতে হাসতে জাপানি ভাষায় কি কি যেনো বলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ডেলিগেটবৃন্দ ও ক্রুরা ডেকের উপর এসে জড়ো হয়েছে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃশ্যটা আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এলো। দেখলাম যে আমাদের জাহাজের মালিকের প্রতিনিধি দিগম্বর অবস্থায় হেঁটে আসছেন এবং তাঁর পেছনে প্রায় শতাধিক ছেলেপেলেদের একটি দল হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে। ভেসে যাওয়া দ্বিতীয় ক্রুও ঐ মিছিলে রয়েছে। দৃশ্যটা দেখে আমার মনে হলো যে, এক বিশালদেহী নগ্ন দেবতা অন্য কোন গ্রহ থেকে মর্তে অবতরণ করেছেন এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা আনন্দের আতিশয্যে তাঁকে ঘিরে আনন্দ নৃত্যে মেতে উঠেছে। ক্রমান্বয়ে নগ্ন দেবতাটি আমাদের সন্নিকটে এসে আবার অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড করে বসলেন। তিনি পাটাতন দিয়ে না উঠে আবার পানিতে লাফিয়ে পড়লেন এবং ঝুলে থাকা দড়ির মই ধরে জাহাজে উঠার প্রয়াস নিলেন।

তখন স্রোতের প্রবলতা কমলেও স্রোতধারা বিরাজমান ছিলো। বার বার প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিশাল দেহটি নিয়ে তিনি জাহাজে উঠতে ব্যর্থ হলেন। এই অবস্থায় ক্রুরা সবাই এগিয়ে এসে বেশ কিছক্ষণ কসরতের পর তাঁকে জাহাজে তোলা হলো। দ্বিতীয়বার নদীতে লাফিয়ে পরে নিজের জেদ ও অহমিকা জাহির

করার জন্য ডেলিগেটবৃন্দ মালিকের ঐ প্রতিনিধির সমালোচনা করলেন। যাহোক, এক সমূহ বিপদের মুখোমুখি হয়েও প্রকারান্তরে কোন অঘটন ছাড়াই যে আমাদের জাহাজের দুজন নাবিক অক্ষত অবস্থায় ফিরতে পেরেছেন সেজন্য আমরা সবাই খুশী হলাম।

তবে বিপত্তিটা দেখা দিলো যখন জানা গেলো যে প্রবল পানির তোড়ে প্রপেলারটা খুলে গিয়ে ভেসে গেছে। জাহাজে অতিরিক্ত কোন প্রপেলারও ছিলো না। অবস্থা চরম সংকটের দিকে এগিয়ে গেলো। প্রপেলার না থাকা মানে জাহাজ অচল। আমি অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে নিচে নেমে গিয়ে স্থানীয় সেই যুবকদের সাথে আলোচনা করলাম কিন্তু ভেসে যাওয়া প্রপেলারটি পুনরুদ্ধার করা যাবে কিনা সে বিষয়ে তাঁরাও সঠিক জবাব দিতে পারলো না। ঐ দুজনকে নিয়ে আমি ক্যাপ্টেন ও পাইলটের সাথে বসলাম এবং আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে মধ্য রাতের পর আবার যখন ভাটা হবে তখন প্রপেলারটি খুঁজে দেখা হবে।

ক্যাপ্টেন বললেন যে যেহেতু প্রপেলারটি অত্যন্ত ভারী সেহেতু বেশীদূর ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। ক্যাপ্টেনের অনুমোদনক্রমে স্থির হলো যে, পচিশ জন স্থানীয় লোক নিয়োগ করা হবে যারা মধ্যরাতের পর শুকনো নদীতে প্রপেলারটির সন্ধান করবেন এবং যিনি এটা খুঁজে বের করতে পারবেন তাঁকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে। এ ছাড়াও যারা এই কাজে অংশগ্রহণ করবেন তাঁদেরকে আপ্যায়ন করা হবে। প্রপেলার অন্বেষণের আয়োজন ও বাস্তবায়নের সমুদয় দায়িত্ব স্থানীয় ঐ যুবকদ্বয় গ্রহণ করলেন।

আমি এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই সেদিন রাতে ঘুমুতে পারিনি। মধ্যরাতের পর ভাটার কারণে নদী পুনরায় শুকিয়ে গেলো এবং আমরা জাহাজ থেকে নেমে ভেসে যাওয়া প্রপেলার খোঁজা শুরু করলাম। স্থানীয় কয়েকজন যুবক টর্চলাইট হাতে আমাদের সাথে যোগদান করলেন। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে বিদেশী ডেলিগেটদের কেউ গভীর রাতে জাহাজ থেকে নেমে প্রপেলার অনুসন্ধানের কাজে অংশগ্রহণ করেননি।

জাহাজের ক্রু এবং স্থানীয়রা মিলে ত্রিশ পয়ত্রিশ জন মানুষ উজানের এক কিলোমিটার এলাকা চষে ফেলেও যখন প্রপেলারটির দেখা মিললোনা তখন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বেশীরভাগ মানুষ জাহাজের কাছে এসে জড়ো হয়ে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তখন দূর থেকে ‘পেয়েছি পেয়েছি’ বলে একজনের চিৎকার

ধ্বনি শোনা গেলো। আমরা সবাই ছুটে গিয়ে দেখলাম যে একটি কিশোর বালুর উপরে কিয়দংশ দৃশ্যমান প্রপেলারটির একটি ব্লেড ধরে রয়েছে। বিশালদেহী সেই মালিকের প্রতিনিধি ছেলেটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। ক্রুরা বালু খুড়ে প্রপেলারটি বের করে ধরাধরি করে জাহাজের কাছে নিয়ে এলেন এবং আধা ঘন্টার মধ্যে শ্যাফ্টের সাথে ভালোভাবে ওটাকে জুড়ে দিলেন। কিশোর ছেলেটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু টাকা বখশিশ হিসাবে দেয়া হলো এবং সকলের আপ্যায়নের জন্য আরও কিছু অর্থ দেওয়া হলো। সন্তুষ্ট চিত্তে স্থানীয়রা আমাদেরকে বিদায় জানিয়ে প্রস্থান করলো।

রাত তখনো কিছুটা বাকি রয়েছে। আকাশ ভরা তারার মেলা। এতো তারা একসাথে কখনো দেখেছি বলে মনে হলো না। একাকী কিছুক্ষণ ডেকে বসে বসে আলোক উজ্জল তারাদের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। এরপর কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম তবে অনেক চেষ্টার পরও ঘুমের দেখা পেলাম না।

প্রত্যুষে ক্যাবিন থেকে বাইরে গিয়ে দেখলাম যে জাহাজটি পূর্ববৎ একই অবস্থানে রয়েছে। পূর্ব দিগন্তে রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকৃতির নিস্তব্ধতার মধ্যে সূর্যালোকে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নাস্তার টেবিলে বসে হেগস্ট্রম আমাকে হাতিয়া দ্বীপের গুরুত্ব বর্ণনা করে বললেন যে এখানে জাপান রেড ক্রসের সহায়তায় একটি মেডিকেল টিম ঘূর্ণিঝড় উত্তর স্বাস্থ্য সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং তোমাকে ওদের সাথে কাজ করতে হবে এবং পরবর্তীতে যখন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতির কাজ শুরু হবে তখন তুমি সেই কাজ বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করবে। তিনি আমাকে আরো বললেন যে, জাপানিজ রেড ক্রসের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে হাতিয়া দ্বীপে তোমার জানাশোনার পরিসর ও অবস্থান দৃঢ়তর করবে যা পরবর্তীতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থার উন্নয়নের সময় কাজে লাগবে।

আমি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে হেগস্ট্রমের প্রস্তাবটি সমর্থন করলাম এবং জাপানিজ টিমের সাথে হাতিয়াতে কাজ করতে সম্মত হলাম।

হাতিয়া দ্বীপে আগমন

১৯৭১ সালের **১৬** অক্টোবর সকালবেলা। ডলফিন-বে আবার সচল হয়ে উঠলো। এই এলাকার নদীতে পলিমাটির বিস্তারের আধিক্য থাকায় নাব্যতা সংকট রয়েছে তাই বাঙ্গালী পাইলটের সতর্ক নির্দেশক্রমে নিম্মগতিতেই জাহাজ চলছিলো। এভাবে ঘন্টাখানেক চলার পর আমরা হাতিয়া দ্বীপে এসে পৌঁছলাম। তীব্র স্রোত এবং ঘাটে কোন জেটি না থাকায় ঘাট থেকে কিছুটা দূরে জাহাজের নোঙর ফেলা হলো। জানা গেল যে পূর্বের জেটিটি ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হবার পর নতুন আর কোন জেটি স্থাপিত হয়নি। নদীর পারে জড়ো হওয়া অনেক মানুষ উৎসুক দৃষ্টিতে রেড ক্রস প্রতীক সম্বলিত আমাদের জাহাজটি দেখছিলো। আমরা সবাই রেড ক্রসের ব্যাজ পরিহিত ছিলাম।

এই এলাকায় রেড ক্রস চিহ্নটির সাথে সবাই কম-বেশী পরিচিত বলে আমাদেরকে নিয়ে তাদের যে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ নাই তা সহজেই বোঝা গেলো। এগারো মাস পূর্বে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর রেড ক্রসের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এই সংস্থাটি যে আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত তা অনেকেই জানেন।

হেগস্ট্রম, তাদামাসা ফুকিউরা এবং আমি স্থানীয় নৌকাযোগে জাহাজ থেকে নেমে পারের কাছাকাছি এলাম কিন্তু অতিরিক্ত কাদার কারণে নামতে পারছিলাম না। কাঠের তক্তা বিছিয়ে দিয়ে তীরে নামতে স্থানীয়রা আমাদেরকে সহায়তা করলেন। হেগস্ট্রম স্থানীয়দের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের সাথে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আলাপ জুড়ে বসলেন। নদীর পারে ছোট একটা জটলার সৃষ্টি হলো।

কামাল পরিচয় দিয়ে জনৈক ব্যক্তি বললেন, এখানে আপনারা এমন কাউকেও খুঁজে পাবেন না যার পরিবারের কেউ না কেউ ঐ ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারাননি। ২০ থেকে ২৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসের পানি এই পুরো দ্বীপটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে। সেদিন পূর্ণিমার রাত ছিলো তবে আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। ভরা জোয়ারের সময় ভারী বর্ষণসহ রাতের অন্ধকারে ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানলো। আমরা কেউ কিছু

জানলাম না, কোনরূপ সতর্ক সংকেতও পেলাম না, কোন কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই হাজার হাজার মানুষ, অগণিত ঘরবাড়ি, সহায় সম্পত্তি সবই সাগরের লোনা পানিতে ভেসে গেলো। এই দ্বীপের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর সত্তুর শতাংশই বিনষ্ট হলো। প্রচণ্ড সংগ্রাম করে যারা বেঁচে আছে তারাও অর্ধমৃত বলতে পারেন। মানুষ এখানে এখন সত্যিই বড় অসহায়।

হেগস্ট্রমের এক প্রশ্নের উত্তরে কামাল বললেন, ঘূর্ণিঝড় সংকেত ব্যবস্থাটা স্থানীয়করণ করা প্রয়োজন এবং সহজ ও স্থানীয় ভাষায় এর সময়োচিত প্রচার প্রয়োজন। একইসাথে জন-মানুষের মধ্যে এটা জাগরণ সৃষ্টিরও দরকার রয়েছে। এখানকার বেশীরভাগ গরিব খেটেখাওয়া মানুষের প্রাধান্যের মধ্যে প্রস্তুতিমূলক বিষয়টাকে নিয়ে আসতে হবে এবং নানাবিধ গণ-সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড হাতে নিতে হবে। পাকিস্তান সরকার দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে পারেনি এবং এটাকে ক্রমাগত অবহেলা করার ফলাফল যে কতটা মারাত্মক হতে পারে তা ৭০-এর ঘূর্ণিঝড় আমাদেরকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। শুধু হাতিয়া নয় সমস্ত উপকূলব্যাপী দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন এখন অবশ্যই অগ্রাধিকারের একটা বিষয়।

কামালকে ধন্যবাদ জানিয়ে হেগস্ট্রম বললেন, আপনার অভিমতসমূহ বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করেছে। আমরা প্রস্তুতিমূলক বিষয়ে কাজ করতে আগ্রহী। আপনার সাথে আগামীতে দেখা হবে এবং আমরা একসাথে কাজ করতে পারবো বলে আশা রাখি।

কামাল বললেন, অবশ্যই আমরা মানুষের নিরাপত্তা বিধানের জন্য একসাথে কাজ করতে পারি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

চর জব্বার যাওয়ার খেয়া নৌকায় শিঙ্গাধ্বনি শোনা গেলো এবং কামালসহ অনেকেই সেদিকে প্রস্থান করলেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময়ে কামাল রেড ক্রসের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

নদীর পারে দাঁড়িয়ে জনৈক ব্যক্তি খন্দকার জামান পরিচয় দিয়ে ট্যাডিকে জাপানি ভাষায় সম্বোধন করে বললেন যে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছিলেন এবং জাপানের একজন মেজরের সাথে কাজ করেছিলেন। এই অজ পাড়াগাঁয়ে নদীর পারে দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধের মুখে জাপানি ভাষার উচ্চারণ শুনে ট্যাডি

হতবাক হয়ে জামান সাহেবের সাথে আলাপ জুড়ে দিলেন। খন্দকার জামান হাতিয়া দ্বীপে একটি আটার কল পরিচালনা করেন। এরপর তিনি সরাসরি ইংরেজীতে ঘূর্ণিঝড় ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। সকালবেলা নদীপারের সাধারণ এই আলোচনাটি ফলপ্রসু হলো বলে হেগস্ট্রম অভিমত পোষণ করলেন।

এরপর আমরা রিক্সা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার জন্য রওয়ানা হলাম। নদীর পাড় থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার যাওয়ার পর হাতিয়া থানা হেড কোয়ার্টারে পৌঁছলাম। একটা ছিমছাম জনপদ। আমরা সরাসরি প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তরে গেলাম। ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। হাতিয়া দ্বীপের প্রশাসনিক কর্মকর্তার দায়িত্ব তিনি পালন করছিলেন। আমরা হাতিয়াতে ঘূর্ণিঝড় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ করবো বলে তাঁকে অবহিত করলাম। ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদের নির্দেশক্রমে অফিসের পিওন কিছু কলা ও চা পরিবেশন করলো।

ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ বললেন, ঘূর্ণিঝড়টি হাতিয়া দ্বীপটির উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছে। এই দ্বীপের আপামর মানুষ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। অগণিত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এবং যারা প্রাণে বেঁচে গেছে তাঁদের ঘরবাড়ী ও সহায় সম্বল যা ছিলো তা জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে। বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠে লোনা পানি প্রবেশের কারণে বেশ কয়েকবছর ফসল উৎপাদন ব্যাহত হবে। এই অবস্থার মধ্যে সবদিক থেকে সব ধরনের সহায়তা প্রয়োজন। আমরা অবশ্যই আপনাদের কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানে তৎপর থাকবো।

ঐ সময়ে প্রশাসনিক ভবনে অবস্থানরত কয়েকজন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের সহযোগে তিনি একটি অবহিতকরণ সভার আয়োজন করলেন। এই সভায় হেগস্ট্রম এবং আমি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থার উন্নয়নে হাতিয়া দ্বীপে কাজ করার বিষয়ে আমাদের পরিকল্পনার কথা জানালাম।

এরপর ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ হাতিয়া দ্বীপে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে আমাদেরকে পাকিস্তানি সৈন্যদের শিবিরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এদের সাথে যোগাযোগ না রাখলে কাজ করতে পারবেন না।

কয়েক মিনিট হাটা পথ, কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া কয়েকটি একতলা ভবন। সেখানে গিয়ে পাকিস্তানি কোন সৈন্যের দেখা পেলাম না, যারা রয়েছেন তাদের বেশীরভাগই স্থানীয় রাজাকার বলে ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ বললেন। একটি ভবনের সামনে খোলা জায়গায় কতিপয় যুবকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ চলছিলো। ট্যাডি ওদের কমাণ্ডারকে আমাদের হাতিয়া আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। কমাণ্ডার আমাদেরকে ঘূর্ণিঝড় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সর্বতোভাবে সহায়তা করবেন বলে আশ্বস্ত করলেন। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর আমরা ঐ ভবনটি ছেড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে এলাম।

আচার আচরণে ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদকে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারী একজন দৃঢ়চেতা মানুষ বলে প্রতীয়মান হলো এবং জাপানিজ ডেলিগেট ট্যাডির সাথে তাঁর ঘনিষ্টতা বেড়ে গেলো। বলাবাহুল্য যে ট্যাডি এবং হেগস্ট্রম দুজনাই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ আমাদেরকে অনেকটা সময় দিলেন এবং ফেরার সময় রিক্সা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে হেঁটে হেঁটে এলেন। আমরা জাহাজে ফিরে এলাম।

এরপর কয়েকদিন আমরা ভোলা, মনপুরা ও রামগতিতে আমাদের নির্ধারিত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করলাম। পূর্বেই সিদ্ধান্ত ছিল যে আমরা কয়েকজন চর জব্বার হয়ে নোয়াখালী সফর করে ২৫ অক্টোবর নাগাদ চট্টগ্রামে মূল দলের সাথে যোগদান করবো।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ অক্টোবর সকাল বেলায় জাঁ পিয়ের গন্তার্দ, ট্যাডি এবং আমি ডলফিন বে জাহাজ থেকে একটি দেশী নৌকায় চেপে চর জব্বার ঘাটের দিকে যাত্রা করলাম। নিজের নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য হেগস্ট্রম আমাকে সতর্ক করলেন। অন্যান্য ডেলিগেটদের নিয়ে ডলফিন বে জাহাজটি চট্টগ্রাম অভিমূখে রওয়ানা হলো।

নোয়াখালী ভ্রমণ ও চলমান মুক্তিযুদ্ধ

চর জব্বার ঘাট থেকে বেবী ট্যাক্সি নিয়ে নোয়াখালীর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। কিছুটা বালির চর এবং ভাঙ্গা খোয়া বিছানো রাস্তায় চলতে বেশ বেগ পেতে হলো। ঘন্টাদুয়েক পর নোয়াখালী এসে পৌঁছলাম। ইতিপূর্বে জাঁ পিয়ের গন্তার্দ নোয়াখালী সদর মাইজদী কোর্টে রেড ক্রসের জন্য একটি অফিস ভাড়া করেছেন। আমরা সবাই ঐ অফিসে গিয়ে উঠলাম। নোয়াখালী রেড ক্রসের ষ্টাফ লতিফ, মেসবাহ ও তোসাদ্দেকের সাথে পরিচয় হলো।

শহরের পূর্বদিকে একটি গাছপালা ঘেরা আবাসিক এলাকায় অফিসটি অবস্থিতি হওয়ায় আমার খুব পছন্দ হলো। রাতের খাবারের পর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় রেড ক্রসের কর্মকর্তা লতিফ ও মেজবাহ্ স্থানীয় পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন।

লতিফ বললেন, মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা শহরের এলাকায় এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। তবে তাঁরা প্রতিনিয়ত সতর্কতার সাথে তাঁদের অবস্থান পরিবর্তন করছে। তাঁরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত এবং হঠাৎ হঠাৎ বিভিন্ন এলাকায় আকস্মিক হামলা পরিচালনা করে চলেছে। এদিকে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারেরা মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধানে তাদের অভিযান জোরদার করেছে, সমস্ত অভিযানে প্রায়সময়ই নিরীহ মানুষজনকে তারা বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে এবং এরপর তাঁদের আর কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

জাঁ পিয়ের গন্তার্দ বললেন, আমাদেরকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাজ করতে হবে। অবস্থাদৃষ্টে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে সংঘাতের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়বে এবং হতাহতের সংখ্যাও সে অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন আহত কোন মানুষের সংবাদ পাওয়ামাত্রই আমাদেরকে সেখানে ছুটে যেতে হবে এবং আহতজনকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে। তবে সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রেখে কর্ম-সম্পাদন করতে হবে। নোয়াখালী এলাকার পাকিস্তানি সেনা কমাণ্ডারের সাথে আমি আগামীকাল দেখা করবো এবং জেনেভা কনভেনশনের কতিপয় ধারা তার গোচরীভূত করবো।

লতিফ বললেন, গোলাগুলি চলাকালে অথবা গোলাগুলি থেমে যাওয়ার অব্যবহিত পর চলাচল করাটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় পরিস্থিতি যখন সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যাবে তখন রাস্তায় বেরিয়ে আমরা উদ্ধার কাজগুলো সম্পাদন করতে পারি।

জাঁ পিয়ের গন্তার্দ উঠে দাঁড়িয়ে একটু পায়চারী করে ফিরে এসে বললেন, কোন ব্যক্তিকে গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখলে অথবা এমন কোন সংবাদ পাওয়ার পর দীর্ঘসূত্রিতা বা বিলম্ব করার অর্থ হলো আহত ব্যক্তির মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করা। আমরা যত দ্রুত সম্ভব আহতদেরকে উদ্ধার করবো এবং চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাব। এখানে আমাদের জীপ দুটোতে রেড ক্রসের প্রতীক থাকা সত্ত্বেও রেড ক্রসের পতাকা সংযোজিত রয়েছে, এছাড়াও নিরাপত্তার জন্য আপনারা রেড ক্রস ভেষ্ট পরিহিত থাকবেন। আমরা আশা করি রেড ক্রসের গাড়ী ও রেড ক্রস ভেষ্ট পরিহিত কর্মীদের উপর কোন পক্ষই আক্রমণ করবে না অথবা গুলিও ছুঁড়বে না। তবে কখনো কখনো এর ব্যত্যয়ও ঘটে থাকে এবং রেড ক্রসের কর্মীরা আহত ও নিহতও হয়ে থাকে।

আবেগপ্রবণ গন্তার্দ নিজের শার্টের বোতাম খুলে তাঁর ডান বাহুর উপরিস্থিত কাঁধের অংশটি উন্মোচন করলেন। আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম যে তাঁর কাঁধের পুরো অংশটাই এবড়োখেবড়ো এবং বড় বড় কয়েকটা সেলাইয়ের চিহ্ন বিদ্যমান। আমার মনে হলো যে জাঁ পিয়ের গন্তার্দ তাঁর জীবনের কোন এক সময়ে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।



লীগ অব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ এর ডেলিগেট জাঁ পিয়ের গর্ন্তাদ

জাঁ পিয়ের গন্তার্দ তাঁর কাঁধে হাত বুলিয়ে বললেন, একবার সংঘাতময় পরিস্থিতিতে উদ্ধার কাজ পরিচালনার সময় মর্টার শেলের আঘাতে আমি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলাম। কিন্তু এরপরও আমি রেড ক্রস ছেড়ে যাইনি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানব সেবার ক্ষেত্রে ঝঁকিপূর্ণ যে অবস্থানটি রয়েছে সেখানে কাজ করার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই আমরা নিয়োজিত হয়েছি। এখন প্রকৃত প্রয়োজনের সময় কেউ যদি সেটা অস্বীকার করেন তবে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারেন। আমরা সেই ধরনের সাহসী যুবকদেরকে খালি পদসমূহে স্থলাভিষিক্ত করবো যারা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত।

জাঁ পিয়ের গন্তার্দের বক্তব্যের পর সবাই যখন নীরব, তখন আমি বললাম, উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা আমাদের কর্মপন্থা নির্ণয় করবো এবং সময়ের অপচয় না ঘটিয়ে কিভাবে সঠিক কাজটি করা যাবে তাৎক্ষণিকভাবে সেই পরিকল্পনা নিয়ে তা বাস্তবায়ন করবো।

জাঁ পিয়ের গন্তার্দ এবং ট্যাডি দুজনাই আমাকে সমর্থন করলেন। আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনার পর আমরা ঘুমাতে গেলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে লতিফ আমাকে বললো যে এতো ঝুঁকি নিয়ে সে আর রেড ক্রসের কাজ করতে চায় না।

এরপর জাঁ পিয়ের গন্তার্দ পাকিস্তানি সেনা কমাণ্ডারের সাথে সাক্ষাৎসহ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করলেন। আমি ট্যাডির সাথে ফেনী শহরে সরকারী হাসপাতাল প্রত্যক্ষ করার জন্য সেখানে গেলাম।

যাওয়ার পথে দেখলাম, রাস্তার পাশে বেশ কয়েকটি ট্রাক উল্টে পড়ে রয়েছে। অনেক সেতু আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। রাস্তায় পুঁতে রাখা মুক্তি বাহিনীর মাইন অথবা ডিনামাইট বিস্ফোরণে এসব সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে সময়ে পাকিস্তানি সেনাদের সরবরাহের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরিবহণ ব্যবস্থার উপর উপর্যুপরি হামলার কৌশল অব্যাহত ছিল।

ফেনী হাসপাতালটির শয্যা সংখ্যা কত এবং ব্যবস্থাপনা কেমন তা দেখাই ছিলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। হাসপাতালের শল্যচিকিৎসক আতিয়ার রহমানের সাথে পরিচয় হলো। ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটির তিনিই একমাত্র ডাক্তার। তাঁর কাছ থেকে জানা গেলো যে কয়েকদিন পূর্বে ফেনীর অদূরে পাকিস্তানি সেনা

বোঝাই করা ট্রেনে বোমা ফাটানোর ফলে অনেকে হতাহত হয়েছিল। আহত ব্যক্তিরা এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আতিয়ার রহমানের সাথে আলোচনার পর আমরা ঘটনাস্থল দেখতে গেলাম। দেখলাম, মাটিতে কয়েকটা ট্রেনের বগি পড়ে রয়েছে এবং তাতে অসংখ্য গুলির চিহ্ন।

আমাদের কাছে এগিয়ে আসা একজন যুবকের কাছ থেকে জানা গেল যে, ঐ আক্রমণে ছয়জন মুক্তিসেনা নিহত হলেও তাঁরা ৩৮ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেছিলো। যুবকটি আরো বললো যে, মুক্তি বাহিনীর সংখ্যা এখন অনেক বেড়েছে এবং পাকিস্তানিদেরকে হটিয়ে দিতে আর বেশী সময় লাগবে না।

নোয়াখালীতে দিনতিনেক অবস্থানের পর জাঁ পিয়ের গন্তার্দসহ আমরা চট্টগ্রাম অভিমূখে রওয়ানা হলাম। পথে বেশ কিছু ভগ্ন সেতু পরিলক্ষিত হলো। কোন কোন জায়গায় ভগ্ন সেতুর নিচ দিয়ে বিকল্প পথে যেতে হলো। ফোর-হুইল-ড্রাইভ জীপ থাকায় এসকল পথে চলতে আমাদের কোনরূপ বেগ পেতে হলো না। চট্টগ্রাম পৌঁছে আমরা আগ্রাবাদ হোটেলে গিয়ে উঠলাম।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে হেগস্ট্রমের সাক্ষাত পেলাম। সকালের সম্ভাষণ বিনিময়ের পর তিনি সাদরে তাঁর পাশের চেয়ারটায় আমাকে বসতে বললেন। আমার নোয়াখালী সফর সম্পর্কে বিশদ জানার পর প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থায় চট্টগ্রামের ভূমিকা কেমন হতে পারে তা নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন।

তিনি বললেন, পুরো উপকূল বরাবর জেলাগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম ও বরিশাল অবস্থানগত কারণে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং এ শহর দুটোকে আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে। এ শহর দুটোর যাতায়াত ব্যবস্থা জলযান ও স্থলযান উভয়টি দ্বারা ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত, এখানে ওয়্যারহাউজ সহজলভ্য বিধায় জরুরি ত্রাণ সামগ্রী সংরক্ষণ করা যাবে, এখানে আমাদের নিজস্ব যানবাহন ও জলযানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা যাবে এবং বেতার যন্ত্রাদি ও সাংকেতিক যন্ত্রাদির মেরামত কারখানা স্থাপনের জন্য এটি আদর্শ স্থান হতে পারে।

আমি হেগস্ট্রমের যুক্তি সমর্থন করে বললাম যে, এই দুইটি শহর লজিষ্টিক হাব হিসাবে গড়ে তোলা গেলে থানা পর্যায়ে প্রয়োজন মত সরবরাহ নিশ্চিত করাটা সহজ হবে। হেগস্ট্রম আমাকে সমর্থন করে বললেন, উপকূলীয় কুড়িটি থানায় একনাগাড়ে কার্যক্রম শুরু করলে বিপুল পরিমাণে লজিষ্টিক সহায়তা প্রয়োজন

হবে যা এই দুই শহর থেকে সহজেই সরবরাহ করা যাবে। এ দুটো শহর ছাড়াও কৌশলগত আরো কিছু জায়গা নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন তদারকির কাজ ভালভাবে করা যায়। এরপর হেগস্ট্রমের সাথে বাইরে বেরিয়ে চট্টগ্রাম পোর্ট এলাকা পরিদর্শন করলাম। তিনি এই এলাকার বিপদাপন্নতা উল্লেখ করলেন। এর মধ্যে পোর্ট এলাকার নিচের দিকে বসবাসরত মানুষের প্রস্তুতি ও অপসারণ ব্যবস্থার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করলেন।

আগ্রাবাদ হোটেলে বিস্ফোরণ

সে দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ২৫ অক্টোবর। রাত আটটা বাজে। আমি পাশের রুমে অবস্থানকারী সহকর্মী লাবলুকে নিয়ে বাইরে কোন রেষ্টুরেন্টে গিয়ে ডিনার করবো বলে লিফট্ দিয়ে নিচে নেমে এসেছি, ঠিক এমনসময় আমাদের সন্নিকটে বিশাল এক বিস্ফোরণে সমস্ত হোটেল কেঁপে উঠলো। বিস্ফোরণের সাথে সাথে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অন্ধকারের মধ্যেই আমরা দুজন দেয়াল ধরে আমাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখলাম। চেয়ে দেখলাম যে হোটেলের গ্যারেজের ভিতর ও বাইরে আগুন জ্বলছে। অনেক জানালার কাঁচ ভেঙ্গে গেছে। চারিদিকে ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে। হোটেলের লোকজন ছুটাছুটি করছে কি হয়েছে তা দেখার জন্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর লোকজন এসে হাজির হলো।

কিছুক্ষণ পর বিকল্প আলোর ব্যবস্থা হলো এবং লবির ভেতরের দিকটায় আমাদের ডেলিগেটদের দেখতে পেলাম। বিস্ফোরণের পর হতচকিত হয়ে অনেকেই নিচে নেমে এসেছেন। আমরা ডেলিগেটদের জটলায় গিয়ে হাজির হলাম। একজন উচ্চস্বরে বলে উঠলো ঐতো হারুন ও লাবলু এসে হাজির হয়েছে। চেয়ে দেখলাম যে জাঁ পিয়ের গন্তার্দ হোটেলে অবস্থানরত রেড ক্রসের ডেলিগেটবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণ নিরাপদ রয়েছেন কিনা সেজন্য সকলের অবস্থান নির্ণয়ের জরুরি তল্লাশী চালাচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একমাত্র ট্যাডি ছাড়া সকলের খোঁজ পাওয়া গেলো। আমরা সকলে উদ্বিগ্ন চিত্তে ট্যাডির সন্ধানে নেমে পড়লাম। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন, হোটেলের লোকজন সর্বোপরি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ভীড়ের মধ্যে অবশেষে ট্যাডির দেখা মিললো। হোটেলের বাইরের দেয়ালের

উপর একটা পিলারে ঢেলান দিয়ে নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে নির্বিকারে সে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে যাচ্ছে।

আমরা তাঁর নিকটবর্তী হলে সে নেমে এসে বললো, জায়গাটা ছবি তোলার জন্য মোক্ষম বলে ঐ উঁচুতে দাঁড়িয়েই ছবিগুলো তুলে ফেললাম। বিস্ফোরণের পর হোটেলের বাইরে অবস্থান এবং ঝুঁকিপূর্ণ দেয়ালের উপর উঠে ছবি তোলার জন্য জাঁ পিয়ের গন্তার্দ ট্যাডিকে ভর্ৎসনা করতে ছাড়লেন না। পরে জানা গেল যে গেরিলাদের পুঁতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে হোটেলের ট্রান্সফরমার বিধ্বস্ত হয়েছে এবং পার্কিংয়ে রাখা ছয়টি গাড়ি ও মাইক্রোবাস আগুন লেগে পুড়ে গেছে।

এরপর আমরা আর বাইরে বেরুলাম না। হোটেলেই আমাদের ডিনার পর্ব সেরে নিলাম। খাবার টেবিলে লাবলু বেশ পুলকিত হয়ে নিচু কণ্ঠে বললো, মুক্তিসেনাদের এই যে অভিজাত হোটেলে বোমা বিস্ফোরণ তার মূল কারণ হলো, যুদ্ধ যে চলছে তা বহিঃবিশ্বকে জানান দেওয়া। বিগত ১২ আগষ্ট ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তখন ঐ বোমাটি হোটেলের দোতালার শৌচাগারে বিস্ফোরিত হয় এবং আজকের মতই প্রচণ্ড আওয়াজে পুরো হোটেল কেঁপে উঠে। বিস্ফোরণে একজন মার্কিন নাগরিক নিহত হন এবং ৪১ জন আহত হন। আসলে ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের সামর্থ ও কৌশল খাটিয়ে আন্দোলনটাকে একটা আশাব্যঞ্জক অবস্থানে নিয়ে এসেছে এবং দেশের সব এলাকাতেই প্রতিনিয়ত যুবকেরা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করছে।

আমি লাবলুর সাথে একমত পোষণ করে আমাদের রুমে চলে গেলাম। সদ্য বিস্ফোরণের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মধ্যেও একটা আশার আলো যেন হৃদয়টাকে দোলা দিয়ে গেল।

পরদিন বিকেল বেলা লাবলুর সংগৃহীত তথ্যমতে চট্টগ্রাম শহরের এক প্রত্যন্ত গলিতে অবস্থিত একট মেসে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফারুক হাসান ওরফে খোকন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর কাছ থেকে আমরা চট্টগামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনেক তথ্য জানতে পারলাম। খোকন ভাইয়ের পরামর্শ মতে চট্টগ্রাম শহরের কতিপয় এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে খোকন ভাই বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটিতে একজন কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেছিলেন।

চট্টগ্রাম থেকে হাতিয়া নৌকা ভ্রমণ

জরুরি পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম থেকে হাতিয়ায় মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে বোট ব্যবহার কতটা যুক্তিসঙ্গত তা নিয়ে অভিজ্ঞজনদের সাথে আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে। জাপানিজ ডেলিগেট ট্যাডি এই পরীক্ষার স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বললেন যে চলমান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কোন কারণে যদি কার্গো জাহাজ পাওয়া না যায় তবে সমুদ্রে চলার উপযোগী বিশাল আকারের দেশীয় বোট ব্যবহার ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না, সুতরাং বিষয়টি পরীক্ষা করা জরুরি। ভাড়া যাচাই ও দর কষাকষির পর ১৫০ টন বহন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পালতোলা বোট নির্ধারণ করা হলো। জাপানি জাহাজ ওয়াকাসামারু থেকে খালাস করা ৫০ টন পুরোনো চাল এবং চীন থেকে আসা ৪০ টন মোট ৯০ টন চাল নিয়ে ২৯ অক্টোবর আমরা চট্টগ্রাম থেকে হাতিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

সমুদ্রে নৌকা ভ্রমণ আমার জীবনে এটাই প্রথম। কর্ণফুলী নদী দিয়ে বন্দর এলাকা পেরিয়ে আমরা সমুদ্র মোহনায় এসে পৌঁছলাম। নদী ও সমুদ্রের মিলনস্থলে ঢেউ বেশী হওয়ায় নৌকার সারেং ও নয় জন মাঝি সবাই আল্লাহতালার নাম জপতে শুরু করলেন। সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তারা মানতও করে ফেললেন। বড় বড় ঢেউয়ের কারণে বোটটা এদিক সেদিক দুলছিল কিন্তু ট্যাডি ও জাঁ পিয়ের গন্তার্দের আচরণে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। আমি কিছুটা ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই তবে একইসাথে ঐ বিপদাপন্ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও উপভোগের মাধ্যমে দুর্দান্ত অভিজ্ঞতাও লাভ করছিলাম।

ঐ বোটে কোন ইঞ্জিন ছিলনা। বাতাস ও সমুদ্রস্রোত ছিল বোটের চালিকাশক্তি। রাতের বেলায় অগণন তারার মেলা দেখে বিস্মিত হলাম। মনে হলো জীবনে এত তারা একসাথে আকাশে কখনো দেখিনি। উন্মুক্ত সমুদ্রবক্ষ, মৃদুমন্দ দখিনা বাতাস, আকাশ ভরা তারকারাজী, একাদশী চাঁদের মায়াভরা আলো সব মিলিয়ে এক অপার্থিব ও নৈসর্গিক দৃশ্য। সমূদ্র ভ্রমণের বেশীরভাগসময়ই আমি বোটের ছইয়ের উপরে বসে প্রকৃতিকে উপভোগ করলাম। সমুদ্রের নীল জলে তরঙ্গের পশরা ছড়িয়ে পালতোলা বোট বাতাসের তোড়ে তরতর করে এগিয়ে চলেছে। বিস্তৃত ও ফাঁকা চারিদিক। নীল আকাশ পরিব্যপ্ত নীল জলরাশির ঐ অনবদ্য

দৃশ্যাবলী অবলোকন ও উপভোগ করতে ট্যাডি এবং জাঁ পিয়ের গন্তার্দ ছইয়ের উপর উঠে আমার সঙ্গী হলেন বারংবার। বোটে রান্নাকৃত খাবারগুলোও পরম তৃপ্তির সাথে আমরা খেয়েছি যদিও ঝাল কম রাখার জন্য বোটের বাবুর্চীকে আমি প্রথম থেকেই নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলাম।

বাতাসের জোর বেশী না থাকায় বোটের পালেও তার প্রতিফলন ঘটেনি ফলে ধীরগতিতেই চলতে হয়েছে আমাদেরকে। বাতাসের সঞ্চালনের ফলে মাঝে মধ্যে ছোট ছোট ঢেউ ছাড়া বিশাল জলরাশি আয়নার মতোই মসৃণ। ভাবতে অবাক লাগে যে সুস্থির এই পানিই আবার ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রবল বেগে উপকূলে আছড়ে পরে শত শত মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাতে ঘুমানোর সময় মনে মনে ঠিক করলাম যে সূর্যোদয় দেখবো।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে ক্যাবিনের বাইরে এসে দেখি যে ট্যাডি আমার আগেই ক্যাবিনের ছাদে বসে আছে। সকালবেলার অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে বিমোহিত হলাম। চারিদিক তখনো আবছা অন্ধকারে ছাওয়া। পূবাকাশে সামান্য আলোর স্ফুরণ। আলোর এই পশার ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকলো। এরইমধ্যে হালকা লাল রংয়ের সূর্যটা উঁকি দিয়ে আলোর বহ্নি ছড়িয়ে দিতে থাকলো। সাগরের অনন্ত জলরাশির মধ্যে উদীয়মান আলোর গোলকটি যেনো এক আনন্দ নৃত্যের সূচনা করলো। আলোর বন্যা দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। সে এক অপার্থিব দৃশ্য।

যদিও পথিমধ্যে আমরা অনেকগুলো হাওয়াতাড়িত পালতোলা বোটের দেখা পেলাম যেগুলো মালামাল নিয়ে উপকূলের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করছিল। প্রতিটি বোটের পাল অন্যটির চেয়ে আলাদা। লাল, নীল, সবুজ, সাদা এবং নানা বর্ণের ডিজাইন করা পালতোলা বোটগুলো উন্মুক্ত সাগরের বুকে বিমূর্ত ছবির মতোই লাগছিলো। সন্দীপের উপকূলরেখা মিলিয়ে যাওয়ার পর আসলেই বোটের গতি কমে গেল, এর মধ্যে আবার জোয়ার ভাটার প্রতিক্রিয়াতে চলার গতিতে বেশ প্রভাব পড়েছে বলে আমার মনে হলো।

অবশেষে প্রায় চল্লিশ ঘন্টার এক সমুদ্র ভ্রমণের পর আমাদের বোট হাতিয়া দ্বীপে এসে নোঙর করলো। সেদিন বিষয়টি আমার কাছে গতানুগতিক মনে হলেও আজ যখন সেই সমুদ্রভ্রমণের কথা ভাবি তখন আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে আমরা নিজেদের নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে সেদিন নিতান্তই বোকামীর পরিচয়

দিয়েছিলাম। আমাদের ভাগ্য ভাল ছিল যে সমুদ্রপথে আমরা পাকিস্তানি নৌবাহিনীর কোন জাহাজের সম্মুখীন হইনি অথবা অন্য কোন বিপদ আপদও আমাদের মোকাবিলা করতে হয়নি। হাতিয়া দ্বীপে তখনকার সময়ে কোন উপযুক্ত গুদাম না পাওয়ায় আমাদের সাথে করে নিয়ে আসা ৯০ মেট্রিক টন চাল হাতিয়া দ্বীপের উত্তর পশ্চিম পাশে হুজিমিজি ঘাটের সন্নিকটে মাইজচরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে খোলা আকাশের নিচে স্তূপীকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হলো এবং বড় ত্রিপল দিয়ে ঢেকে সার্বক্ষণিক নজরদারীর জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করা হলো।

স্বাধীন হলো হাতিয়া

হাতিয়া পৌঁছার পর আমরা এখানকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডাকবংলায় অবস্থান নিয়েছি। দুটো মাত্র রুম, মানুষ তিনজন। সিদ্ধান্ত হলো যে ট্যাডি ও আমি এক রুমে থাকবো এবং জাঁ পিয়ের গন্তার্দ অন্য রুমটিতে থাকবেন। এক দীর্ঘ সমুদ্র ভ্রমণের পর আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

মধ্যরাতের পর প্রচণ্ড গুলির শব্দ ঘুম ভেঙ্গে গেলো। জাঁ পিয়ের গন্তার্দ আমাদের রুমে চলে এলেন। আমরা বুঝতে পারলাম যে মুক্তি বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের বাংলোর আশপাশ দিয়েও অনেক গুলি বাতাসে সোঁ সোঁ আওয়াজ তুলে ছুটে যাচ্ছিলো।

এই অবস্থার মধ্যে বাইরের দৃশ্য দেখার জন্য ট্যাডি উত্তর দিকের একটি জানালা খুলে ফেললো। আমি এবং জাঁ পিয়ের গন্তার্দ নিচু হয়ে ফ্লোরে শুয়ে প‌ে ট্যাডিকে জানালা বন্ধ করতে বললাম। কিন্তু নির্বিকার ট্যাডি একরাশ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললো যে গুলি আমাদের দিকে আসবে না। কিছুক্ষণ পর গোলাগুলি কিছুটা স্তিমিত হলো। দূর থেকে কিছু একটা কোলাহল শোনা গেল। চাঁদের আলোতে বাইরের দৃশ্য বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম চারজন মুক্তিযোদ্ধা রাইফেল হাতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ট্যাডি জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন?

ওদের মধ্যে একজন বললো, রাজাকারের কমাণ্ডার পালিয়েছে, আমরা তাকে খুঁজতে এসেছি।

ওদের সাথে কথাবার্তায় জানা গেল যে মুক্তিবাহিনীর ৪০০ গেরিলা সদস্য হাতিয়া দ্বীপে বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে অবস্থান নিয়েছে। ভীতসন্ত্রস্ত রাজাকারেরা একটি গুলিও না ছুড়ে জীবন বাঁচানোর শর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। চারিদিক থেকে যে গোলাগুলি হয়েছে তা এককভাবে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে কৌশলগত ফাঁকা গুলি ছিল তা আমরা বুঝতে পারলাম। কিন্তু ওদের কমাণ্ডার সৈয়দ অবস্থা বেগতিক দেখে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা চারিদিকে তার খোঁজ করছে। রাত দেড়টা নাগাদ গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেল।

মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা আমাদেরকে তাঁদের কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে গেলেন। ফ্ল্যাড লাইটের আলো জ্বালিয়ে রাজাকারদের ঘাঁটি আলোকিত করা হয়েছে। রাজাকারদেরকে বিভিন্ন কক্ষে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়েছে। কালো পোষাকধারী মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের অনেকেই তখনো রাইফেল তাক করে মাটিতে শুয়ে কিংবা বসে রয়েছে। ওদের সতর্ক পদচারণা ও প্রায় সবারই মুখে দাঁড়ি গোঁফে ছাওয়া দেখে আমার শরীরে শিহরণ বয়ে গেলো, আমি দারুণভাবে রোমাঞ্চিত হলাম। মনে মনে ভাবলাম যে আমিওতো মাত্র কিছুদন পূর্বে ওদের মতো সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ করবো বলে মনস্থির করেছিলাম কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তা পারিনি, তবে আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমিওতো মুক্তিযুদ্ধ করে চলেছি। আমি যাদের সাথে কাজ করছি সেই ট্যাডি এবং হেগস্ট্রম যুক্তিসঙ্গতভাবেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ অবলম্বনকারী দুইজন নিবেদিতপ্রাণ মহান ব্যক্তিত্ব, একথা ভেবে আমি আনন্দে আত্মহারা থাকি সারাক্ষণ।

বেশ লম্বা একজন যুবক নাম হালিম, তিনিই ঐ রাতে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী হাতিয়ার কমাণ্ডার। তিনি এসেই আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। হাতিয়া দ্বীপে ঘূর্ণিঝড় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্গত মানুষের সহায়তার জন্য রেড ক্রসের পরিকল্পনার কথা আমরা কমাণ্ডারকে অবহিত করলাম। এক প্রশ্নের জবাবে হাতিয়াতে রেড ক্রসের মজুদ ত্রাণসামগ্রীর পরিমাণ এবং বিতরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কমাণ্ডারকে অবহিত করলাম। কমাণ্ডার হালিম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের তিনজনকেই আরো কিছু প্রশ্ন করলেন। সর্বোপরি তিনি ও তাঁর বাহিনী কিভাবে হাতিয়ায় এলেন এবং রাজাকারদেরকে অস্ত্রমুক্ত করলেন তা বললেন। ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ এসে হাজির হলেন এবং একরাশ বিজয়ের হাসি নিয়ে কমাণ্ডার হালিমের সাথে করমর্দন করলেন।

তিনি ট্যাডিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বলেছিলাম না যে হাতিয়ার মুক্তি সময়ের ব্যাপার মাত্র, এখন দেখলেন তো সবার আগে আমরাই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন করে ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেললাম। কমাণ্ডার হালিম ও ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা যখন ডাকবাংলোতে ফিরে এলাম তখন রাতের শেষ প্রহর, পূর্ব দিগন্তে মৃদু আলোর স্ফুরণ। আমি বাংলোর বারান্দাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সূর্য উঠলো, নতুন সূর্য। আজ সূর্যটাকে বেশী লাল বলে মনে হলো।

হাতিয়ায় ত্রাণ কার্যক্রমের প্রস্তুতি

বিগত ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের অব্যবহিত পর যৎসামান্য ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছিল। এবার পূর্ণাঙ্গভাবে ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করার জন্য যে সকল প্রস্তুতি প্রয়োজন তা পর্যালোচনা করে বাস্তবায়নের জন্য আমরা উদ্যোগী হলাম। ট্যাডি আমাকে জাপানিজ রেড ক্রস টিমের কর্ম-পরিকল্পনা বর্ণনাকালে বললেন যে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে নানাবিধ রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার



হাতিয়া দ্বীপে রেড ক্রসের কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্য ট্যাডি স্থানীয় যুবকদের সংগঠিত করছেন

জন্য একটি মেডিকেল টিম অতি সত্বর হাতিয়াতে আগমন করবে এবং তাঁরা পুরো দ্বীপব্যাপী স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া ত্রাণ কার্যক্রমের আওতায় চালসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের কাজ ক্রমাগতভাবেই চলবে। তিনি আরো বললেন যে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রেড ক্রসের একটি অফিস প্রয়োজন, একই সাথে মেডিকেল টিমসহ অন্যান্য ডেলিগেটদের আবাসন ব্যবস্থাও নির্ধারণ করতে হবে। এ বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং তিনি থানা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বাসস্থানের জন্য নির্মিত কয়েকটি দোতলা ভবন প্রাপ্তির সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

আমরা ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদের সাথে আবার দেখা করে অফিস ও আবাসন সংক্রান্ত বিষয়টির গুরুত্ব পুনর্বার ব্যক্ত করলাম।

তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন, থানা কর্মকর্তাদের বাসস্থানের জন্য নির্মিত চারটি দোতলা ভবনের মধ্যে তিনটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তবে ভবনগুলো অনেকদিন যাবৎ খালি অবস্থায় রয়েছে বিধায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার অঙ্গীকার করে আমরা ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদকে ধন্যবাদ জানালাম। তাঁর অফিস থেকে বের হয়েই আমরা ভবনগুলো পরিদর্শন করলাম। দোতলা মোট চারটি ভবনের দুটি পশ্চিমমূখী এবং দুটি দক্ষিণমূখী। সবগুলোই খালি পড়ে রযেছে। ভবনগুলোর সামনে প্রায় পঞ্চাশ ফুট প্রশস্ত জায়গার পর ছোট্ট একটি পুকুর। অতিশয় খোলামেলা পরিসরে নির্মিত ভবনগুলো দেখে আমার ভাল লাগলো। আমাদের অফিস ও বাসস্থান হিসাবে ভবনগুলো আদর্শ ও যথাযথ হবে বলে আমি অভিমত পোষণ করলাম এবং ট্যাডিও আমাকে সমর্থন করলেন।

ইত্যবসরে মুক্তিবাহিনীর উপ-আঞ্চলিক কমাণ্ডার ও হাতিয়া মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার মোঃ রফিকুল আলম ৪ নভেম্বর হাতিয়ায় ফিরে এসেছেন। সদ্য স্বাধীন হাতিয়ায় তাঁর অনেক ব্যস্ততা। একদিন একটি খোলা জীপে ধুলি উড়িয়ে তিনি দক্ষিণের কোন এলাকা থেকে ফিরছিলেন, আমরা হাত তুলে তাঁকে সম্ভাষণ জানালাম। তিনি সজোরে ব্রেক কষে গাড়ীটি দাঁড় করাতে সচেষ্ট হলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্তত পনেরো গজ সামনে এগিয়ে গিয়ে গাড়ীটি থামলো। রফিক গাড়ী থেকে নেমে আমাদের সাথে করমর্দন করলেন এবং হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে বললেন, আমার গাড়ীর ব্রেকে সমস্যা আছে তাই জায়গামতো থামতে পারি না, কিছু মনে করবেন না।

গাড়ীতে উপবিষ্ট সশস্ত্র কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা গাড়ী থেকে নেমে রফিকের পেছনে দণ্ডায়মান হলো। আমরা রেড ক্রসের দুর্যোগ ত্রাণ ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনার বিষয়টি তাঁকে জানালাম। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সংস্কৃতিমনা রফিকল আলম আমাদের কার্যক্রমের গুরুত্ব মুহূর্তের মধ্যেই অনুধাবন করে বললেন, আসলে ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে হাতিয়া এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে যা ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখিনি। এখানে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। আমার পরিবারেরও বেশ কয়েকজন সদস্যকে আমরা ঐ ঝড়ে হারিয়েছি এবং আমি নিজেও মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছি। সুতরাং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের যে কোন প্রয়াসকে আমি স্বাগত জানাই। আপনারা আমাকে সর্বদাই আপনাদের পাশে পাবেন। একই সাথে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি কারণ খাবারসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াটাই এখন জরুরি এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে। ইতিপূর্বে আপনারা যে ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়েছেন তা কিন্তু মানুষের উপকারে এসেছে।

কিছুদিন পূর্বে হাতিয়ার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য যে খাদ্যসামগ্রী, কম্বল, লাইফ জ্যাকেট, ক্রোকারীজ ইত্যাদি বরাদ্দ দিয়েছেন সেগুলো আমাদের ভীষণ কাজে লেগেছে এবং এজন্য মুক্তি বাহিনীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কমান্ডার রফিকের ধন্যবাদের জবাব দিতে গিয়ে আমি বললাম, এজন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই। আমরা আমাদের কর্তব্যটুকুই করেছি মাত্র। আমাদের ত্রাণ, প্রয়োজনের নিরিখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরণ করা হয় এবং সে ভাবেই আমরা তা বিতরণ করেছি।

কমান্ডার রফিক বললেন, প্রথমদিকে আপনাদের সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা ছিল, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাদেরকে আমেরিকার চর বলেও ধারণা করেছিলো। আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে যদি বৈপরীত্য কিছু দেখা যায় তবে আপনাদের জন্য যথাযথ অপারেশনের ব্যবস্থা যেনো কার্যকর করা হয়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে আপনারা আমাদের সত্যিই বন্ধুজন।

ট্যাডি একটা হাসি দিয়ে বললো, আমি দেশে ফিরে গিয়ে আপনাদের মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে পুস্তক রচনা করবো।

কমান্ডার রফিক বললেন, হাতিয়া মুক্ত হলেও দেশ এখনো পরাধীন এবং মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করাই এখন আমাদের প্রধানতম কাজ। তবে দেশ স্বাধীন হতে আর বেশীসময় বাকী নেই। যা হোক আমার ব্যস্ততা কিছুটা কমলে আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে আপনাদের সাথে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো বলে আশা রাখি।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ঐ আলোচনার শেষে ট্যাডি বললো, হাতিয়াতে রেড ক্রসের কাজে সত্যিকারভাবে যে লোকটি আমাদেরকে সহায়তা করতে পারে সে হচ্ছে এই রফিকুল আলম সুতরাং তাঁর কথা আমাদেরকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে। এরপর কয়েকদিন আমরা অফিস স্থাপন ও গোছগাছের প্রতি মনোযোগী হলাম। অফিসের কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য কর্মকর্তা হিসাবে স্থানীয় যুবক মঈনউদ্দিন এবং গার্ড হিসাবে লোকমানকে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

হাতিয়া - রামগতি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব দেলোয়ার হোসেন হাতিয়া মুক্ত হওয়ার পর ৫ নভেম্বর হাতিয়াতে ফিরে এলেন। মে মাসের ১০ তারিখে পাকিস্তানি সেনাদের হাতিয়া আক্রমণের পর তিনি মনপুরা হয়ে রামগতিতে পালিয়ে যান। পাকিস্তানিরা তাঁর বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং সেই পোড়া ভিটাতেই পুনরায় তিনি ঘর নির্মাণ করেছেন। তাঁর নিমন্ত্রণে আমরা তাঁর বাড়িতে সমবেত হয়েছি। কমাণ্ডার রফিক, ম্যাজিষ্ট্রেট আহমেদ এবং স্থানীয় কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন। তখন রমজান মাস, আমরা ইফতার করছিলাম এবং একইসাথে নানাবিধ আলোচনাও করছিলাম।

প্রসঙ্গক্রমে আমি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রেড ক্রসের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরলাম। সাংসদ দেলোয়ার হোসেন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শুনলেন এবং বললেন, এতো আমাদের প্রাণের কথা এবং এ ধরনের কোন প্রচেষ্টা যদি আপনারা গ্রহণ করেন তবে আমি আপনাদেরকে পাশে থাকবো এবং সার্বিক সহায়তা প্রদান করবো।

কমাণ্ডার রফিক বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বললেন যে বিগত ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের প্রাক্কালে আগাম সতর্ক সংকেত না পাওয়ার ফলে ক্ষয়ক্ষতি এতটা মারাত্মক হয়েছে। দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমণের সঠিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে না পারলে আমরা আমাদের বহুবিধ ঝুঁকি হ্রাস করতে পারবো না। সুতরাং আপনাদের এই মহৎ উদ্যোগের প্রতি আমাদের অভিনন্দন। আমরা নিশ্চিত যে এই উদ্যোগে হাতিয়া দ্বীপের সবাই আপনাদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে।

হাতিয়া থেকে নোয়াখালী গমন

১১ নভেম্বর ট্যাডি ও আমি স্থানীয় দাঁড়টানা বোটে হাতিয়া চ্যানেল পার হয়ে চর জব্বার পৌঁছলাম। চর জব্বার ঘাটে বেশ কয়েকটি চায়ের দোকান রয়েছে। উন্মুক্ত নদীর পারে খোলা চায়ের দোকানে বসে চা পানের মজাটাই আলাদা। ট্যাডিকে নিয়ে চায়ের দোকানে বসলাম।

হঠাৎ করেই লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরিহিত সুঠামদেহী একজন যুবক আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে বললো, আমার নাম ফজলুল হক। চর বাটা বাজারের পাশে আমার বাড়ী। আপনাদের কোন সহযোগিতা করতে পারলে আমি খুশি হবো।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের ত্রাণ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করলাম। এরপর ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের কথা শুনতেই তাঁর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। আমাকে নিবৃত্ত করে ফজলুল হক বললেন, বিগত ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের মতো এতো প্রবল ঝড় আমি কখনো দেখিনি। এই যে এলাকা দেখছেন তা সেদিন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষের লাশ সেদিন সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। উপায়ন্তর না দেখে আমি আমার লোকজন নিয়ে নিজে হাতে ১৭০০ মৃতদেহ কবর দিয়েছি। আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন সেদিনের সেই সর্বনাশা ঝড়ে ভেসে গিয়েছিল, তাঁদের অনেকের লাশও খুঁজে পাইনি। শোকে ও দুঃখে জর্জরিত হলেও সেদিন আর্ত ও দুঃস্থ মানুষের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলাম।

ফজলুল হক সাহেবের মানবতাবোধের পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হলাম। তাঁর বক্তব্য ট্যাডিকে তরজমা করে বলার পর ট্যাডি ক্যামেরা বের করে তাঁর কয়েকটা ছবি তুলে নিলেন। আমি বললাম যে আপনার মত নিবেদিতপ্রাণ মানুষজনইতো আমরা খুঁজছি। আপনার সাথে অচিরেই দেখা হবে বলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পরবর্তী সময়ে জনাব ফজলুল হক সিপিপি-র থানা টিম লীডার হিসাবে বিরাট অবদান রেখেছিলেন। তিনি একজন সরল মনের মানুষ ছিলেন এবং মানবতাবোধে বিশ্বাসী ছিলেন।

এরপর বেবী ট্যাক্সি নিয়ে নোয়াখালী পৌঁছলাম। মাইজদী কোর্টে অবস্থিত রেড ক্রসের অফিসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। ১২ নভেম্বর সকালের নাস্তার

টেবিলে ভোলা সাইক্লোনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমি বললাম যে এক বছর পূর্বে আজকের এই দিনে কি নিদারুণ ঘূর্ণিঝড়টাই না হয়েছিল, ঝড়ের সাথে প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসের কারণেই মূলত এতো অধিক সংখ্যায় প্রাণহানী ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে একটা প্রাণবন্ত আলোচনার সূত্রপাত ঘটলো।

ট্যাডি অভিমত পোষণ করলেন যে ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্দান্ত প্রাকৃতিক শক্তির মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও প্রশমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণনাশ রোধ করা সম্ভবপর হবে না। জাঁ পিয়ের গন্তার্দ উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হবার এক বছর পরও আমি উপকূলীয় এলাকায় যে সকল ধ্বংসযজ্ঞের নিদর্শন পেয়েছি তা আমাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করেছে। আমি আশ্চর্যান্বিত হই যখন দেখি যে সুদীর্ঘ বৃটিশ শাসন এবং পাকিস্তানি শাসন আমলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে তদানীন্তন সরকারগুলো ন্যূনতম গুরুত্বও আরোপ করেনি। গন্তার্দের কথার রেশ ধরে ট্যাডি বললো, যে সরকার জনমানুষের মধ্য থেকে এবং জনমানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না তারা মানুষের কল্যাণের চেয়ে নিজেদের স্বার্থকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মমত্ববোধ এমনকি আর্ত মানবতার কোন ক্রন্দন তারা শুনতে পায় না।

পাকিস্তানি সেনাদের অনধিকার চর্চা

১৩ নভেম্বর রাতে আমরা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। সরকারি বাহিনীর কয়েকজন সেনা আমাদের অফিসে ঢুকে টেলিফোনের লাইন খুলে টেলিফোন অকেজো করে দিলো। তারা ছাদে উঠে বালুর বস্তা ফেলে ফেলে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী করতে থাকলো। আমরা বললাম যে, রেড ক্রসের কোন স্থাপনা সামরিক স্থাপনা হিসাবে ব্যবহার করা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। কিন্তু তারা আমাদের কোন কথা না শুনে তাদের কাজ সমাপ্ত করে চলে গেল। আমি ছেঁড়া তারে সংযোগ দিয়ে টেলিফোন সচল করে তুললাম। ট্যাডি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং পাকিস্তানি সেনা ছাউনিতে ফোন করে প্রতিবাদ জানালেন।

পরদিন সকালে একজন লেফটেন্যান্ট আমাদের অফিসে এসে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন যে, এই এলাকায় গোলযোগ দেখা দেয়ায় এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ায় এই কাজটি সংঘটিত হয়েছে। বালির বস্তাগুলো সরিয়ে দিয়ে লেফটেন্যান্ট ও

তাঁর সাথে থাকা দুজন চলে গেলেন। অতি সহজেই ঘটনাটির নিষ্পত্তি হলো বলে আমরা স্বস্তি পেলাম। তবে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে মুক্তি বাহিনীর চোরাগুপ্তা আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা ক্রমান্বয়ে কঠিন একটা অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছে। জাঁ পিয়ের গন্তার্দ নোয়াখালী অফিসের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদেরকে ডেকে একটা ব্রিফিং সেশনের ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন যে চলমান যুদ্ধটা একটা পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে অল্পসময়ের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা নোয়াখালী ছেড়ে পালিয়ে যাবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সবাইকে চোখ কান খোলা রেখে কাজ করতে হবে। অফিসের ভেতর কিংবা বাইরে সর্বাবস্থায়ই রেড ক্রসের ভেষ্ট ও ব্যাজ পরা বাধ্যতামূলক হিসাবে গণ্য করতে হবে। লতিফ, তোসাদ্দেক, মেজবাহ্ ও শাহজাহান তাঁদের কতিপয় সুপারিশ পেশ করলেন যেগুলো মূলত জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ছিল।

১৬ নভেম্বর মাইজদী কোর্ট থেকে ট্যাডি এবং আমি চাঁদপুরের উদ্দেশ্য রওয়ানা হলাম। চাঁদপুর থেকে আমাদের ঢাকার লঞ্চ ধরার কথা। কুমিল্লার কাছাকাছি এসে একস্থানে আমাদের জীপের টায়ার ফেটে গেল। বিপত্তি ঘটলো যখন দেখা গেল যে গাড়ীতে সংরক্ষিত হাইড্রোলিক জ্যাকটি কাজ করছে না। আমার নিষেধ সত্ত্বেও ট্যাডি হাত ইশারা করে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ীকে থামানোর ইঙ্গিত প্রদান করলো। জীপ থেকে একজন তরুণ অফিসার নেমে এসে আমাদের জীপের টায়ারটি বদলে দিলেন। ট্যাডি তাকে ধন্যবাদ জানালেন।

আমি ট্যাডিকে বললাম, অফিসারটি কি তার দায়িত্ববোধ থেকে কাজটি করলো নাকি শ্রেফ একজন বিদেশীকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য সহায়তা করলো?

ট্যাডি কোন জবাব না দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

বেলা দুইটায় চাঁদপুর থেকে জাহাজ ছাড়ার কথা। ষ্টীম ইঞ্জিনচালিত জাহাজের একটিমাত্র প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন যা পূর্বেই আমাদের বুকিং করা ছিল। আমরা ক্যাবিনে গিয়ে বসলাম। হঠাৎ করেই একজন সেনা কর্মকর্তা আমাদের ক্যাবিনে ঢুকে পড়লেন। তার সাথের জুনিয়র অফিসারটি বললেন যে লেফটেনান্ট কর্নেল সাহেব এই ক্যাবিনে ঢাকা যাবেন সুতরাং একটি সিট ছাড়তে হবে। ট্যাডি প্রতিবাদ করার পূর্বেই আমি তাঁকে নিবৃত্ত করে বললাম যে আমি ক্যাবিনের বাইরে অন্যত্র সিট নিচ্ছি এবং এতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি ক্যাবিন ছেড়ে

ডেকের একটি বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। এই সেনা কর্মকর্তা যাবেন বলেই লঞ্চ ছাড়তে বিলম্ব হচ্ছিল। লঞ্চ যখন ছাড়লো তখন বিকাল পাঁচটা।

আমাদের লঞ্চ যখন সদরঘাট পৌঁছলো তখন রাত ১০টা পার হয়ে গেছে। আমরা রিক্সায় চেপে হোটেলে যাওয়ার পথে রাস্তায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা কয়েকবার আমাদেরকে থামিয়ে তল্লাশি চালালো। আমি বাঙ্গালী হওয়ায় তল্লাশির মাত্রাটা আমাকে বেশী পোহাতে হলো। এক পর্যায়ে আমার রিক্সা ছেড়ে দিয়ে আমি ট্যাডির রিক্সায় উঠে হোটেলে পৌঁছলাম। যুদ্ধকালীন ঐ সময়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের একটা পুরো ফ্লোর ভাড়া নিয়ে সেখানে আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের অফিস স্থাপন করা হয়েছিল। রেড ক্রসের বিদেশী ডেলিগেটবৃন্দ এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্মকর্তাগণও এই হোটেলে অবস্থান করে তাঁদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিলেন।

পরদিন ১৭ নভেম্বর সকাল থেকে ঢাকায় কারফিউ জারি করা হলো। হোটেল থেকে বেরুনো অসম্ভব তাই লবিতে বসে হেগস্ট্রমের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সাড়ে আটটার পর হেগস্ট্রমের দেখা পেলাম। তিনি আমাকে দেখে স্বস্তির একটা হাসি ছড়িয়ে আমার সাথে করমর্দন করলেন এবং বললেন, এই সকালবেলা তোমাকে দেখতে পাবো ভাবতেই পারিনি, তা কখন হোটেলে পৌঁছালে? রাত ১২টার পর সদরঘাট থেকে রিক্সায় চেপে আমরা হোটেলে এসেছি জানতে পেরে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কাজটি তোমরা মোটেই ভাল করনি, এরকম ঝুঁকি না নিলেই পারতে।

আমি বললাম, আমাদেরতো সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই ঢাকা পৌঁছানোর কথা কিন্তু একজন সেনা কর্মকর্তা যাবেন বলে চাঁদপুর থেকে লঞ্চ ছাড়তে তিন ঘন্টা বিলম্ব হয় এবং রাত দশটার পর আমরা ঢাকায় এসে পৌঁছেছি।

হেগস্ট্রমের সাথে মতবিনিময়

হেগস্ট্রমের আমন্ত্রণে তাঁর সাথে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে বসলাম। তিনি অতি আগ্রহের সাথে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রমের কতিপয় বিষয় আমাকে অবহিত করলেন। দুর্গত এলাকায় সফরলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি একটি যুৎসই কাঠামো তৈরী করেছেন বলে জানালেন। কাঠামোটির বর্ণনাকালে স্থানীয় পর্যায়ের সক্ষমতা সৃষ্টির উপর জোর দিয়ে তিনি বললেন যে আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটা

একেবারে গ্রাম পর্যন্ত প্রলম্বিত করতে হবে এবং একই সাথে যারা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করবে তাঁদের অংশীদারিত্ব ও ক্ষমতায়ন এমনভাবে নিশ্চিত করতে হবে যে এ বিষয়ে কারো কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ না থাকে।

আমি হেগস্ট্রমের কথা শুনছিলাম এবং ভাবছিলাম যে দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে দেশব্যাপী পাকিস্তানি সেনারা প্রমাদ গুনছে আর এমন একটা ভয়ংকর অবস্থার মধ্যেও তিনি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থার উন্নয়ন ভাবনার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত আছেন। মনে হচ্ছিল যে এই বিশ্ব চরাচরে এই কাজটি সম্পাদন ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ নেই। ইতিপূর্বে উপকূলীয় এলাকায় সফরকালে লঞ্চের মধ্যেও তাঁকে রাতদিন চিন্তাশীল দেখেছি। অনেকসময় মনে হতো যে তিনি একজন ধ্যানমগ্ন মানুষ। এমন নিবেদিতপ্রাণ কোন মানুষ ইতিপূর্বে আমি প্রত্যক্ষ করেছি বলে মনে হলো না। তাঁর এহেন বিস্ময়কর প্রজ্ঞা ও নিমগ্নতার পরিচয় পেয়ে আবারও আমি উদ্বেলিত হলাম।

ব্রেকফাস্টের পর হেগস্ট্রম আমাকে তাঁর রুমে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি এখন এখানে বসেই কাজ করি, বলতে পারো এটাই আমার অফিস। রুমের মধ্যে দুটো টেবিল ভর্তি কাগজপত্র, মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো বই ও অনেকগুলো নোটবুক দেখতে পেলাম। ঐ নোটবুকগুলো আমার পরিচিত কারণ উপকূলীয় এলাকায় লঞ্চ ভ্রমণকালীন তাঁকে ওগুলো ব্যবহার করতে দেখেছি। বইগুলোর মধ্যে দেশের পরিসংখ্যান, বঙ্গোপসাগরের প্রকৃতি ও জাহাজ চলাচল, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের খতিয়ান ইত্যাদি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। ইংরেজীতে লেখা বইগুলোর বেশীরভাগই লণ্ডন থেকে মুদ্রিত। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বইও এর মধ্যে রয়েছে।

হেগস্ট্রম বললেন, রেড ক্রসের ভাড়া করা 'বালায়ার' নামের একটি ডিসি-৮ পরিবহণ বিমান এখন ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে প্রতিদিন ঢাকায় কয়েকটি ফ্লাইট পরিচালনা করছে। কয়েকদিনের মধ্যে এই বিমানে করেই পর পর দুটি হেলিকপ্টার ঢাকায় এসে পৌঁছবে।

লীগ অব রেড ক্রসের ঢাকাস্থ চীফ ডেলিগেট সেভন ল্যাম্পেল বিষয়টি তদারকি করছেন। এরমধ্যে একটি হেলিকপ্টার ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। উপকূলীয় এলাকায় দ্রুতগতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে হেলিকপ্টারের ব্যবহার কার্যকরী হবে।

মালামাল ও গাড়ী পরিবহণের যোগ্যতাসম্পন্ন দুটি বৃহদাকার ল্যাণ্ডিং ক্রাফট্‌স জার্মানি থেকে ক্রয় করা হয়েছে। এগুলো সব প্রাপ্তির পর আমরা স্বস্তির সাথে আমাদের কাজগুলো কম সময়ের মধ্যে সমাধা করতে পারবো। এ ছাড়াও একটি দ্রুতগতি সম্পন্ন বোট জাপান থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং গতকাল তা চট্টগ্রাম এসে পৌঁছেছে। ঐ জাপানি বোটের জন্য একজন ক্যাপ্টেন, একজন ইঞ্জিনিয়ার ও তিনজন নাবিক নিয়োগের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। আমি অচিরেই তোমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম যাব এবং জাপানি ক্রু বোট নিয়ে সন্দ্বীপ-হাতিয়া হয়ে ঢাকায় ফিরবো।

এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান রেড ক্রসের অর্গানাইজার জনাব এমদাদ হোসেন আসলেন এবং আমাদের সাথে কথোপকথনে যোগ দিলেন। হেগস্ট্রমের প্রশ্নের জবাবে এমদাদ হোসেন বললেন যে দাপ্তরিক পাস থাকায় কারফিউয়ের মধ্যে চলাচলে তাঁর কোনরূপ অসুবিধা হয়না। এরপর আমাদের দুজনকে নিয়ে হেগস্ট্রম কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলেন এবং তা দীর্ঘসময় ধরে চললো। এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির মধ্যে নতুন একটি অফিস ভাড়া করা, একজন অফিস সেক্রেটারী নিয়োগ, উপকূলীয় এলাকায় গিয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থার প্রস্তাবিত কার্যক্রম সম্মন্ধে থানা প্রশাসনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা করা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল।

ঠিক এই সময়েই প্রচণ্ড শব্দ-তরঙ্গ ছড়িয়ে দুটি বোমারু বিমান হোটেলের উপর দিয়ে খুব নিচু দিয়ে উড়ে গেল। বিমানের শব্দ মিলাতে না মিলাতেই টেলিফোন বেজে উঠল। হেগস্ট্রম টেলিফোনে কথোপকথনের পর জানালেন যে পূর্ব পাকিস্তান রেড ক্রসের চেয়ারম্যান জনাব নুরুল ইসলাম বিদেশী ডেলিগেটদেরকে আজ দুপুরের আহারে নিমন্ত্রণ করছেন।

টেলিফোন রেখে চেয়ার থেকে উঠে হেগস্ট্রম বললেন, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি প্রকল্প সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমি চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করছি সুতরাং সবার সাথে আমিও নিমন্ত্রণে যাব। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে আমাদের কার্যক্রমের অগ্রগতিও চেয়ারম্যান মহোদয়কে অবহিত করা যাবে। চলমান কারফিউয়ের মধ্যেই হেগস্ট্রম অন্যান্য ডেলিগেটদের নিয়ে ওয়ারীর র‍্যাংকিন স্ট্রিটে জনাব নূরুল ইসলামের বাসভবন অভিমূখে রওয়ানা হলেন। সেদিন হেগস্ট্রম নিজেই গাড়ী চালিয়ে সেনাবাহিনীর কয়েকটা তল্লাশী চৌকি ডিঙ্গিয়ে অবশেষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাসভবনে পৌঁছতে সক্ষম হলেন।

পরদিন নভেম্বর মাসের ১৮ই তারিখে হেগস্ট্রম আনন্দচিত্তে এবং সহাস্য বদনে বললেন যে চেয়ারম্যান মহোদয় আমাদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুমোদন করেছেন। এবার আমাদের প্রকল্পের জন্য জনবল নিয়োগ এবং অফিস ভাড়া নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবো। পরবর্তী কয়েকদিন হেগস্ট্রম ও এমদাদ হোসেনের সাথে ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত হলো। অফিসের কাজকর্ম হোটেলের রুমের মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছিলো। ওদিকে জাপানিজ ডেলিগেট ট্যাডির সাথে আমার কাজের সম্পর্ক ও একটা যোগসূত্র থাকায় তাঁর সাথেও আমি নানাবিধ কাজ করে যাচ্ছিলাম। এসকল কাজের মধ্যে আহত ব্যক্তিবর্গকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়া, অসহায় কাউকে সহায়তা প্রদান করা, পাকিস্তানি বাহিনীর হামলায় আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করা ইত্যাদি। আহত লোকজনের মধ্যে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা স্থানীয় পর্যায়ে প্রায় সময়ই গোপনীয়তা বজায় রেখে করা হতো। কখনো কখনো তাঁদের জন্য জীবন রক্ষাকারী জরুরি ঔষধ প্রেরণ করার কাজও আমাকে করতে হয়েছে যা আমি সবসময়েই আনন্দচিত্তেই করে গেছি।

চট্টগ্রাম থেকে ক্রুবোটে ঢাকা গমন

১৯ নভেম্বর প্রত্যুষে সড়কপথে হেগস্ট্রমের সাথে চট্টগ্রাম অভিমূখে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কিছু গাড়ী ও কনভয়ের দেখা পেলাম। বিকাল নাগাদ নির্বিঘ্নেই আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছলাম এবং কর্ণফুলী নদীর একটি ঘাটে জাপানি ক্রু বোটটি পরিদর্শন করলাম। পুরু গ্লাস ফাইবার দ্বারা নির্মিত বোটটিতে রাডার ও ইকো সাউণ্ডার সংযোজিত রয়েছে। বোটটি আকারে বেশী বড় না হলেও সমুদ্র, মোহনা ও নদী দিয়ে চলাচলের জন্য উপযোগী করেই তৈরী। দ্রুতগতি সম্পন্ন বোটটির প্রশস্ত ডেকের মধ্যভাগে দুই বেড বিশিষ্ট একটি সুসজ্জিত ক্যাবিন রয়েছে।

ইঞ্জিন ও ক্রুদের ক্যাবিন রয়েছে নীচ তলায়। হেগস্ট্রম বোটটি পরিদর্শন শেষে ক্যাবিন বেডের ম্যাট্রেস, চাদর, বালিশ, কিছু খাবার সামগ্রী এবং ট্যাঙ্ক ভর্তি জ্বালানী তৈল ক্রয় করার জন্য ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিলেন। নির্ধারিত হলো যে ২১ নভেম্বর প্রত্যুষে বোট নিয়ে আমরা সন্দীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো। এরপর

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ফজলুল হক, ক্যাপ্টেন মোসলেম আলী এবং ক্রুদেরকে নিয়ে বোটটির সংরক্ষণ বিষয়ে কিছু নির্দেশনা দিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলাম।

নির্ধারিত দিন প্রত্যুষে আমরা কর্ণফুলী নদীর ঘাট থেকে সন্দীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই কর্ণফুলীর সংযোগস্থল ছাড়িয়ে আমরা সাগরে এসে পড়লাম। চকচকে নতুন দ্রুতগতির একটা বোটের ডেকে বসে উন্মুক্ত সাগর দিয়ে ছুটে চলার এক বিরল আনন্দ উপভোগ করলাম। এগারটার মধ্যেই ক্রুবোট সন্দীপের ঘাটে এসে পৌঁছলো। বোট থেকে নেমে রিক্সা নিয়ে থানা কমপ্লেক্সে গিয়ে তদানীন্তন সার্কেল অফিসার ডেভেলপমেন্ট এর সাথে দেখা করলাম এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে সন্দীপে রেড ক্রসের কার্যক্রম কি হবে তা জানালাম। সার্কেল অফিসার মহোদয় আরো কয়েকজন কর্মকর্তাকে ডেকে নিয়ে একটি সভার আয়োজন করলেন। হেগস্ট্রম সবিস্তারে রেড ক্রসের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করলেন এবং এই কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সবাইকে অনুরোধ জানালেন। দুপুরের পর জাপানিজ ক্রু বোট আবার যাত্রা শুরু করলো এবং গোধূলবেলায় হাতিয়া ঘাটে এসে পৌঁছুলো।

আমরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেষ্ট হাউজে রাত্রিযাপন করলাম। রফিক ও মঈনউদ্দিনের সাথে ডিনার করলাম এবং মুক্ত হাতিয়ার পরিবেশে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু করার চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা করলাম। পরদিন হাতিয়ায়



সিপিপি-র কাজে ব্যবহৃত জাপানিজ ক্রুবোট

স্থাপিত নতুন অফিসে গিয়ে মঈনউদ্দিন ও লোকমানের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হেগস্ট্রম কথাবার্তা বললেন এবং কিছু নির্দেশনা দিলেন। এরপর আমরা হাতিয়া থেকে ঢাকার উদ্দশ্যে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে বোটের ডেকে বসে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর পরিকল্পনার অনেক কথা আমাকে জানালেন এবং এক বৈচিত্রময় কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমাদের সময় অতিবাহিত হলো। আলোচনার কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমার অভিমত ও সুপারিশ কি হবে তা তিনি আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন। ষড়ঋতুর সবুজ দেশের পলিবিধৌত নদ-নদীর অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে বিকেল বেলা আমাদের ক্রু বোট চাঁদপুর এসে পৌঁছলো। রাতের বেলা বোট চালনা পরিহার করার জন্য ক্যাপ্টেনের অভিমত অনুযায়ী চাঁদপুরে লঞ্চ টার্মিনালে বোটটি নোঙর করে রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত হলো।

হঠাৎ একটি বিষয় আমার নজর কাড়লো, আমি স্পষ্ট দেখলাম যে টার্মিনালে পাহারারত কয়েকজন সেনা সদস্য আমাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করছে। আমি হেগস্ট্রমকে বিষয়টি অবহিত করার পর তিনি আমাকে কোনরূপ চিন্তা করতে বারণ করলেন। কিন্তু সন্ধ্যার কিছুটা পর দুইজন সেনা সদস্য এসে আমাদের সাথে পরিচিত হয়ে বললেন যে মেজর সাহেব আপনাদের সাথে কথা বলতে চান।

হেগস্ট্রম বললেন, কোন অসুবিধা নেই, চলুন এখনই যাওয়া যাক। বোট থেকে নেমে আমরা সেনা সদস্যদের সাথে হাঁটতে শুরু করলাম। চাঁদপুরের দায়িত্বে নিয়োজিত পাকিস্তান আর্মির মেজরের বাসভবনটি টার্মিনালের সন্নিকটেই অবস্থিত। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বিভিন্ন ফুল গাছে সুশোভিত একটি বিশালকায় লনে মেজর সাহেব বসে আছেন। আমাদেরকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন।

হেগস্ট্রমের সাথে করমর্দনকালে তিনি বললেন, টার্মিনাল ঘাটে বোটের ভেতর অবস্থানরত একজন বিদেশীর কথা শুনে মূলত নিরাপত্তার কথা ভেবেই আপনাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছি। কিছু মনে করবেন না, এটা আমাদের দায়িত্বের অংশ হিসাবে গণ্য করবেন। অনুগ্রহ করে আপনারা বসুন।

হেগস্ট্রম একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সহায়তায় পাকিস্তান রেড ক্রসের চলমান কার্যক্রম সম্বন্ধে মেজরকে অবহিত করলেন।

মেজর সাহেব রেড ক্রসের কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন যে স্কুলে পড়ার সময় তিনি জুনিয়র রেড ক্রসের সদস্য ছিলেন এবং সেনা বাহিনীতে যোগদানের পর রেড ক্রস আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হেগস্ট্রমের সাথে মেজরের আলাপচারিতা বেশ জমে উঠলো, বোঝাই যাচ্ছিলনা যে মাত্র দশ মিনিট পূর্বেও তাঁরা একে অপরের সাথে অপরিচিত ছিলেন। অল্প বয়স্ক এই মেজরের ইংরেজী উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গী অত্যন্ত সাবলীল। অল্প সময়ের মধ্যেই প্লেট ভর্তি কাবাব ও নানরুটির আর্বিভাব ঘটলো এবং একই সাথে নানাবিধ পানীয় পরিবেশিত হলো।

আমার মুখ ভর্তি দাঁড়ি ও গোঁফ দেখে মেজর সাহেব আমাকে ইয়াং মৌলভী বলে আখ্যায়িত করে পেট পুরে খাওয়ার জন্য বললেন। আমি বিনয় প্রকাশ করে তাঁদের সাথে খাওয়ায় যোগ দিলাম এবং পান করার বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করলাম। মেজরকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে নীরবে বললাম, মেজর তুমি কি করে বুঝবে যে কেন আমার মুখ ভর্তি দাঁড়ি-গোঁফ? এই দাঁড়ি-গোঁফতো আমি ২৫ মার্চের পর থেকে আর কাটিনি আর কাটবোও না যতদিন না তোমাদের মতো নির্যাতনকারীদের কবল থেকে দেশকে স্বাধীন করতে পারছি।

মেজরের বাসভবনে বসে খাবার গ্রহণে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। হেগস্ট্রমের সাথে মেজরের আলাপচারিতা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে মধ্যরাত পার হবার পরও তা অনর্গল চলতে থাকলো। নীরব দর্শকের ভূমিকায় উপবিষ্ট আমাকেই একপর্যায়ে হস্তক্ষেপ করে বলতে হলো যে প্রত্যুষে আমাদেরকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে এবং জরুরি একটি সভায় যোগদান করতে হবে বিধায় আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করতে পারি। একইসাথে মেজর সাহেবের আতিথেয়তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালাম। মেজর আমার কথার মর্মার্থ অনুধাবন করে আবার আমাদেরকে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে ঐ রাতের আসরের অবসান ঘটালেন। গভীর রাতে টার্মিনালের দিকে যাওয়ার পথে রেল লাইন পার হতে আমি হেগস্ট্রমের সহযোগিতা করলাম। পরদিন প্রত্যুষে রওনা হয়ে সকাল দশটার পূর্বেই জাপানিজ ক্রু বোট ঢাকার সদরঘাটে এসে পৌঁছলো। সদরঘাট থেকে বেবী ট্যাক্সিযোগে যখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পৌঁছলাম তখন এগারটা বেজে গেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রা ও দুরন্ত মুক্তিযুদ্ধ

নভেম্বরের শেষদিকে অবস্থা বেগতিক হয়ে উঠলো। ঢাকা শহরের চারিদিকে মেশিনগান, রাইফেল ও মর্টারের গোলাগুলির আওয়াজ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো। ওদিকে সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সৈন্যদের অগ্রযাত্রা রুখতে পাকিস্তানিরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। ২২ নভেম্বর সীমান্ত থেকে কয়েক কিলোমিটার ভেতরে পশ্চিমবঙ্গের আকাশে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিমানযুদ্ধ সংঘটিত হলো। এতে অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানি দুটি বিমান ভূপাতিত হলো। এই প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৩ নভেম্বর সারা পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর তৎপরতা হঠাৎ করে আরো জোরালো হয়ে উঠলো এবং কৌশলগত স্থানগুলোতে পরিখা খনন জোরদার হতে থাকলো। একইসাথে কারফিউ অব্যাহতভাবে চলতে থাকলো এবং ব্ল্যাকআউটের কারণে রাতের ঢাকা অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকলো প্রতিদিন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য মানুষের ভীড় বেড়েই চললো। পেট্রোল পাম্পে গাড়ীর দীর্ঘ লাইন কারণ গাড়ীপ্রতি দুই গ্যালনের বেশী পেট্রোল মিলছিল না। ঢাকার বিভিন্ন দূতাবাস থেকে তাঁদের নাগরিকদেরকে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো। জাতিসংঘের প্রতিনিধিরাও দেশ ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ বাঁধতে আর দেরী নেই।

পরের দিন শোনা গেল যে সীমান্তের বেশ কয়েকটা জায়গায় ভারত আক্রমণ শুরু করেছে। চালনা বন্দরে প্রবেশ করার সময় একটি ব্রিটিশ জাহাজ গুলিবিদ্ধ হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার সংবাদ প্রতিনিয়তই পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে আবার অন্য রকম কিছু সংবাদও পাওয়া যাচ্ছিল, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র একটা মধ্যস্থতার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী সামনে না এগিয়ে সীমান্ত বরাবর ঘাঁটি নির্মাণ করছে, ইয়াহিয়া খানের ঘনিষ্ট একজন সহযোগী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সাথে আলোচনা শুরু করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ একটা যুদ্ধ বেধে যাবে কিনা তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছে না। তবে পরিস্থিতি যাই হোক রেড ক্রস তার কার্যক্রম বন্ধ রাখতে পারে না।

২৯ নভেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের ডেলিগেটবৃন্দ পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং তাঁদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে একটি বৈঠকে বসলেন। চীফ ডেলিগেট সেভন ল্যাম্পেল অবতারণিকায় বললেন যে চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সবাই ওয়াকিবহাল এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সকল আলামতই এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদিকে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা বেড়েই চলেছে। এরই মধ্যে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কুটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে যে ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জারিকৃত শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদণ্ড মুলতুবি রাখা হয়েছে এবং ইসলামাবাদে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত জেলখানায় তাঁর সাথে দেখা করেছেন। যুদ্ধ এড়িয়ে একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে যুদ্ধ বাধুক আর না-ই বাধুক, আমাদের কাজ হচ্ছে দুঃস্থ মানুষের সহায়তায় কাজ করা। দীর্ঘ সময় ধরে তুমুল বিতর্কের পর সিদ্বান্ত হলো, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে এসেছি অর্থাৎ উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তা প্রদান এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা, আমরা আমাদের এসকল কাজে ফিরে যাব। হাইস্পিড নেভিগেশন থেকে পূর্বে ভাড়াকৃত লঞ্চগুলো নবায়ন করে উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকায় যে যার কাজে নিয়োজিত হবো। যুদ্ধ যদি শুরুই হয়ে যায় তখন পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

ডেনমার্কের এরিখ বললো, কয়েকদিন পূর্বে মুন্সিগঞ্জের সন্নিকটে আমাদের তিলোত্তমা লঞ্চের উপর সেনাবাহিনী কর্তৃক গুলি বর্ষণের ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। গুলিবর্ষণের সময় আমরা সবাই হ্যাচের ভেতর চালের বস্তার আড়ালে না লুকালে গুলি যে আমাদের গায়ে লাগতো তাতে কোন সন্দেহ নাই কারণ বেশ কিছুসময় বৃষ্টির মত গুলি বর্ষিত হয়েছে এবং লঞ্চের সবকটা ক্যাবিনসহ বিভিন্ন জায়গা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সারেঙ্গ লঞ্চ থামানোর পর সেনাবাহিনীর সদস্যরা লঞ্চে উঠে সারেঙ্গসহ আমাদের কর্মকর্তাদেরকে শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত করেছে। আমাদের ক্যামেরা, রেডিও, ঘড়ি এমন কি মোজা-গেঞ্জি পর্যন্ত তারা কেড়ে নিয়ে গেছে। তারা লঞ্চের কর্মীদেরকে মারধর করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছে এবং ডেলিগেটদের গায়েও হাত দিয়েছে। ঐ মুহূর্তে অশান্ত কতিপয় সেনা সদস্যকে আমি রেড ক্রসের মিশন সম্পর্কে অবহিত করি। জবাবে সেনাবাহিনীর

এক সদস্য বলে যে, তারা লঞ্চটি থামানোর ইঙ্গিত দেয়ার পরও সারেঙ্গ তা চলমান রাখায় গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এরপর কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ না করেই তারা লঞ্চ থেকে নেমে যায়। ঘাটে পৌঁছে আহত সারেঙ্গ ও স্থানীয় ষ্টাফ রুহুল আমিনকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়। এই ঘটনায় স্থানীয় ষ্টাফদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়।

এ প্রসঙ্গে সেভন ল্যাম্পেল বললেন, এই দুঃখজনক ঘটনাটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যরা রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন তথা জেনেভা কনভেনশন সম্পর্কে অবগত নয়, অথবা এমনও হতে পারে যে যারা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে তারা নিয়মিত সেনা বাহিনীর সদস্য নয়, জরুরিভাবে নিয়োগকৃত মিলিশিয়া বাহিনী। ঢাকাস্থ আইসিআরসি প্রতিনিধির সাথে এ বিষয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। জেনেভা থেকে বিষয়টি পাকিস্তান সরকারের কাছে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে। তবে ঘটনাটি ঘটার পর পরই আমি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে সেনা প্রধান বরাবরে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেছি এবং এ ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের কার্যক্রম গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হতে পারে বলে জানিয়ে দিয়েছি। চিঠি প্রাপ্তির পর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে জানায় যে ঘটনাটির জন্য সেনাপ্রধান দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্য সেনা বাহিনীর মাঠ পর্যায়ের সদস্যদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

সর্বাবস্থায় নিজেদের নিরাপত্তা বিধান করে কাজ করার জন্য সেভন ল্যাম্পেল সবাইকে বিশেষভাবে সতর্ক কররেন এবং সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

পরদিন ট্যাডি জানালো যে গতকাল সকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অষ্টম ডিভিশনের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাবেক সেনারা সীমান্ত পেরিয়ে ফেনীর পথে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়ন এবং রাজাকার বাহিনীর ৮০০ জনের সাথে তীব্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এগারো ঘন্টা তীব্র লড়াইয়ের পর পাকিস্তানি সেনাদের ৬১ জন পাঞ্জাবি ও রাজাকার বাহিনীর ৩৫৪ জনকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর অন্য সেনারা সেখান থেকে পালিয়ে জীবন রক্ষা করে।

চর জব্বার, হাতিয়া ও নোয়াখালী ভ্রমণ

ডিসেম্বরের ২ তারিখে হাই স্পিড নেভিগেশন থেকে ভাড়া করা তিলোত্তমা ও পূর্বাণী নামের দুটি লঞ্চ ঢাকার সদরঘাট ত্যাগ করলো। এরিখদেরকে নিয়ে তিলোত্তমা বরিশালের দিকে চলে গেল। হেগস্ট্রম, ট্যাডি, জ্যাঁ পিয়ের গর্ন্তাদ, লাবলু এবং আমি পূর্বাণীতে চেপে নোয়াখালী উপকূলের দিকে রওয়ানা হলাম। আমাদের সাথে হাতিয়া ও চর জব্বার এলাকার ত্রাণ সামগ্রী এবং কিছু সতর্কীকরণ যন্ত্রাদি রয়েছে। আমরা ডেকের উপর বসে আলোকোজ্জ্বল সকালের মনোরম শোভা উপভোগ করছি।

নদীপথে আমরা বেশ কয়েকটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম। জাহাজগুলো গেরিলাদের আক্রমণে বিনষ্ট হয়েছে বলে লঞ্চের সারেং জানালো। মুন্সিগঞ্জ পার হওয়ার পর বুড়িগঙ্গায় কয়েকটি মৃতদেহ ভাসতে দেখলাম। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে লাবলুকে বললাম, আমরা যদি সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে থাকি তবে অন্তরে এতো বিদ্বেষ কেন লালন করছি বলতে পারো? লোভ, লালসা এবং সীমাহীন ঘৃণা ও বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়ে যাচ্ছে তা কি নজিরবিহীন নয়?

এতো দুঃখ, এতো যন্ত্রণা, এতো মৃত্যুতো আমরা ইতিপূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনের ভেতর প্রচণ্ড রাগের সঞ্চার হলো। এখন ভাবছি, কেন অস্ত্রহাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম না। এমনসময় নদীর অপর পাড়ে বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। লাবলু বললো, এটা নিঃসন্দেহে গেরিলাদের ফাটানো কোন বোমার আওয়াজ।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমাদের লঞ্চ চর জব্বারে পৌঁছলো। ঘাটে কয়েকটি চায়ের দোকান রয়েছে কিন্তু সবই জনশূন্য। বিষয়টি কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো। দু কিলোমিটার দূরে চর বাটা বাজারে গিয়ে ফজলুল হকের সাথে দেখা করবো বলে ভাবলাম। একখণ্ড বাঁশের মাথায় রেড ক্রসের পতাকা টানিয়ে হেঁটে কিছুটা দূর যাওয়ার পরই ধাতব কোন বস্তুর একটা বিকট শব্দ হলো, একই সাথে দূর থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এলো। আমরা ভাঙ্গা বেড়ীবাঁধের অপর পাশে

শুয়ে পড়লাম। পরমহূর্তেই রাস্তার পাশের ধানক্ষেত থেকে, ঝোপ ঝাড় থেকে, আশেপাশের বাড়ী ঘরের আড়াল থেকে একের পর এক রাইফেলধারী গেরিলারা বেরিয়ে আসতে থাকলো।

গেরিলারা দুই তিন শয়ের বেশী হবে বলে মনে হলো। ওদের কারো কারো হাতে দেশীয় বন্দুকও দেখতে পেলাম। গেরিলা কমাণ্ডার সামনে এগিয়ে এসে আমরা কারা জানতে চাইলো। ট্যাডি জোরে চেঁচিয়ে বললো, আমরা রেড ক্রসের কর্মী, ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রাণ কাজ করছি। আমি ট্যাডির কথাগুলো বাংলায় তরজমা করে ওদেরকে শুনালাম।

কমাণ্ডার এগিয়ে এসে আমাদের সাথে করমর্দন করলেন এবং বললেন, এখানে আমরা এক হাজারের অধিক মুক্তিযোদ্ধা রয়েছি। আপনাদের জাহাজ দেখে পাকিস্তানি গানবোট বলে মনে হওয়ায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। রেড ক্রসের কোন জাহাজে আমরা কখনো আক্রমণ করব না, তবে রাতের অন্ধকারে ভুলবশত গুলি চালানোর মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই জাহাজের দু পাশে বড় করে রেড ক্রসের প্রতীক লাগিয়ে নেবেন। আমি বললাম, রেড ক্রসের প্রতীক যথাযথ-ভাবে রয়েছে তবে অন্ধকার বিধায় আপনারা বোধহয় দেখতে পাননি। এরপর বাতি জ্বালিয়ে আরো কয়েকটা রেড ক্রস পতাকা টানিয়ে দেয়া হলো। ইত্যবসরে আশেপাশের বাড়িঘর থেকে জড়ো হওয়া লোকজনের মধ্য থেকে ৫০ জন কর্মী নিয়োগ করা হলো যারা পরদিন সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে সাহায্য-সামগ্রী লঞ্চ থেকে খালাসের ব্যবস্থা করবে।

জোয়ার ভাটার কারণে লঞ্চটা নদীর কূলে নিয়ে আসতে না পারায় কিছুটা দূরে অবস্থান করছিল, এজন্য ত্রাণসামগ্রী লঞ্চ থেকে প্রথমে দেশীয় নৌকায় কূলে নিয়ে এসে তারপর ঠেলাগাড়ীতে করে মজুদের স্থানে নিতে হবে। মালামাল খালাসের বিষয়টি চূড়ান্ত করার পর পরদিন ডিসেম্বরের ৪ তারিখ প্রত্যুষে হেগস্ট্রম, ট্যাডি এবং আমি কিছু সাংকেতিক যন্ত্রাদি নিয়ে ভরা জোয়ারে একটি পালতোলা বোটে হাতিয়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ট্যাডি তার ট্রানজিষ্টার রেডিও অন করলো। বিবিসির সংবাদে জানা গেল যে দেশের সীমান্ত বরাবর বিভিন্ন জায়গায় ভারতের আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি পশ্চিমাঞ্চলেও বিমানযুদ্ধ হয়েছে। ট্যাডি বললো, এবার মনে হচ্ছে যে চূড়ান্ত যুদ্ধটা বোধহয় বেঁধেই গেলো।

প্রায় আড়াই ঘন্টা পর আমরা হাতিয়ায় পৌঁছুলাম। ঘাটে নেমে রিক্সা নিয়ে অফিসে পৌঁছুতে আধাঘন্টার বেশী লাগলো। অফিসে গিয়ে মঈনউদ্দিন ও লোকমানকে পাওয়া গেল। সকালের নাস্তার পর আলোচনা সভায় মঈনউদ্দিন স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। ট্যাডি তাঁর কার্যক্রম প্রসঙ্গে বললেন যে, জাপানিজ রেড ক্রসের একটি টিম অচিরেই হাতিয়াতে আসবে এবং এই ভবনগুলোতে অবস্থান করবে। একটি ভবনের নিচ তলার পুরোটা একটি ক্লিনিক হিসাবে ব্যবহার করা হবে। নানা ধরনের আসবাবপত্রের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে ট্যাডি একটি তালিকা মঈনউদ্দিনের হাতে দিয়ে ওগুলো সংস্থানের জন্য বললেন। আমাদের সাথে করে বয়ে আনা সাংকেতিক যন্ত্রাদি সংরক্ষণের জন্য হেগস্ট্রম একটি কক্ষ নির্ধারণ করে ওটাতে তালা লাগাতে বললেন এবং নিরাপত্তা বিষয়টি সার্বক্ষণিক নজরদারীর মধ্যে রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমাদের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে রফিক আমাদের সাথে দেখা করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদের সাক্ষাতের পর তিনি ট্যাডিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এরপর যখন আসবেন তখন সত্যিকারের স্বাধীন হাতিয়া দেখবেন।

আমরা আজই চলে যাব শুনে রফিক বললো, তবে আপনাদের বিদায় উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানাতে ফাঁকা গুলি ছুড়ব। আমি রফিককে গুলি না ছোড়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বললাম, আমরা সেবাব্রতী মানুষ এবং সংবর্ধনা আমাদের কাজের আনন্দকে বিঘ্নিত করে। রফিক আমার কথার অন্তর্নিহিত ভাবটুকু বুঝতে পেরে গুলি ছেড়া থেকে নিবৃত্ত হলেন। আমরা হাতিয়া ট্রলার ঘাটের দিকে রওয়ানা হলাম। মঈনউদ্দিন ও লোকমান আমাদের সাথে ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। তাঁদের সাথে আরো কিছু আলাপ আলোচনার পর আমরা ট্রলারে চেপে চর জব্বার ঘাটের দিকে রওয়ানা হলাম।

ট্রলারের সকলেই ভীষণ উত্তেজিত। একজন যাত্রীর ট্রানজিষ্টারে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত সংবাদ শোনা গেল। পশ্চিম রনাঙ্গণে পাকিস্তানের দুটি ফাইটার ভূপাতিত হওয়ার খবর শোনার সাথে সাথে সবাই সমস্বরে জয় বাংলা বলে চেঁচিয়ে উঠলো। হেগস্ট্রম ও ট্যাডির দিকে তাঁকিয়ে আমি দৃঢ় স্বরে বললাম, এতো বঞ্চনা-এতো মৃত্যুর অবসান হবেই হবে, আমাদের দেশ স্বাধীন হবে। হেগস্ট্রম বললো, কোন মহৎ প্রচেষ্টা তো কখনো বিফলে যায়নি, তবে তোমাদের বেলায় এর উল্টোটা হবে কেন? তোমাদের সবার মতো আমিও আশা করি যে তোমাদের বিজয় অত্যাসন্ন।

যাত্রীদের হৈ-হল্লাজনিত উত্তেজনার মধ্য দিয়ে আমরা চর জব্বার ঘাটে এসে পৌঁছুলাম। লাবলু বললো, এই অল্পক্ষণ পূর্বেই ত্রাণ সামগ্রী খালাস সম্পূর্ণ হয়েছে।

পরিকলপনা অনুযায়ী জাঁ পিয়ের গন্তার্দ, ট্যাডি ও আমি চর জব্বারে সরবরাকৃত ত্রাণসামগ্রীর ব্যবস্থাপনা শেষে নোয়াখালী যাব এবং হেগস্ট্রম ও লাবলু ভোলার দৌলতখান ও তজুমদ্দিনে কিছু সতর্কীকরণ যন্ত্রাদি সরবরাহ শেষে বরিশাল হয়ে ঢাকায় ফিরবেন।

হেগস্ট্রমের আমন্ত্রণে লঞ্চের ডেকে বসে চা পানের পরিসরে আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা হলো। আমি লাবলুকে কিছু নির্দেশনা দিয়ে হেগস্ট্রমের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সামনে একটু হেঁটে গিয়ে জাঁ পিয়ের গন্তার্দ, ট্যাডি ও আমি গাড়ীতে চেপে নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে বাজারের মধ্য দিয়ে ধীরগতিতে চলার সময় কিশোর যুবকেরা গাড়ীর কাছে এসে জয় বাংলা বলে হাত নেড়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলো। জনৈক ব্যক্তি গাড়ীর জানালার সামনে মাথা রেখে বললো, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বাঁধলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হবে।

এ ধরনের উচ্ছ্বল একটা পরিবেশের মধ্য দিয়ে যখন মাইজদী কোর্ট রেড ক্রস অফিসে পৌঁছলাম তখন পড়ন্ত বিকেল। তবে এখানে শহর জুড়ে কেমন যেনো একটা থমথমে ভাব পরিলক্ষিত হলো।

আমাদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে শাহজাহানসহ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক অফিসে এলো। শাহজাহান জানালো যে গতরাত নয়টার সময় কতিপয় রাজাকার স্বেচ্ছাসেবক মেজবাহকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে নিখোঁজ রয়েছে। আমাদের প্রশ্নের জবাবে শাহজাহান বললো যে গত পরশু চর জব্বারে ত্রাণ বিতরণ শেষে ফিরে এসে সন্ধ্যার পর ও রাস্তায় বেরিয়েছিল এবং তখনই ঘটনাটি ঘটেছিল। জাঁ পিয়ের গন্তার্দ সবাইক নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসলেন এবং বললেন, পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এরমধ্য দিয়েই সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধান করে রেড ক্রসের নির্ধারিত কর্মকাণ্ড আমাদেরকে সম্পাদন করতে হবে।

গুদামে মজুত সকল কম্বল ও খাবার অফিসে নিয়ে আসার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন। একই সাথে বেশী পরিমাণে পেট্রোল ও কেরোসিন ক্রয় করে বাগানে গর্ত করে সংরক্ষরণের জন্য গাড়ীর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন। মেজবাহ-র খোঁজ করার জন্য ট্যাডিকে দায়িত্ব দেয়া হলো।

সভা শেষ করে গন্তার্দ টেলিফোনে ঢাকা ও জেনেভার সাথে যোগাযোগ করলেন। ট্যাডি ঢাকা রেড ক্রস অফিস ও জাপান দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে ব্যর্থ হয়ে বললেন, কারফিউ এর কারণে এখন অফিসে কেউ নই। আমি আমার এক আত্মীয়কে টেলিফোন করলাম এবং জানলাম যে ঢাকার আকাশে মাঝে মধ্যেই বিমান যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে।

মানুষের মধ্যে শংকার ভাব থাকলেও সবাই দারুণভাবে উচ্ছ্বসিত। ভারতীয় বিমানের তাড়া খেয়ে পাকিস্তানি বিমানগুলোর কোণঠাসা অবস্থা সবাই বেশ উপভোগ করছে। কথোপকথন মধ্যেই ঢাকার সাথে টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। স্থানীয়ভাবে টেলিফোন লাইন ঠিক থাকলেও ঢাকার সাথে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েই রইলাম।

ট্যাডি ও আমি মেজবাহ্‌র খোঁজে বের হলাম। স্থানীয় রাজাকারদের কাছ থেকে কোন সংবাদ না পেয়ে চৌমুহনী কলেজে স্থাপিত সেনা বাহিনীর আঞ্চলিক সদর দপ্তরে গিয়েও মেজবাহ্‌ সম্পর্কে কিছুই জানা গেলনা।

পাকিস্তানিদের অন্তিম সময়

অফিসে ফেরার পর গন্তার্দ জীপ গাড়ী দুটোর রোটার খুলে আলাদা করে অফিসে রেখে দিলেন। তিনি আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে মাইজদী থেকে পাকিস্তানি সেনাদের পালানোর সময় এসে গেছে এবং এই সময়ে ওরা আমাদের গাড়ী ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। এই কাজটি যাতে তারা না করতে পারে সে জন্যই রোটার দুটো খুলে গাড়ী দুটোকে অচল করে রাখলাম। আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন দেখলাম যে এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর রাত আটটার দিকে পাকিস্তানি বাহিনীর দুজন সেনা আমাদের অফিসে এসে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহারের অজুহাত দেখিয়ে গাড়ী দুটো নিয়ে যেতে চাইল। গন্তার্দ ওদেরকে গাড়ীর কাছে নিয়ে গিয়ে দেখালেন এবং বললেন যে দুটো গাড়ীই বিকল হয়ে গেছে এবং মেরামত করতে দু একদিন সময় লাগবে। সেনারা কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরও যখন গাড়ী স্ট্রাট করতে ব্যর্থ হোল তখন উপায়ন্তর না দেখে তড়িৎগতিতে অফিস থেকে প্রস্থান করলো। পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন ও বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি প্রত্যুৎপন্নমতিতার জন্য আমরা গন্তার্দকে ধন্যবাদ জানালাম।

রাত নটার পর থেকেই প্রচণ্ডভাবে গোলাগুলি শুরু হলো। চারিদিক থেকে মানুষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। মাইজদী শহরে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হলো। অগণিত মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে এসে পাকিস্তানি ও রাজাকারদের ঘাঁটিগুলো ঘেরাও করে ফেললো। গোলাগুলি এতটাই প্রবল হয়ে উঠলো যে আমাদের রেড ক্রসের অফিসেও এলোপাথাড়ি বুলেট উড়ে এসে আঘাত হানলো। আমরা দরজা জানালা বন্ধ করে রুমে বসে রেডিওর খবর শুনে সময় কাটালাম।

রেডিওর খবরে জানা গেল যে আজ ৬ ডিসেম্বর তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং বাংলাদেশের অনুরোধক্রমে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে প্রধান করে মিত্রবাহিনী গঠিত হয়েছে। এইদিন মাইজদীতে পাকিস্তানি বাহিনীর পাঁচটি ঘাঁটির মধ্যে তিনটির পতন হয়ে গেল।

ডিসেম্বর ৭ তারিখে আকাশবাণীর খবরে শুনতে পেলাম যে মিত্রবাহিনী ফেনীসহ নোয়াখালীর অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। মাইজদীর উত্তরে চৌমুহনী শহরটি মুক্তিবাহিনী সাফল্যের সাথে মুক্ত করেছে এবং এখানে স্থাপিত পাকিস্তানি সেনা ব্যাটালিয়নের সদর ঘাঁটির পতন ঘটিয়েছে। খবরে আরও জানা গেল যে বিমানযুদ্ধে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে মোতায়েনকৃত অনেকগুলো বিমান ভূপাতিত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ট্যাডি নিয়মিতভাবে রেডিওর সংবাদ শুনছে এবং তাঁর কাছ থেকেই আমরা যুদ্ধের হালনাগাদ সংবাদ পাচ্ছি।

ত্রাণসামগ্রী হিসাবে পাঠানো বিশেষভাবে তৈরী প্রোটিনসমৃদ্ধ মার্কিন বিস্কুট এখন আমাদের একমাত্র খাবার। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে সকল দোকানপাট বন্ধ এবং বাইরে গিয়ে কোনভাবেই খাবার সংগ্রহ সম্ভবপর নয়।

মাইজদী কোর্ট রেলওয়ে ষ্টেশনটি আমাদের অফিসের সন্নিকটে। ষ্টেশনটি পাকিস্তানি সেনাদের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে দুপুরের পূর্বেই তার পতন ঘটল। ট্যাডিসহ আমরা কয়েকজন রেড ক্রস পতাকা হাতে নিয়ে ও ফার্ষ্ট এইড ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ষ্টেশনের দিকে ছুটে গেলাম। ষ্টেশনের চারিদিক লোকে লোকারণ্য।

জয় বাংলা ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। পূর্ববর্তী রাতে বেশ কিছু রাজাকার পালিয়ে যাবার পরও ১২০ জন সেনা ও রাজাকার এই ঘাঁটিতে ছিল, এখন তারা মাথায় হাত তুলে সারিবদ্ধ হয়ে বাইরে আসছে। মুক্তিযোদ্ধারা দুইপাশে

দাঁড়িয়ে আত্মসমর্পণকারীদের দেহ তল্লাশী করছে। ষ্টেশনের আশেপাশের জায়গার মাটি খুঁড়ে অনেকগুলো লাশের সন্ধান পাওয়া গেল। এর মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক মেজবাহের লাশও ছিল।

মাইজদীতে এখন একটি ছাড়া বাকি সবকটি ঘাঁটিরই পতন ঘটেছে। ঐ ঘাঁটিটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কারিগরী বিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছিল। সেখানে প্রায় ৪০০ পাকিস্তানি সেনা ও রাজকার রয়েছে বলে জানা গেল। গেরিলারা ওদের ঘাঁটির উপর চারিদিক থেকে বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষণ করছিল এবং পাকিস্তানিরাও পাল্টা জবাব দিযে যাচ্ছিল। ঘন্টাদুয়েক এভাবে চলার পর পাকিস্তানিদের গুলি বর্ষণ স্তিমিত হলো।

আমরা আমাদের জীপ গাড়ীতে রেড ক্রসের পতাকা উড়িয়ে নিকটস্থ গলির মুখে দেয়ালের আড়ালে অবস্থান নিয়ে আছি। চারিদিক থেকে মানুষের জয় বাংলা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই সময়ে আনন্দের অতিশয্যে দুইজন নাচতে নাচতে প্রধান সড়কে বেরিয়ে এলো। পাকিস্তানি সেনারা ঐ দুইজনকে টার্গেট করে গুলি বর্ষণ করলো। দুজনাই গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। লোকজন চেঁচাতে শুরু করলো। আবার ব্যাপকভাবে গুলিবিনিময় শুরু হলো। এই সময় গুলিবিদ্ধ দুজনকে উদ্ধারের চেষ্টায় আমরা রেড ক্রস পতাকাসহ গাড়ীটাকে একটু সামনে নিয়ে মূল রাস্তার উপর অবস্থান নিলাম। ট্যাডি মেগাফোন দিয়ে একটু সময় যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানালেন। আবেদনে কাজ হলো, গোলাগুলি থেমে গেল। ইত্যবসরে আমরা গাড়ী নিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং ষ্ট্রেচার বের করে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু আহতদের কাছে পৌছানোর পূর্বেই পাকিস্তানিরা পুনরায় গুলি ছুড়তে শুরু করলো। কয়েকটা গুলি আমাদের গাড়ির আশেপাশে পড়ল। একটি গুলি ইটের উপর আঘাত করায় ভাঙ্গা ইটের টুকরা ছুটে এসে ট্যাডির হাতে লাগলো এবং রক্ত ঝড়তে থাকলো। উপায়ন্তর না দেখে আমরা গাড়ী ঘুরিয়ে পুনরায় গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গুলিবিদ্ধ দুজনকে পরবর্তীতে যখন উদ্ধার করা হোল তখন তারা মৃত্যুবরণ করেছে। আমরা তাঁদের জানাজায় অংশগ্রহণ করেছিলাম।

পরেরদিন শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকজন আহত মানুষকে রেড ক্রসের গাড়ীতে করে হাসপাতালে পৌছে দেয়া হলো। আমাদের অফিস সংলগ্ন বাড়িতে এক মহিলার পায়ে গুলি লাগায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করলাম। অফিসের ছাদে উঠে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দূরে কোথায়ও

আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেলাম। ভারতীয় জঙ্গী বিমানের বোমা বর্ষণে চট্টগ্রামের আশেপাশে হয়তো কোন তেল শোধনাগারে আগুন ধরে গেছে।

রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবরে জানতে পারলাম যে ভারতীয় সেনারা সবদিক থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে অবস্থানকারী পাকিস্তানি সেনারা এদিক সেদিক পালিয়ে যাচ্ছে। বিবিসির খবরে জানা গেল যে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অনতিবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান করা হয়েছে।

৯ ডিসেম্বর মাইজদীতে পাকিস্তানি বাহিনীর শেষ ঘাঁটি কারিগরী বিদ্যালয়ের ছাদের উপর সাদা পতাকা দেখা গেল। এর অর্থ পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করেছে। মুক্তি বাহিনীর কমান্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী জানালা দিয়ে সকল রাইফেল বাইরে ছুড়ে ফেলার পর মাথার উপর হাত তুলে সারিবদ্ধভাবে সবাই বাইরে বেরিয়ে এলো।

অনুমান করা হয়েছিল যে সেনা ও রাজাকার মিলিয়ে ঘাঁটিতে ৪০০ জন রয়েছে কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল মাত্র ২৩৮ জনকে। কমান্ডারের জেরার মুখে জানা গেল যে রাতের অন্ধকরে শতাধিক সেনা ও রাজাকার পালিয়ে গেছে। একথা শুনে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। সবার দেহ তল্লাশি চলতে থাকলো। কমান্ডারের অনুমতি নিয়ে আমরা ওদের ঘাটির ভেতরে প্রবেশ করলাম। সে এক বিভৎস অবস্থা, কয়েকজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কাতরাচ্ছে। বাথরুমের ভেতর একজন রাজাকারের মাথায় গুলি লেগেছে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণে সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কমান্ডারের অনুমতি নিয়ে আমরা আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পৌঁছে দিলাম।

ইতিমধ্যে আত্মসমর্পণ করার পর মুক্তিবহিনীর গুলিতে ছয়জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে। এরমধ্যে কয়েকদিন পূর্বে পথিমধ্যে আমাদের গাড়ী মেরামতে সহায়তাকারী সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট খানের মৃতদেহও রয়েছে। জাঁ পিয়ের ও ট্যাডি হত্যাকান্ড না ঘটানোর জন্য মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারকে অনুরোধ জানালেন। জেনেভা কনভেনশনে বর্ণিত যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণের বিধিগুলোর প্রতি কমান্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো এবং বলা হলো যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও জেনেভা কনভেনশন মেনে চলার জন্য মুক্তিবাহিনীর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। তরুণবয়সী কমান্ডার ট্যাডির মেগাফোনটি হাতে নিয়ে

গেরিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমাদের বিজয় হয়েছে, নোয়াখালী স্বাধীন হয়েছে, এ গর্ব আমাদের সকলের। আপনারা খেয়াল রাখবেন যাতে শত্রুপক্ষের কোন অস্ত্র অন্যত্র ছড়িয়ে না পড়ে। পাকিস্তানিদের কাছে থাকা অর্থ ও গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র খুঁজে বের করে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এখন আর কোন হত্যাকাণ্ড নয়। সকল যুদ্ধবন্দীকে মাইজদী কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তর করে সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এখন সবাইকে দ্রুত কাজ করতে হবে।

হত্যাকান্ড বন্ধ হলো দেখে আমরা আশ্বস্ত হলাম। সকল বন্দীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘন্টাদুয়েক পর আমরা সবাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গেলাম এবং আহত বন্দীদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অনুরোধ জানালাম এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তাঁরা আমাদেরকে আশ্বস্ত করলো।

স্কুলের বাইরে তখন অনেক মানুষের জমায়েত, জয় বাংলা শ্লোগানে মুখরিত চারিদিক। দেশের অন্যত্র তখনো যুদ্ধ চললেও মাইজদীতে পাকিস্তানি বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মাইজদী কোর্ট সর্বপ্রথম মুক্ত শহর হিসাবে পরিগণিত হবে ভেবে আমরা গর্বিত হলাম। অনেকদিন পর আজ রাতে কোন গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম না। তবে বিজয়ের মহা আনন্দের অতিশয্যে রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারলাম না।

পরদিন ট্যাডি এবং জাঁ পিয়ের গন্তার্দ মাধ্যমিক স্কুলে গিয়ে বন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য কমান্ডারকে অনুরোধ জানালেন। ওদের মধ্য থেকে দুজন মুমূর্ষ বন্দী নিয়ে ট্যাডির সাথে ফেনী রওয়ানা হলাম। ফেনী যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় বাহিনীর অষ্টম পাহাড়ী ডিভিশনের কমান্ডার ট্যাডিকে অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। ভারতীয় বাহিনীর একজন তরুণ অফিসার মেজর থাপার আমাদের রেড ক্রস অফিসে এসে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং তাঁর সাথেই আমরা ফেনী যাচ্ছি। সড়ক পথের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের উল্লাসধ্বনির সাথে আমরাও শরিক হয়ে হাত নেড়ে তাঁদেরকে অভিনন্দন জানালাম।

রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যরা বিগত কয়েকটি মাস সাধারণ মানুষের উপর যে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে এখন তার প্রতিকার কড়ায় গণ্ডায় মানুষ আদায়

করে নিচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম যে কোন নির্মমতাই শেষ হয়ে যায় না - বুমেরাং হয়ে ফিরে ফিরে আসে।

ফেনী শহরে পোঁছে সত্যিকারের যুদ্ধের আমেজটা প্রত্যক্ষ করলাম। ভারতীয় সৈন্যদের ছুটাছুটি ও ব্যস্ততা চোখে পড়লো। কোন কোন সৈন্যের মাথায় পাগড়ি, নানা ধরনের যানবাহন চলছে এদিক সেদিক। তবে শহরটাকে জনশূন্য মনে হলো। লোকজন যুদ্ধের ভয়াবহতা এড়াতেই বোধহয় শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। আমাদের সাথে নিয়ে আসা আহত দুজনকে ডঃ আতিয়ার রহমানের কাছে নিয়ে গেলাম। ডঃ আতিয়ারের সাথে এর পূর্বেও মাইজদী রেড ক্রস অফিসে দেখা হয়েছে, তিনি ট্যাডির একজন বন্ধু এবং রেড ক্রসের আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর হাসপাতালের ছাদে বিশাল রেড ক্রসের যে পতাকাটা উড়ছে সেটা ট্যাডিই তাঁকে দিয়েছেন।

ডঃ আতিয়ার বললেন, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা রাজাকার তবে রোগীর পরিচয় আমি জানতে চাই না, আমার কাজ হচ্ছে অসুস্থজনের সেবা করা এবং আমি তাই করে যাচ্ছি। আমার এই হাসপাতালে আহত ভারতীয় সৈন্য রয়েছে, মুক্তিবাহিনী রয়েছে ঠিক তেমনি আহত রাজাকারেরাও চিকিৎসা পাবে।

ট্যাডি ডঃ আতিয়ারের চোখে চোখ রেখে বললেন, আপনি সত্যিই রেড ক্রসের আদর্শে বিশ্বাসী একজন মানবসেবী হয়ে উঠেছেন।

হাসপাতালের কাজ শেষ হওয়ার পর মেজর থাপার সাথে আমরা বন্দীশিবিরগুলো দেখতে গেলাম। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের বেশীরভাগকেই কুমিল্লায় প্রেরণ করা হয়েছে, মাত্র ৭০ জন ফেনীতে রয়েছে।

নির্লিপ্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে নির্দেশ করে ট্যাডিকে আমি বললাম, দুদিন পূর্বে এরাই কত না নির্মমতা নিয়ে হাজার হাজার বাঙ্গালীদেরকে হত্যা করেছে, মা বোনদের সম্ভ্রমহানী করেছে এবং আমাদের মর্যাদা অবনমিত করেছে কিন্তু এহেন মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য এরা কি এখন অনুশোচনা প্রকাশ করছে?

ট্যাডি একটু হেসে বললো, মানুষ সৃষ্টির পর থেকে এ ধরনের হাজার হাজার যুদ্ধ-বিগ্রহে এ পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মানব সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে, নিগৃহীত হয়েছে কিন্তু আক্রমণকারীরা বিজয়ী কিংবা বিজিত যাই হোক, কোন অবস্থাতেই ঐ অসুরেরা কখনই অনুশোচনা করেনি।

ট্যাডির এক প্রশ্নের জবাবে বন্দী পাকিস্তানি সেনাদের একজন ক্যাপ্টেন বললো যে এখানে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহার সন্তোষজনক।

এরপর শহরের আরো দু-একটি জায়গা ঘুরে ফিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অষ্টম পাহাড়ী ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল স্বরূপ রুমে প্রবেশ করলেন। তিনি আমাদেরকে দার্জিলিং চা দ্বারা আপ্যায়িত করে বললেন, আমি আপনাদের সেবামূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত আছি, চলমান এই যুদ্ধের মধ্যে আহত কয়েকজন ভারতীয় সেনাদের সেবা শুশ্রুষা করে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ট্যাডির এক প্রশ্নের জবাবে মেজর জেনারেল স্বরূপ বললেন, চট্টগ্রামে পাকিস্তানিদের অবস্থান বেশ শক্ত বলে তাড়াহুড়ো না করে বিমানবাহিনীর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদেরকে কোণঠাসা করতে হবে এবং যুদ্ধকৌশল সেভাবেই ঠিক করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি যে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণ বিজয় অর্জিত হবে।

অতঃপর মেজর জেনারেল স্বরূপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ট্যাডি অভিমত প্রকাশ করে বললেন যে ফেনীতে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর আচরণ সন্তোষজনক। তিনি আগামীতেও পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয়ের পর শৃঙ্খলা রক্ষা, বিশেষ করে সংখ্যালঘু, বিদেশী ও বেসামরিক মানুষদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাঁর প্রতি অনুরোধ জানালেন।

যুদ্ধাহত মানুষের জরুরি সেবা

পরদিন ট্যাডির সাথে মাইজদী শহরের ক্ষতিগ্রস্থ কয়েকটি স্থাপনা এবং একই সাথে বিগত কয়েকদিনে আহত লোকজন যাদেরকে আমরা সেবা শুশ্রষা করেছিলাম তাঁদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য গাড়ী নিয়ে বের হলাম। এরমধ্যে মাইজদী হাসপাতালের অবস্থা করুণ দেখতে পেলাম। আগষ্ট মাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও রোগীসহ অনেক মানুষ হত্যা করেছিল, হাসপাতালের কক্ষগুলো সেই নৃশংসতার সাক্ষ্য এখনো বহন করে চলেছে।

বিকেলবেলা জানা গেল যে ফেনী ও চাঁদপুরের মাঝামাঝি একটি গ্রামে কয়েকজন আহত মুক্তিযোদ্ধাকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে। মাইজদীর মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার রেড ক্রসকে কাজটি করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। ট্যাডির নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক শাহজাহান এবং আমি তাৎক্ষণিকভাবে রেড ক্রস পতাকা সম্বলিত জীপ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমাদের সাথে একজন গাইড যোগ দিলেন যিনি ঐ গ্রামটি চিনেন। যতদূর মনে পড়ে গ্রামটির নাম গোপালপুর। যাওয়ার পথে রেডিওর সংবাদে জানা গেল যে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর কিছু সেনা জাতিসংঘ ও বিভিন্ন সংস্থার ট্রাক ও যানবাহন লুটপাট করে চাঁদপুরের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর কয়েকটি বিমান নিচু দিয়ে চাঁদপুরের দিকে উড়ে গেল। বিমানগুলো হয়তোবা পশ্চাদপসরণকারী পাকিস্তানি সৈন্যদের পিছু নিয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে আমাদেরকে সতর্কতার সাথে চলতে হচ্ছিল।

ঐ গ্রামে পৌঁছে সংবাদ পেলাম যে আহত মুক্তিযোদ্ধারা আরো পাঁচ কিলোমিটার দূরে একজায়গায় অবস্থান করছেন। সেখানে নৌকা ছাড়া যাওয়ার পথ নেই। ট্যাডিকে গ্রামের গণ্যমান্য একজনের বাড়িতে অবস্থানের ব্যবস্থা করে তাৎক্ষণিকভাবে আমি নৌকা নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলাম। মাঝির সাথে আমি ও আমার গাইড দুজনাই দাঁড় বাইতে থাকলাম। মাঝি তাঁদের গ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন যে এখানে ৪৫ জন গ্রামবাসীকে তারা গুলি করে হত্যা করেছে এবং অনেক ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। আহতদের কাছে পৌঁছুতে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় অতিবাহিত হলো। সর্বমোট আহত তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে পেলাম যার মধ্যে একজনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ করা এবং অবস্থা গুরুতর। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আহত তিন জনকে নৌকায় তোলা হলো। মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত যোদ্ধাকে আমার কোলের উপর বালিশ রেখে শুইয়ে দিলাম। ফেরার সময় মাঝির অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও যাওয়া আসা নিয়ে নৌকা ভ্রমণে তিন ঘন্টা সময় অতিবাহিত হলো। আহত তিনজনকে জীপে তুলে মাইজদীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাতের অন্ধকারে হেড লাইটের আলোতে গাড়ী চলছে। মাঝে মাঝেই দূর থেকে কামানের গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে মুক্তি বাহিনীর তল্লাশির জন্য ২০/২১ বার গাড়ী থামাতে হলো। মাইজদী পৌঁছে আহতদেরকে হাসপাতালে রেখে যখন অফিসে ফিরলাম তখন রাতের তৃতীয় প্রহর পার হয়ে গেছে।

১১ ডিসেম্বর আকাশবাণীর খবরে জানা গেল যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ছত্রীসেনা ইউনিটের প্রায় দুই হাজার সেনা পরিবহণ বিমানে করে ভোরবেলায় টাঙ্গাইলের উপকণ্ঠে অবতরণ করেছে। সেখানে অবস্থানকারী অন্যান্য ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনী সমন্বয়ে ঢাকা আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। পাকিস্তানি বাহিনীর বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন একের পর এক আত্মসমর্পণ করছে। কক্সবাজারে মোতায়েন পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে অনেকে বার্মার সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে গেছে। সমুদ্রে অবস্থানরত ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ থেকে জঙ্গী বিমানগুলো উড়ে এসে চট্টগ্রামে অবস্থানরত পাকিস্তানিদের উপর বোমা বর্ষণ করে চলেছে।

অন্যদিকে স্থল পথে মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় ট্যাংকের সাড়াশী আক্রমণের মুখে চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয় যাচ্ছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিপতিত হয়েছে।

অন্য একটি সংবাদে জানা গেল যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব আর্মি স্টাফ ফিল্ড মার্শাল শ্যাম মানেকশ পূর্ব পাকিস্তানের উপসামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের পরামর্শ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। যাইহোক এখন মনে হচ্ছে যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র নয় দিনের মাথায় যুদ্ধের পরিস্থিতি একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

এইদিন জাঁ পিয়ের গর্ন্তাদ, ট্যাডি এবং আমি মাইজদীর দক্ষিণে সোনাপুর গেলাম। ওখানে ফরাসি-কানাডিয়ান তিন ধর্মযাজক একটি অনাথ আশ্রম চালাচ্ছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন। ধর্মযাজকেরা বললেন যে আজ সকালেও এখানে নয়জন রাজাকার যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হয়েছে, আপনারা কিছু একটা করেন যাতে হত্যাকান্ড আর না ঘটে। বিষয়টি সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধা আঞ্চলিক কমান্ডারের সাথে আলোচনার আশ্বাস দিয়ে আমরা সোনাপুর থেকে ফেনী এসে পৌঁছুলাম।

ভারত থেকে শরণার্থীরা ফিরে আসলে তাঁদের অবস্থানের জন্য অস্থায়ী আশ্রয় শিবির গড়ে তোলার স্থান নির্বাচন বিষয়ে জাঁ পিয়ের গর্ন্তাদ মেজর থাপারের সাথে আলোচনা করলেন। মেজর থাপার আমাদেরকে রেলওয়ে ষ্টেশনে নিয়ে গেলেন। ফেনীতে যে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তা ষ্টেশনের বিধ্বস্ত স্থাপনা ও

দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ট্রেনের বগিগুলো দেখে সহজেই অনুমান করতে পারলাম। সেদিন রাতে আমরা ফেনীতেই অবস্থান করলাম।

গভীর রাতে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। শুনলাম যে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক এক ধরনের বোমার আঘাতে ভারতীয় সেনাসহ বহু মানুষ আহত হয়েছে। মেজর থাপার সংবাদ পাঠিয়েছেন যে রেড ক্রস যেন বেসামরিক নাগরিকদের উদ্ধার ও চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঘটনাস্থল ফেনীর দক্ষিণে শোভাপুরের অস্থায়ী সেতুর কাছাকাছি। জাঁ পিয়ের গর্ন্তাদ ট্রাক নিয়ে কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে পৌঁছবেন বলে জানালেন। ট্যাডির সাথে ছুটে সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হলাম। চারিদিকে ছুটাছুটির সাথে চিৎকার ধ্বনি ভেসে আসছে। চিকিৎসা ইউনিটের সেনারা আহত ব্যক্তিদের স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে আসছে। কয়েকজন সামরিক ডাক্তার আহতদের হাত পা থেকে বুলেটের মতো ধাতব পদার্থ বের করছেন। একটা হেলিকপ্টার মুমূর্ষ রোগীদেরকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমরা ডাক্তারদেরকে সহায়তা করলাম এবং স্বল্প-ক্ষত রোগীদেরকে ব্যাণ্ডেজ করতে থাকলাম। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি ইতিপূর্বে কখনো হইনি। গর্ন্তাদের নিয়ে আসা তিনটি ট্রাকে ৪২ জন বেসামরিক আহত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে ফেনী আসার পর জানা গেল যে হাসপাতালে রোগী রাখার কোন জায়গা অবশিষ্ট নেই। ডঃ আতিয়ারকে বুঝিয়ে শুনিয়ে অতিরিক্ত বেড স্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য ট্যাডির পরিশ্রম কাজে লাগলো, তবে মাত্র ২০ জনকে ভর্তি করা সম্ভবপর হলো। বাকি ২২ জন রোগী নিয়ে আমরা বিপাকে পড়লাম। মেজর থাপার সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরার বেলোনিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং সেখানকার হাসপাতালে চিকিৎসার সু-ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানালেন। কোন উপায় না দেখে পরিশেষে মেজর থাপারের পরামর্শমতে দুটি ট্রাকযোগে বাকি ২২ জন রোগী নিয়ে ত্রিপুরার বেলোনিয়া যাওয়ার প্রস্তাবে গর্ন্তাদ ও ট্যাডি রাজী হলেন। পথে স্থল মাইন রয়েছে কিনা জানতে চাইলে মেজর থাপার খোঁজ নিয়ে ট্যাডিকে বললেন যে ইতিমধ্যে ২৫০টি মাইন অপসারণ করা হয়েছে, যদি দু একটা থেকেও থাকে তবে তা রাস্তার উপরে নেই কারণ ইতিমধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়ী ঐ রাস্তা দিয়ে চলাচল করছে।

রেড ক্রসের প্রতীক অঙ্কিত সাদা জীপটির যাত্রী আমরা তিনজন। ট্যাডি সামনের সিটে, আমি পেছনের সিটে এবং গর্ন্তাদ ড্রাইভিং সিটে বসলেন। পেছনে

রোগীভর্তি দুটি ট্রাক। মেজর থাপারের নির্দেশ মতে ক্যাপ্টেন রানা একটি জীপ নিয়ে আমাদের জীপের সম্মুখভাগে পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করছেন। কনভয়টি সাবলীল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। ট্যাডিকে বললাম যে রেড ক্রসের নিয়ম অনুযায়ী আমরাতো কোন সামরিক বাহিনীর গাড়ীর সাথে চলতে পারি না। ট্যাডি একটু হেসে বললো যে বৃহত্তর স্বার্থে নিয়ম ভাঙলে দোষের কিছু নয়।

কিছুদূর এগুতেই বড় ধরনের বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে থাপার গাড়ী থামিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন এবং অন্য সকল গাড়ীর আলো নিভিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করতে বললেন। নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারিদিক। নিস্তব্ধ পরিবেশের অজানা আশংকা নিয়ে অপেক্ষা। পরবর্তী কিছুক্ষণ গোলাগুলির আর কোন শব্দ না পাওয়ায় নিশ্চিত হওয়া গেল যে আওয়াজটা দু পক্ষের লড়াইয়ের নয়। সামনে এগুতেই হেড লাইটের আলোয় একটা ট্রাক উল্টে পড়ে থাকতে দেখা গেল। ক্যাপ্টেন রানা টর্চলাইট হাতে ট্রাকটির কাছে গেলেন। আমরাও তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। ট্রাকের সম্মুখভাগ একবারে বিধ্বস্ত। তিনটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তাঁদের শরীর এখনো গরম। চতুর্থজন ট্রাকের পেছনে মাটিতে পড়ে আছেন এবং বেঁচে আছেন। নাড়ির স্পন্দন অত্যন্ত দুর্বল। তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিলাম। মেশিনগান দেখে বোঝা গেল যে ওরা মুক্তিযোদ্ধা। ক্যাপ্টেন রানা ওদের মেশিনগানগুলো নিজের গাড়ীতে তুলে নিলেন। সদ্যমৃত তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে এভাবে ফেলে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। ভাবলাম এরমধ্যে যদি কেউ ওদেরকে নিয়ে না যায় তবে ফেরার পথে আমাদের ট্রাকে মৃতদেহ তিনটা তুলে নিয়ে যাব। আবার আমাদের কনভয় চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর ভারতীয় বাহিনীর একটা ট্রাক আসতে দেখে আশ্বস্ত হলাম যে সামনের রাস্তা বিপদমুক্ত। তবে রাস্তার অবস্থা তেমন ভাল না হওয়ায় স্বল্প গতিতেই চলতে হচ্ছিল।

এভাবে চলার পর ভোর রাতে আমরা বেলোনিয়া এসে পৌঁছলাম। রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হলো। ক্যাপ্টেন রানা আমাদেরকে সহায়তা করলেন। রাস্তায় লোক চলাচল কম, শান্ত পরিবেশ। ভাবলাম আমাদের স্বাধীন দেশে এমনিতর শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হতে আর বেশীসময় বাকী নেই। একটা রেস্টুরেন্টে নাস্তা করে বাইরে বেরুতেই সামনে একটা সিনেমা হল দেখতে পেলাম। হলটার সামনে বিরাট ডিসপ্লে বোর্ডে সুচিত্রা উত্তমের ছবি দেখে ভাবলাম, লাবলু সাথে থাকলে ও নিশ্চয়ই একটা শো না দেখে এখান থেকে যেতে চাইতো না ।

আমাদের হাতে সময় কম। রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে, অসম্ভব রকম ক্লান্তির মধ্যেও একটা অনাবিল আনন্দে মনপ্রাণ ভরে রয়েছে। আমরা ফেরার পথ ধরলাম। যাওয়ার সময় বিধ্বস্ত ট্রাকটার কাছে থেমে নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ করলাম কিন্তু পেলাম না। হয়তো ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কোন গাড়িতে উঠিয়ে ওদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সীমান্তে একটা সাইন বোর্ডে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে স্বাগত" লেখা দেখে মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অনেকগুলো বিধ্বস্ত গাড়ী দেখলাম যেগুলো যাওয়ার সময় অন্ধকারে দেখতে পাইনি। এ সকল গাড়ী পাকিস্তানি সেনাদের পোঁতা মাইনে উড়ে গেছে।

পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ

পরদিন ১৩ ডিসেম্বর সকালে ট্যাডির সাথে চর জব্বার ঘাটে এসে পৌঁছুলাম। উদ্দেশ্য হাতিয়া ভ্রমণ। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস চট্টগ্রাম থেকে তিনটি বোটে যে সকল ত্রাণসামগ্রী হাতিয়ায় প্রেরণ করেছে তা তদারকি করা। এই ত্রাণসামগ্রী গতকাল হাতিয়াতে পৌঁছার কথা। বিপত্তি ঘটলো যখন দেখা গেল যে কোন ট্রলার বা নৌকা ১০ কিলোমিটার প্রশস্ত নদী পাড়ি দিয়ে হাতিয়া যেতে চাইছে না। আমরা চর জব্বার ঘাটে চায়ের দোকানে অপেক্ষমান। মাঝে মাঝে ফাইটার বিমান নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দূরে দ্রুতগতি সম্পন্ন একটা নৌযান ছুটে আসছে বলে মনে হলো। আশেপাশের কেউ 'গান বোট' বলে চিৎকার করার সাথে সাথে লোকজন এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করলো। যে বোটটি ছুটে আসছিল তা আসলে পাকিস্তানি নৌবাহিনীর একটি মাঝারি আকারের গানবোট। এমন সময় পূর্বাকাশে দুটি ভারতীয় বোমারু বিমান উড়ে এসে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু করলো। পাকিস্তানি নৌবাহিনীর সদস্যরাও বোট থেকে পাল্টা গুলি ছুড়তে থাকলো। এভাবে গুলি বিনিময়ের পর বিমান থেকে ছোড়া একটি বোমার আঘাতে বোটটিতে আগুনের হল্কা দেখা গেল। একই সাথে বিপুল পরিমাণে পানি উপর দিকে উত্থিত হলো। বোমার আঘাতে সৃষ্ট বড় বড় ঢেউগুলো যখন শান্ত হলো তখন বোটটিকে আর দেখা গেল না। অর্থাৎ সকল নাবিকসহ বোটটির সলিল সমাধি

ঘটলো। ঘাটের লোকজন সবাই সমস্বরে জয় বাংলা বলে চিৎকার করে উঠলো।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর একটি নৌকা হাতিয়া যেতে রাজী হলো। যাত্রী মাত্র কয়েকজন। নৌকায় উঠেও উত্তেজনাকর বিমান যুদ্ধের আলোচনায় সবাই নিমগ্ন থাকলো। আমি এর পূর্বে এরকম বিমান যুদ্ধ দেখিনি।

আমার রোমাঞ্চিত মনোভাব বুঝতে পেরে ট্যাডি বললো, নিশ্চিত থাকো যে তোমাদের সুদিন এখন সমাগত। আমিও ভাগ্যবান কারণ স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থানের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকলাম।

হাতিয়া ঘাটে রেড ক্রস পতাকা উড়ছে তা দূর থেকেই দেখতে পেলাম। তিনটি বোট থেকে মালামাল খালাস করার প্রেক্ষিতে ঘাটে রেড ক্রসের পতাকা উড়ানো হয়েছে। মঈনউদ্দিন ও লোকমানকে ঘাটেই পেয়ে গেলাম। চট্টগ্রাম থেকে প্রেরিত চাল, কম্বল, ক্রোকারিজ ইত্যাদি ত্রাণসামগ্রী গতকাল হাতিয়ায় পৌঁছানোর পর মঈনউদ্দিন সেগুলো সংরক্ষণের কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে দুটি বোট থেকে মালামাল নামানো হয়েছে এবং বাকি বোটটির মালামাল আজ নামানো হবে। ত্রাণ সামগ্রী নামানো, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি করতে করতে সারাদিন কেটে গেল। চালের বস্তা হুজিমিজিতে পূর্বে রক্ষিত চালের সাথে রাখা হলো। পরদিন রফিকের সাথে দেখা হলো। নতুন বাংলাদেশ সরকার জেনেভা চুক্তি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা স্মরণ কারিয়ে হাতিয়াতে আর কোন হত্যাকাণ্ড যাতে না ঘটে সে বিষয়ে প্রচেষ্টা নিতে ট্যাডি রফিককে অনুরোধ করলেন। ঐ দিনই আমরা চর জব্বার ফিরে গিয়ে বিকেলবেলায় মাইজদী পৌঁছুলাম।

১৫ ডিসেম্বর ট্যাডি, জাঁ পিয়ের গর্স্তাদ এবং আমি ফেনী হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত কতিপয় হাসপাতাল ও ভারতীয় বাহিনীর একটি চিকিৎসা কেন্দ্রের অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য বের হলাম। ট্যাডি ফেনী হাসপাতালের ডঃ আতিয়ারের সাথে দেখা করে রোগীদের খোঁজখবর নিলেন। হাইওয়ে দিয়ে চলার সময় মাঝে মাঝে কামানের আওয়াজ ও গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছিলাম। এরমধ্যে কয়েকটি ট্যাংক দেখলাম এক জায়গায় স্থিত অবস্থায় রয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর যুদ্ধ বিমান চট্টগ্রামের দিক উড়ে যাচ্ছে। মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যদের একচ্ছত্র দাপটের বহিঃপ্রকাশ দৃশ্যমান। চট্টগ্রামের পথে ভগ্ন সেতুগুলো পার হতে বেশ বেগ পেতে হলো। পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যাওয়ার সময় এ সকল সেতু ডিনামাইট দিয়ে

উড়িয়ে দিয়ে গেছে। আমরা চট্টগ্রাম শহরে আগ্রাবাদ হোটেলে গিয়ে উঠলাম। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ডেলিগেট পশ্চিম জার্মানির কোখ ও অস্ট্রিয়ার ইয়ানৎস চট্টগ্রামের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং এই হোটেলে থেকেই তাঁরা তাঁদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন।

পরদিন ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সংবাদ পেলাম সন্ধ্যা বেলায়। আনন্দের আতিশয্যে আমি চিৎকার করে ট্যাডিকে তা জানালাম। ট্যাডি বললো যে সংবাদটি সে কিছুক্ষণ পূর্বেই অবগত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য আমি লাবলুকে টেলিফোন করলাম। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর সংযোগ পাওয়া গেল। লাবলু উচ্চস্বরে গদগদ কণ্ঠে জানালো যে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করেছে, এখন আমরা স্বাধীন। এখানকার দৃশ্য আমি তেংমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। এমন দুর্লভ মুহূর্ত জীবনে আর একটি কখনো খুঁজে পাবেনা, তুমি ঢাকায় না থেকে সত্যি বড় ভুল করলে। টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

রাস্তায় মানুষের হৈ-হুল্লা ও জয় বাংলা ধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু ঢাকা পতনের পরও চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ থামেনি। তবে মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় সেনারা চারিদিক থেকে চট্টগ্রামকে অবরোধ করে ফেলায় পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হলো। আগ্রাবাদ হোটেলে আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া সম্পাদনে রেড ক্রস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলো। জাঁ পিয়ের গর্ন্তাদ ও কোখ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করলেন। হোটেলে অবস্থানরত কয়েকশত পাকিস্তানি সেনাদেরকে বন্দী করা হলো। পাকিস্তানি বাহিনীর এতো সেনা যে এই হোটেলে অবস্থান নিয়েছিল তা আমি ধারণাই করতে পারিনি। দেশ এবার সম্পূর্ণ মুক্ত। একটা অদম্য ও দীর্ঘলালিত প্রত্যাশার উন্মেষ ঘটলো। এই মুক্ত পরিবেশে নিকট আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা করার জন্য মনটা উতলা হয়ে উঠলো।

১৮ ডিসেম্বর ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে সারাদিন কাটলো। বেসামরিক যুদ্ধবন্দীদের নিরাপত্তার বিষয়ে জাঁ পিয়ের গর্ন্তাদ ও কোখের কর্মতৎপরতায় ট্যাডিও জড়িয়ে গেলেন। আমি আমাদের জীপ গাড়ীটার কিছু মেরামত কাজ করানোর জন্য দিনের বেশীরভাগ সময় গ্যারেজে কাটলাম।

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা গমন

পরদিন প্রত্যুষে ট্যাডির সাথে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় গাড়ী কম থাকলেও ভারতীয় বাহিনীর ট্রাক ও জীপ অহরহ দেখা যাচ্ছে। রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ ষ্টপেজগুলোর দোকানপাট ও বিভিন্ন স্থাপনায় বাংলাদেশের পতাকা টানানো হয়েছে। মানুষের বাঁধভাঙ্গা উল্লাসের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিবাহিনীর চেকপোষ্টে আমাদেরকে থামতে হলো। কুমিল্লা পৌঁছার পর গাড়ীর জ্বালানী নেয়া হলো। এই ফাঁকে আমি কিছু পাউরুটি, বিস্কুট ও কলা কিনে নিলাম।

হাতিয়ার ম্যাজিট্রেট আহ্‌মেদের বাড়ি এই কুমিল্লায়। তিনি আমাদেরকে অনুরোধ করেছিলেন আমরা যেনো তাঁর বোন এবং ভাগিনাকে আমাদের গাড়ীতে করে ঢাকায় পোঁছে দেই। ওদেরকে গাড়ীতে উঠিয়ে আমরা ঢাকার পথে রওয়ানা হলাম। ম্যাজিট্রেট আহ্‌মেদের বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। ট্যাডির সাথে আলোচনায় কুমিল্লায় পাকিস্তানি বাহিনীর পৈশাচিকতা ও নারী নির্যাতনের যে মর্মস্পর্শী বর্ণনা তিনি দিলেন তা শুনে এতো আনন্দের মধ্যেও মনটা বিষাদে ভরে উঠলো। আমি স্তম্ভিত হলাম যখন জানতে পারলাম যে এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক যুবতীকে পাকিস্তানিরা তাদের ক্যাম্পে আটকে রেখে দিনের পর দিন নির্যাতন করেছে।

কুমিল্লা থেকে ঢাকা যেতে তিনটি ফেরির সাথে আরো দুটি যোগ হয়েছে কারণ পাকিস্তানিরা পশ্চাদপসরণের সময় দুটি বড় সেতু ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছিল। ফেরিঘাটে ভারতীয় গাড়িবহরের দীর্ঘ লাইন। কয়েকশত ট্রাক পার হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা ভারতীয় সেনা ও অন্যান্য যাত্রীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সময় কাটালাম। সে দিন শেষ পর্যন্ত আমরা ফেরি ধরতে পারলাম না। ঘাটেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা হলো। পাউরুটি ও কলা দিয়ে রাতের খাবার সম্পন্ন হলো। ম্যাজিট্রেট আহ্‌মেদের বোন ও ভাগিনাকে গাড়ীর ভেতর ঘুমানোর জন্য বলা হলো। ট্যাডি ও আমি এয়ার ম্যাট্রেস পেতে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হলো যে আজ রাতে তারাগুলো আরো সমুজ্জ্বল হয়েছে। ট্যাডি ঘুমিয়ে গেলেও আমি নির্ঘুম রাত কাটালাম।

পরদিন প্রথম ফেরিটি পার হতে দু ঘন্টারও বেশী লাগলো। দ্বিতীয় ফেরিঘাটেও অপেক্ষার পালা। ভারতীয় সেনারা বিধ্বস্ত সেতুর মধ্যে দুটি মাইনের সন্ধান পেয়েছে এবং ওগুলো ধ্বংস না করা পর্যন্ত ফেরি চলবে না। কিছুক্ষণ পর বিকট শব্দে পর পর দুটি মাইন বিস্ফোরিত হলো। একগাদা ভাঙ্গা কংক্রিট টুকরো টুকরো হয়ে উপরে উত্থিত হলো। কদিন পূর্বে বেলোনিয়া যাওয়ার পথে রাতের বেলা মাইন ফাটার শব্দ শুনেছিলাম এবার দিনের বেলায় এর প্রতিক্রিয়া কি ভয়ানক তা দেখলাম। এভাবে চলতে চলতে ঢাকার পথে চতুর্থ ফেরি পার হয়ে এগিয়ে গেলাম। এখান থেকে নারায়ণগঞ্জ বেশী দূরে নয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শুনেছিলাম যে স্বাধীনতা যুদ্ধে নারায়ণগঞ্জ সবচেয়ে রক্তাক্ত শহর। আশেপাশে তাঁকিয়ে সেই বক্তব্যের জ্বলন্ত স্বাক্ষর দেখতে পেলাম। শীতলক্ষ্যা নদীর শেষ ফেরিটি পার হওয়ার পর জীপে আমরা চারজন বাঙ্গালীর আনন্দের সীমা যেন বাঁধ ভেঙ্গে উপচিয়ে পড়লো। আমি গান না জানলেও আচমকা জয় বাংলা ও শেখ মুজিবকে নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে একটা গান গেয়ে ফেললাম। সবাই হাততালি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করলো। ট্যাডি গাইলো “উই শেল ওভার কাম সাম ডে”। ম্যাজিষ্ট্রেট আহ্‌মেদের বোন বললো, ঐ সাম ডে হচ্ছে আজকের এই দিন, আপনাকে ধন্যবাদ ট্যাডি। অনেক মানুষ পায়ে হেঁটে ঢাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এরা যুদ্ধের সময় ঢাকার বাইরে চলে গিয়েছিল। এদের অনেকের হাতে বাংলাদেশের পতাকা। একজনতো এগিয়ে এসে আমাদের গাড়ীতে একটা পতাকা এবং শেখ মুজিবের একটা পোষ্টার লাগিয়ে দিল এবং ট্যাডিকে বিদেশী বন্ধু ভেবে ফুলের মালা গলায় পড়িয়ে দিল।

দেশ স্বাধীনের পর রেড ক্রসের কর্ম তৎপরতা

ঢাকায় পৌঁছানোর পর ট্যাডির সাথে জাপানের কনস্যুলেট জেনারেলের অফিস হয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে গেলাম। এই হোটেলে আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের বাংলাদেশের সদর দপ্তর অবস্থিত। এই হোটেলকে নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। হোটেলে রিসিপশনের সামনে সেভন ল্যাম্পেলকে পাওয়া গেল। তিনি ট্যাডি ও আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন। ফিনল্যান্ড থেকে আসা আমাদের নতুন সহকর্মী এ্যালাঙ্কো জানালেন যে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা লাম্পেলের উপর

গুলি বর্ষণ করেছিল। যুদ্ধ বন্ধ করা ও প্রাণহানী রোধের বিষয়ে জেনারেল নিয়াজী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার জন্য লাম্পেল ক্যান্টনমেন্টে গিয়েছিলেন।

আলোচনা শেষ করে ফেরার পথে তাঁর জীপের উপর প্রচণ্ডভাবে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করা হয়। লাম্পেল মুহুর্তের মধ্যে জীপের মধ্যে শুয়ে পড়ে পেছন দিক দিয়ে নেমে সেখানে রাখা একটি রিক্সাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেন এবং পাশের একটি গলির মধ্যে ঢুকে নিজেকে রক্ষা করেন। লাম্পেল সুইডিস বিমান বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন বিধায় তাঁর উপর অবিরত মেশিনগানের গুলির মুখেও নিজেকে তিনি অক্ষত রাখতে পেরেছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা জানত, এটি রেড ক্রসের গাড়ি তবু কেন হামলা হলো তা আর কখনোই জানা যায়নি।

পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের পর আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের কর্মতৎপরতা বহুগুণে বেড়ে গেছে। স্বভাবতই রেড ক্রসের প্রধান হিসাবে সেভন লাম্পেলের উপর বিরাট দায়িত্ব বর্তেছে। তাঁকে রাতদিন কাজ করতে হচ্ছে। নতুন ডেলিগেট এ্যালাঙ্কো ও সুইডেনের এণ্ডারসন সার্বক্ষণিকভাবে লাম্পেলের সাথে কাজ করছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির মহাসচিব হিসাবে জনাব ফকরুল ইসলাম ত্রিপুরা থেকে ফিরে এসে কাজে যোগদান করেছেন। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের স্থানীয়দের মধ্যে কে, জে আহমদ, লাবলু, রুহুল আমিন, খালেক প্রমুখ কর্মকর্তাবৃন্দ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন। নিরপেক্ষ এলাকা হিসাবে এই হেটেলে এখন শতাধিক বিদেশী অবস্থান করছেন। এ ছাড়া সাবেক গভর্ণর ডা. আবদুল মালিকসহ সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ও তাঁদের আত্মীয়স্বজন, সেই সঙ্গে সরকারের পক্ষে কাজ করা পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মকর্তারা মিলিয়ে পাঁচশত জনের অধিক মানুষের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রেড ক্রস পালন করছে। লাম্পেল ট্যাডিকে যুদ্ধবন্দী ও বিহারীদের দেখাশুনা করার জন্য নতুন দায়িত্ব প্রদান করলেন। এ সকল সংবেদনশীল দায়িত্ব পালনে ট্যাডির সহকারী হিসাবে তাঁর সাথে আমিও কিছুদিন দায়িত্ব পালন করলাম। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার হেগস্ট্রমের সাথে আমার সাক্ষাত ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হলো।

ডিসেম্বর মাসের ২৩ তারিখে মোহম্মদপুর ও মিরপুরে বিহারীদের ক্যাম্পে শিশুখাদ্যের সংস্থানের কাজে সারাদিন কাটলো। দুপুরে লাঞ্চ করার সুযোগ

হয়নি বিধায় কোন চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে ডিনার করব বলে সিদ্ধান্ত হলো। ট্যাডি ও লাবলুকে নিয়ে সেগুনবাগিচায় ম্যাণ্ডারিন চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে গেলাম। আমরা খাবারের অর্ডার দিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করছিলাম। পাশের টেবিলে কয়েকজন যুবক বেশ উঁচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছিল। মাঝে মধ্যে তাঁরা ইংরেজীতেও কথা বলছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড বিষয়ক কথাবার্তার এক পর্যায়ে ট্যাডি হঠাৎ করে এমন একটি মন্তব্য করে বসলো যে মুহূর্তের মধ্যে ঐ তিনজন যুবক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে আমাদের টেবিলটা উল্টিয়ে দিল, টেবিলের উপর রাখা পানির গ্লাস, কোকের বোতল ইত্যাদি ফ্লোরের উপর সশব্দে ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো। একজন তার কোমরে রক্ষিত পিস্তলের উপর হাত দিয়ে আমাদেরকে বাইরে গিয়ে তাঁদের গাড়ীতে উঠার জন্য চিৎকার করে নির্দেশ দিল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে যাওয়ায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। ট্যাডি কিছু বলতে চাইলেও তাঁকে নিবৃত্ত করে আমেরিকার দালাল বলে ভর্ৎসনা করা হচ্ছিল।

যখন দেখলাম যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন আমি টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের সামনে গিয়ে চিৎকার করে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বললাম, আপনারা ভুল করছেন। আমাদের সাথের এই জাপানির নাম তাদামাসা ফুকিউরা, তিনি আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের প্রতিনিধি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সমর্থক। মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ফুকিউরা এবং আমাদের অবদানের কথা জানতে পারলে আপনারা অবশ্যই বিস্মিত হবেন এবং সে বিষয়ে আমি শতভাগ নিশ্চিত।

উঁচুগলায় দৃঢ়তর কণ্ঠস্বরে প্রদত্ত আমার বক্তব্য টনিকের মত কাজ করলো। ওরা তিনজনই কিছুটা স্তিমিত হয়ে আমাদের টেবিলের কাছে চলে এলো। এরপর বিস্তারিতভাবে আমাদের পরিচয় এবং হাতিয়া ও মাইজদীতে আমাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে জানার পর তারা ট্যাডির হাত ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। ট্যাডি, লাবলু ও আমাকে জড়িয়ে ধরে ওরা যে ভুল করেছে তা বার বার বলতে লাগলো। পরিস্থিতি এমন হলো যে আমরা সবাই মিলে একটি বড় টেবিল নিয়ে বসলাম এবং একসাথে ডিনার করলাম। আলাপ-পরিচয়ে জানতে পারলাম যে ওদের নাম কামাল, মুন্না এবং শাহেদ। ওরা সবাই মায়া গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধা।

ডিনার শেষে বিদায় নেয়ার সময় ওরা ওদের টেলিফোন নম্বর দিয়ে বললো যে যদি কোন প্রয়োজন হয় তবে যেনো আমরা ওদের সাথে যোগাযোগ করি। ট্যাডি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ওদেরকে ডিনারের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, আপনাদের সুবিধামত একদিন আসবেন, খুশী হব।

পরের কয়েকদিন আমি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ট্যাডিকে সহায়তা করলাম। এর মধ্যে নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীদের অনুসন্ধানের কাজও করতে হয়েছে। শহীদুল্লা কায়সারের অনুসন্ধানের জন্য ট্যাডির সাথে ক্যান্টনমেন্টে গেলাম ডিসেম্বরের ২৫ তারিখে। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বশিরের সাথে সাক্ষাৎ ও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা। যদিও জেনারেল বশির বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে জানালেন।

সেদিন জানুয়ারির ৩ তারিখ, সন্ধ্যাবেলা। কামাল, মুন্না ও তাঁদের একজন সহযোগী ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ট্যাডির আমন্ত্রণে সমবেত হয়েছে। লাবলু ও আমি ওদের সাথে যোগ দিয়ে ট্যাডির রুমে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। কামালের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনছিলাম এবং উপভোগ করছিলাম। রাত তখন আটটা পার হয়ে গেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে আমরা হতচকিত হয়ে গেলাম। গোলাগুলির কারণ অনুসন্ধানের জন্য কামাল টেলিফোনে চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারলেন না। এমনসময় জাপানিজ সাংবাদিক মি. আবে ট্যাডির রুমে এসে জানালেন যে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং অচিরেই তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করবেন। এতো বড় একটা সংবাদ উদযাপনের জন্য সবাই আকাশের দিকে ফাঁকা গুলি ছুড়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে।

এ সংবাদ শোনার সাথে সাথে রুমের সবাই জয় বাংলা, জয় বাংলা চিৎকার শুরু করলো। বাঁধভাঙ্গা আনন্দের জোয়ার হোটেলের সর্বত্র। আমি এবার সগর্বে দাঁড়িয়ে বললাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে দেশ স্বাধীন হলে দাঁড়ি গোঁফ কাটাবো, দেশ যখন স্বাধীন হলো তখন বঙ্গবন্ধু মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা প্রলম্বিত করলাম, এবার শর্ত পূরণ হওয়ায় দাঁড়ি গোঁফ ছেটে ফেলবো। আমার কথা শুনে কামাল বললো, সেদিন ম্যাণ্ডারিন হোটেলে আপনার দাঁড়ি গোঁফ দেখে আপনাকে একজন রাজাকার বলে ভেবেছিলাম। কামালের কথা শুনে সবাই একযোগে হেসে উঠলো। ট্যাডির প্রস্তাবে আমরা গুলিস্তান হয়ে ধানমণ্ডি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেলাম। অগণিত মানুষের আনন্দধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। হোটেলে ফিরে আমরা যখন ডিনার করলাম তখন রাতের মধ্য প্রহর পার হয়ে গেছে।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি-র প্রতিষ্ঠা

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরপরই হেগস্ট্রম ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক একটি কাঠামো প্রণয়ন করলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো এবং সমসাময়িক সময়েই ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বা সিপিপি-র জন্ম হলো। সিপিপি-র জন্মের সাথে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই অসামান্য যোগসূত্র আমাদেরকে উল্লসিত ও গর্ববোধে উদ্ভাসিত করলো। গভীর মনোযোগ ও একাগ্রতা নিয়ে উপকূলীয় জন-মানুষের আকাঙ্খার পর্যালোচনা ও একনিষ্ঠভাবে মনোঃসংযোগ তথা সাধনার পর মিঃ হেগস্ট্রম ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক যে কাঠামোটি প্রণয়ন করলেন মূলত সেটিই ছিল ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির বর্তমান ইউনিট পর্যায় থেকে আঞ্চলিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠামো। দেশ স্বাধীনের পর সিপিপি-র জন্মের মাধ্যমে আরো একটি দীর্ঘ লালিত প্রত্যাশার উন্মেষ ঘটলো।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত তদানীন্তন বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি হেগস্ট্রম এর প্রস্তাবে অনুমোদন প্রদান করলো। সোসাইটির নতুন চেয়ারম্যান জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা সিপিপি বাস্তবায়নে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিলেন। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মকাণ্ড বিষয়ে প্রণীত কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই হেগস্ট্রম পরবর্তী কার্যক্রমের প্রতি মনোযোগী হলেন।

এর মধ্যে একদিন হেগস্ট্রম নোয়াখালী হয়ে হাতিয়া যাবেন বলে ঠিক করলেন। নোয়াখালীর এস ডি ও এবং হাতিয়ার সার্কেল অফিসারের সাথে আলোচনা করাই ছিল এই সফরের মূল উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা অনুযায়ী হেগস্ট্রম ও আমি ঢাকা থেকে সকালবেলা গাড়ী নিয়ে রওয়ানা হলাম। নোয়াখালী পৌঁছে দুপুরের পর এস ডি ও এর সাথে মিটিং হলো। মিটিংয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা, রূপরেখা ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করা হলো। মিটিং শেষ করে আমরা নোয়াখালী রেড ক্রস অফিসে রাত্রিযাপন করলাম।

পরদিন প্রত্যুষে গাড়ী নিয়ে চর জব্বার ঘাটে পৌঁছুলাম। ভাগ্য ভাল বলে সকালের প্রথম খেয়াটাই পেয়ে গেলাম। একজন মাঝি শিঙ্গা ফুঁকে যাত্রার প্রস্তুতি ঘোষণা করলো। দাঁড়টানা নৌকায় আমরা পঁচিশ ত্রিশ জন যাত্রী। অল্পক্ষণ পর পুনর্বার

শিঙ্গা ফুঁকে নৌকা ঘাট ছাড়লো। শীতের সকালে ঠান্ডায় জড়োসড়ো হয়ে বসেছি সবাই। সরু খাল দিয়ে ধীর গতিতে বড় নদীর দিকে এগিয়ে চলেছে নৌকা। একজন মাঝি সুরেলা কণ্ঠে স্থানীয় ভাষায় ডাক ছেড়ে বললো, ঝুমে ঝুমে চলরে, দাঁড় টানো জোরেরে, এই পারের যাত্রীরা ঐ পারে যাবেরে, এহ্ হে হে রে। ছয় সাত জন মাঝি সুরেলা কণ্ঠে ডাক হেঁকে হেঁকে ঐ পংতিগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে করতে পূর্ণ উদ্যমে দাঁড় টানতে থাকলো। দাঁড়গুলো ক্রমাগতভাবে জোরে জোরে আছড়ে পড়ছে পানিতে। উচ্ছলিত পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সাথে ছয়জন মাঝির ছন্দময় উচ্চারণ নৌকার মধ্যে এক মোহময় আবেশের সৃষ্টি করলো।

হেগস্ট্রম বললো, ভাল করে চেয়ে দেখো, প্রেরণা কিভাবে মাঝিদেরকে প্রভাবিত করছে। ধীরে চলা নৌকাটির গতি এখন বেড়েছে। নেতা ও কর্মীদের মাঝে এক চমৎকার সমন্বয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। নেতা প্রত্যেকটি কর্মীর চোখে চোখ রেখে তাদেরকে কি চমৎকারভাবে প্রভাবিত করছে। আসলে ভাল করে দেখলে দেখতে পাবে যে সবকিছুর মধ্যেই আমাদের কিছু না কিছু শেখার রয়েছে।

আমি বললাম, দাঁড় টানায় গতি সঞ্চারের জন্য এই ধরনের উদ্দীপনামূলক হাঁকডাকের প্রচলন এখানকার ঐতিহ্যেরই একটা অংশ। পরিস্থিতির প্রয়োজনে শারীরিক শক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগের জন্যই এ ধরনের ডাকের ব্যবহার করা হয়। এ সকল নৌকায় ইঞ্জিন না থাকায় জোয়ার ভাটাকে কাজে লাগিয়ে চালাতে হয়। ভাটা শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ পূর্বে। এই সরু খালটা পার হয়ে বড় নদীতে পড়লেই ভাটার টানে বোটের গতি অনেক বেড়ে যাবে এবং দাঁড় টানার আর প্রয়োজন হবে না। হেগস্ট্রম বললো, আমাদের দেশে সকল প্রকার নৌকাই ইঞ্জিন দিয়ে চালিত হয়। হয়তো বহুপূর্বে আমাদের দেশেও জোয়ারভাটাকে কাজে লাগিয়ে এমনিভাবেই নৌকা চালানো হতো। আগামীতে একদিন দেখবে যে তোমাদের এখানেও সকল নৌকাই ইঞ্জিন দিয়ে চালিত হচ্ছে। প্রকৃতির উদার দান জোয়ার-ভাটার অনাদিকালের সুবিধার কথা আমরা বেমালুম ভুলে যাব। প্রকৃতি মানুষকে কতকিছুইনা দিয়েছে, তবু আমরা প্রকৃতির সাথে থাকতে চাই না, উপরন্ত আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধচারণ করতে দ্বিধা করছি না কখনো।

আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে হেগস্ট্রমের কথাগুলো শুনছিলাম এবং ভাবছিলাম যে মানুষের দেখার ও তা বুঝে নিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা যার যত বেশী সেই সফলভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারে তত বেশী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খেয়া নৌকাটি বড় নদীতে গিয়ে পড়লো। ভাটার প্রবল টানে নৌকার গতি বেড়ে গেল অনেক। নেতামাঝি হাল ধরে সামনে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দাঁড়টানা বন্ধ করে অন্য মাঝিরাও বসে রয়েছে। চলতে চলতে একসময় নৌকা হাতিয়া ঘাটে এসে নোঙর করলো। আমরা নৌকা থেকে নেমে রিক্সার খোঁজ করলাম। এখনো অনেক সকাল। দু একজন মানুষ দেখলাম আমাদের দিকে তাঁকিয়ে আমাদের পারাপার উপভোগ করছে। ওদের মধ্যে একজন বললো যে রিক্সা চালকেরা এখনো কেউ আসেনি, আপনাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। এদিক সেদিক কয়েকটা রিক্সা রাস্তার পাশে রাখা আছে কিন্তু চালক না পাওয়ায় আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। ইত্যবসরে অন্যান্য সকল যাত্রী পায়ে হেঁটে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর হেগস্ট্রম বললো, চল একটা কাজ করি, তুমি একটা রিক্সায় উঠে বস আর আমি চালাই। এভাবে চালাতে চালাতে হাতিয়া পৌঁছুতে বেশীক্ষণ সময় লাগবে না। একথা বলেই তিনি একটি রিক্সা টেনে রাস্তায় তুলে নিয়ে বললেন, ওঠো রিক্সায় ওঠো।

আমি বললাম, হেগস্ট্রম রিক্সা চালানো কিন্তু সহজ নয়। এটা চালাতে গেলে এর নিয়ন্ত্রণ করার কায়দাটা শিখতে হবে।

আমার কথা শুনে হেগস্ট্রম একটা অট্টহাসি দিয়ে বললেন, কিযে বলছো হারুন, হরদম গাড়ী চালাচ্ছি আর এই তিন চাকার রিক্সা চালাতে পারবো না?

আমি হেগস্ট্রমকে একটু অপেক্ষা করতে বলে পাশের লোকটাকে শুধালাম যে আমরা নিজেরাই রিক্সা চালিয়ে হাতিয়াতে যেতে চাই এবং এক্ষেত্রে রিক্সাওয়ালাকে কিছু টাকা দিতেও আমরা প্রস্তুত। টাকার কথা শুনে লোকটি বললো, এই রিক্সার মালিক তার আত্মীয় এবং আপনারা রিক্সা নিয়ে যেতে পারেন। আমি তাকে বললাম যে রিক্সাটা রেড ক্রস অফিসের সামনে থাকবে। এরপর আমার ব্যাগটি তুলে নিয়ে রিক্সায় উঠলাম।

হেগস্ট্রম প্যাডেল করতে শুরু করলো, রিক্সার গতি বেড়ে গেল এবং মাত্র পাঁচ সাত গজ সামনে এগিয়ে রিক্সার হ্যান্ডেলটি ডানদিকে ঘুরে গেল, হেগস্ট্রম নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। রাস্তার ডান পাশে প্রায় দশ ফুট নিচে ঘন কচুরিপানা ভর্তি ডোবায় গিয়ে পড়লো রিক্সাটি। হতভম্ব হেগস্ট্রম কিছু বুঝে উঠার আগেই রিক্সার

সিটের উপর থেকে ছিটকে পড়লো ডোবায়। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম এবং সাথে সাথেই রিক্সা থেকে উল্টোদিকে লাফিয়ে পড়লাম। রাস্তার ঢালটা বেশী হওয়ায় আমি ছেঁচড়িয়ে ও পিছলিয়ে নিচের দিকে পড়তে পড়তে দুটো ব্যাগসমেত কোনরকমে ডোবার কিনারায় গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। ঘুরে চেয়ে দেখলাম যে রিক্সাটা ধীরে ধীরে ডুবছে কিন্তু হেগস্ট্রমের কোন হদিস নেই। ডোবার পানিতে পড়ে সে ডুবে গেছে এখনও বের হতে পারেনি।

মনে মনে প্রমাদ গুনলাম, হেগস্ট্রম যদি সাঁতার না জানে তবে সে পানি থেকে বের হতে পারবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে শার্ট ও জুতা খুলে ফেললাম। পাশের লোকটিকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ডোবার একেবারে কিনারায় নেমে গেলাম। পানিতে ঝাঁপ দেওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঘন কচুরীপানার ফাঁক গলিয়ে হেগস্ট্রমের মাথাটা বেড়িয়ে এলো। আমার দিকে তাঁকিয়ে সে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লো। বাঁধভাঙ্গা সে হাসি যেনো আর থামতে চাইছে না।

ঘন কচুরীপানা সরিয়ে কিনারায় আসতে বেশ সময় লাগলো। আমি এবং আরো দুজন স্থানীয় লোক হেগস্ট্রমের হাতদুটো ধরে টেনে ওকে উপরে তুললাম। রাস্তার ঢালটা পানি পড়ে পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ায় উপরে উঠা সহজতর ছিল না। শীতের সকালের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপছিল সে। আমি আমার ব্যাগ রাখা একটি পশমী শাল বের করে দিলাম। হেগস্ট্রম তাঁর ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে মাথা ও শরীর মুছে নিয়ে রেশমী চাদর লুঙ্গির মতো পড়ে বাকীটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে তাঁকিয়ে আবার হাসতে আরম্ভ করলো। ইত্যবসরে ঘটনাস্থলে অনেক লোকের সমাগম ঘটেছে। হেগস্ট্রমের প্রচণ্ড হাসিতে আমিও ক্রমাগত হেসে যাচ্ছিলাম এবং ক্রমান্বয়ে স্থানীয় লোকজনও এই মহা হাসিতে যোগ দিলেন। সেদিন সকাল বেলা হাতিয়া ঘাটে হাসির এক মহামেলা অনুষ্ঠিত হলো।

আমি রিক্সার মালিককে খুঁজে তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে রিক্সাটি ডোবা থেকে তুলে নিতে বললাম। আরেকটি রিক্সা নিয়ে আমরা ঘাট থেকে প্রস্থান করে হাতিয়া অফিসে পৌঁছলাম। মঈনউদ্দিন এবং লোকমান হেগস্ট্রমের এই অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলো। লোকমান ভিজা কাপড়চোপড় ধুয়ে রোদে শুকাতে দিল। আমরা ঐ দিনই বিকেলে মাইজদী ফিরে এলাম এবং পরদিন সকালে রওয়ানা হয়ে বিকেলে ঢাকায় পৌঁছলাম। রিক্সা দুর্ঘটনার পর হেগস্ট্রম যে পরিমাণ হেসেছিলেন তা হয়তো তিনি তাঁর সারাজীবনেও হাসেননি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে নতুন সরকার ব্যতিব্যস্ত। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের উত্থানের পর সবাই পুনরুদ্যমে যার যার কাজ করে যাচ্ছে। হেগস্ট্রমের নির্দেশ মতে এখন আমি তাঁর সাথে আরো নিবিড়ভাবে কাজ করছি।

বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির সেগুনবাগিচা অফিস থেকে হেগস্ট্রমের কাজে সহায়তার জন্য এ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে এমদাদ হোসেন প্রথম থেকেই কাজ করছিলেন। এই সময়ে একজন অফিস সেক্রেটারী মোহাম্মদ হোসেন দাপ্তরিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত হলেন। ১২ নং নিউ ইস্কাটনে অফিস ভাড়া নেওয়া হলো। ঐ অফিস থেকেই সিপিপি-র শুরুকালীন সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে থাকল। এর মধ্যে থানা পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, থানা পর্যায়ে কাজ করার জন্য কর্মকর্তা ও স্টাফ নিয়োগ, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তড়িৎ যোগাযোগের জন্য ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক স্থাপন, বিদেশ থেকে উন্নতমানের সাংকেতিক যন্ত্রপাতিসহ স্পীডবোট ও বিভিন্ন ধরনের জলযান সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য হেগস্ট্রম সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হোটেল ছেড়ে দিয়ে তিনি গুলশানে ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থান নিলেন। মাঝে মধ্যে গুলশানের বাড়িতে আমাকে অবস্থান করতে হতো এবং ঐ সময়ে আমি তাঁকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে দেখেছি। তিনি মাঝে মাঝেই বলতেন যে দেশটা স্বাধীন হয়েছে, বিধ্বস্ত এই দেশের পুনর্গঠনে সবাই যার যার কাজ করে যাচ্ছে এবং আমাদেরকেও আমাদের কাজ সহসাই শেষ করতে হবে। আমরা অবশ্যই আশা করব যে যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত এই দেশে আবার কোন ঘূর্ণিঝড় যেনো আর কোন প্রাণহানি এবং বড় কোন ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে না পারে। এর মধ্যে একদিন হেগস্ট্রম আমাদেরকে নিয়ে এয়ারপোর্টে এলেন। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের ভাড়া করা 'বালায়ার' ডিসি-৮ বিমানের সামনে গিয়ে



দেখলাম যে বিমান থেকে রেড ক্রস প্রতীক অংকিত সাদা রংয়ের দুটি স্পীড বোট নামনো হচ্ছে। হেগস্ট্রম আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই স্পীডবোট দুটো সিপিপি-র কাজে ব্যবহৃত হবে। পরবর্তীতে আরো বোট আনা হবে। এর একটি বোট নিয়ে দু একদিনের মধ্যেই তুমি হাতিয়া যাবে। আমি মাথা নেড়ে হেগস্ট্রমের বক্তব্যের প্রতি সম্মতি জানালাম। এর পর কে, জে, আহম্মদকে অনুসরণ করে আমরা একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম যে রেড ক্রসের ব্যবহারের জন্য ছোট্ট একটি সাদা রংয়ের ফুটফুটে হেলিকপ্টার। একজন বিদেশী প্রকৌশলী হেলিকপ্টারের রোটার ব্লেড সংযোজন করছেন এবং সেভন ল্যাম্পেল তা তদারকি করছেন।



আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের হেলিকপ্টার

হেগস্ট্রমকে স্বাগত জানিয়ে লাম্পেল বললেন যে হেলিকপ্টারটি গতকাল ঢাকায় পৌঁছেছে, দ্বিতীয়টিও দু একদিনের মধ্যে চলে আসবে। হেগস্ট্রম আমাদেরকে বললেন যে উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি হেলিকপ্টার আমরা ক্রমাগতভাবে ব্যবহার করতে পারব। আমি বললাম যে উপকূলীয় এলাকার সাথে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাটা হেলিকপ্টারের বদৌলতে সহজ ও দ্রুততর হবে ফলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ করা যাবে।

এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে এমদাদ হোসেন ও আমি ফায়ার সার্ভিস অফিসে গেলাম এবং স্পীডবোট চালনার জন্য একজন ড্রাইভারের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। একজন স্পীডবোট ড্রাইভার সংস্থানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের সাথে

এমদাদ হোসেন পূর্বেই যোগাযোগ করেছিলেন। আমরা স্পীডবোট ড্রাইভারের সাথে কথাবার্তা বলে অফিসে ফিরলাম। হেগস্ট্রম আমাকে জনৈক সালাউদ্দিন নামে একজনের সাথে আলাপ করতে বললেন। অফিসের রিসিপশন কক্ষে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি নিজেকে সালাউদ্দিন পরিচয় দিয়ে বললেন যে স্পীড বোট চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ এবং আমাদের সাথে হাতিয়ায় কাজ করতে ইচ্ছুক। চল্লিশোর্ধ বয়সী হাস্যরসবোধে উজ্জীবিত সালাউদ্দিনকে খুবই কর্মচঞ্চল বলে মনে হলো। হেগস্ট্রম ঐ দিনই তাঁকে নিয়োগপত্র দিয়ে হাতিয়াতে তাঁর কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করলেন।

স্পীডবোট নিয়ে ঢাকা থেকে হাতিয়া গমন

সে দিনটি ছিল ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসের ২১ তারিখ। সকাল আটটার সময় ফায়ার সার্ভিসের একজন ড্রাইভার, সালাউদ্দিন ও আমি ঢাকা সদরঘাটে এসে জমায়েত হলাম। স্পীড বোট চালিয়ে হাতিয়া যেতে হবে। সুইডেন থেকে সদ্য সংগৃহীত গ্লাস ফাইবার নির্মিত ২৪ ফুট লম্বা রায়ডস্ মডেলের বডি, ৭৫ হর্স পাওয়ারের দুটি ক্রাইসলার আউটবোর্ড ইঞ্জিন ও ক্যানভাসের ওভারহেড শেড সম্বলিত চকচকে স্পীড বোটটি দেখে মনের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল।

বোটটির দুই পাশে রেড ক্রসের প্রতীক অংকিত থাকায় ওটি আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে আমি কখনো স্পীডবোটে ভ্রমণ করিনি। ছোট্ট স্পীডবোটে চেপে দীর্ঘ নদীপথ পেরিয়ে সাগরের মোহনায় দূর-দূরান্তের একটি দ্বীপে যাত্রার জন্য আমরা প্রস্তুত। সদরঘাটে অনেক মানুষ স্পীড নিয়ে আমাদের কার্যকলাপ উপভোগ করছিল। পাঁচ গ্যালন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ১২টি কন্টেনার ভর্তি পেট্রোলসহ অন্যান্য সামগ্রী বোটে তোলা হলো।

সালাউদ্দিন এক হাতে চা ভর্তি ফ্লাস্ক ও অন্য হাতে কিছু শুকনো খাবার ও কিছু ফলমূল নিয়ে এসে বললো, নদীপথে তো আর খাবার পাওয়া যাবে না তাই এগুলো নিয়ে এলাম, কাজে লাগবে। আমার এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সালাউদ্দিন বললো, আমাকে সালাউদ্দিন নানা বলে ডাকলে আমি খুশী হবো। আমি সহাস্য বদনে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লাম। সালাউদ্দিন নানা আমাকে আপনি থেকে তুমি বলে সম্বোধন শুরু করলো।

ইতিমধ্যে ড্রাইভার ইঞ্জিন সচল করে বোটটিকে চালিয়ে দিলেন। সালাউদ্দিন নানাকে দ্বিধাগ্রস্ত ও চিন্তিত দেখাচ্ছে। তিনি স্পীডবোটের সিট আঁকড়ে ধরে জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছেন, চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ঢেউয়ের উপর দিয়ে চলার সময় স্পীডবোট যখন কেঁপে কেঁপে উঠছিল ঠিক তখনই সালাউদ্দিনের কাঁপুনিও বেড়ে যাচ্ছিল তা প্রত্যক্ষ করলাম।

আমি বললাম, আপনিতো স্পীডবোটের বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন মানুষ, তবে স্পীডবোটে উঠে এতো ভয় পাচ্ছেন কেন? সালাউদ্দিন নানা ভয়জনিত কণ্ঠে হাসির ব্যর্থ চেষ্টা করে বললো, এ বিষয়ে এখন আর কোন আলোচনা করতে চাই না, পরে তোমাকে সব খুলে বলব।

দূরন্ত গতিতে ছুটে চলছে স্পীডবোট। শীতের সকালে নদীর শীতল বাতাস প্রবল বেগে আমাদের শরীর ও মন সিক্ত করে দিচ্ছিল। রোমাঞ্চকর এক অনন্য অনুভূতির মধ্য দিয়ে চারিদিকের দৃশ্যাবলী উপভোগ করছি। ছুটন্ত স্পীডবোট থেকে উন্মুক্ত নীল আকাশের দিগন্ত, আঁকাবাকা নদী, রংবেরংয়ের পালতোলা নৌকার বাহার, নদীপারের বৃক্ষরাজী, সবুজ ফসলে ভরা চরাভূমিতে উড়ে চলা হংসমিথুন দেখতে দেখতে মনে হলো এই অপরূপা বাংলাদেশর এতো রূপ-লাবণ্য আগেতো কখনো দেখিনি।

পানির উপর দিয়ে ছুটে চলা স্পীডবোটের গতির সাথে আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মানিয়ে নিয়েছি। এই দুর্বার গতিতে ছুটে চলতে আমি স্বাচ্ছন্দ অনুভব করছি। মনে মনে খুব খুশী হলাম কারণ এই স্পীডবোটটি তো হাতিয়াতেই থাকবে এবং দাপ্তরিক কাজে আমি হরহামেশাই এটি চালিয়ে কম সময়ের মধ্যেই কার্যক্রম সমাধা করতে পারবো। ভাবলাম সালাউদ্দিনের উপর ভরসা না করে আমি নিজেই বোট চালনা ও এর রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে ভালভাবে অবগত হবো।

চাঁদপুর পেরিয়ে নদীর বিশালতা দেখে স্তম্ভিত হলাম। পদ্মা ও যমুনা নদীর মিলনস্থল, বিশাল জলরাশির সমাহার। বৃষ্টিপাতের ফলে উজান থেকে নেমে আসা পানি এই অববাহিকা দিয়েই সাগরে সমর্পিত হয়। পানিচক্রের এই ধারাবাহিকতার ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটলে নানাবিধ বিপত্তি দেখা দেয়, বন্যার পানিতে নিমজ্জিত হয় দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। ইতিপূর্বে লঞ্চ থেকে এখানকার যে দৃশ্য দেখেছি তা থেকে এ দৃশ্য আলাদা কারণ ৩৬০ ডিগ্রির পুরোটাই এখন আমার কাছে উন্মুক্ত। ইতিমধ্যে প্রায় ঘন্টা তিনেক অতিক্রান্ত হওয়ার পর ড্রাইভার বোটের গতি স্তিমিত

করে বললো যে বোট থামিয়ে ট্যাঙ্কিতে তেল ঢালতে হবে। ৭৫ হর্স পাওয়ারের দুটো ইঞ্জিন একসাথে চলছে বিধায় তেল বেশী পুড়ছে। একটা চরাভূমির পাড় ঘেঁসে স্পীডবোটটি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার চরের উপর নোঙরটি ছুঁড়ে মারলো। এতক্ষণ যাবত নীরব থাকার পর সালাউদ্দিন নানা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এই সুযোগে আমরা চা পান করতে পারি। বোট থেকে একটা বৈঠা নিয়ে তা চরের উপর স্থাপন করে ভারসাম্য বজায় রেখে বললাম, চল নানা আমরা চরের উপর উঠে চা পান করি। আমার কথা মতো চায়ের ফ্লাক্স, তিনটি কাপ ও খাবারদাবার নিয়ে নানা চরে নামলেন।

হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে আমি মনের অজান্তেই সালাউদ্দিনকে শুধু নানা ও তুমি বলে সম্বোধন শুরু করেছি। এ পরিবর্তনের কথা শোনার পর সালাউদ্দিন নানা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। জনমানবহীন চরে কেউ তা শুনতে না পারলেও প্রতিধ্বনি হয়ে ঐ হাসির কম্পন যে বহু দূর অব্দি ভেসে গেল তা আমি অনুভব করলাম।

উন্মুক্ত নীল আকাশ, মৃদুমন্দ বাতাসে দোল খাওয়া পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, জলরাশির বিরামহীন ছুটে চলার মধ্যে এক টুকরো চরাভূমি। বিছানো ঘাসের উপর বজ্রাসন অবস্থায় বসে পড়লাম। ঘাসতো নয় যেন সবুজ গালিচা। নানার দেয়া টোষ্ট বিস্কুটের সাথে চা। আহা সেকি অপূর্ব আস্বাদন। মনে মনে ভাবলাম যে নৈসর্গিক পরিবেশে চা পানের এই বিরল অনুভূতি আমি যেন জীবনে কখনো ভুলে না যাই। একটু পরে ড্রাইভারও চরে নেমে এসে চায়ের আসরে যোগদান করলো। জনমানবহীন বিস্তীর্ণ এই চরে এসব মিলিয়ে একঘন্টার অধিক সময় পর আমরা আবার রওয়ানা হলাম। ড্রাইভার বললো যে গরম ইঞ্জিন দুটো অবসর পাওয়ায় এখন বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে। পথিমধ্যে দু এক জায়গায় চলমান নৌকার মাঝিদের নিকট থেকে পথনির্দেশনার জন্য থামতে হলো। দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর দূর থেকে হাতিয়া দ্বীপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। নদীপথে হাতিয়া থেকে চর জব্বার আমি কয়েকবার যাতায়াত করেছি কিন্তু আজ হাতিয়াকে যেনো অন্যরকম দেখছি, মনে হলো হাতিয়া পানির উপর দোলা খাচ্ছে।

হাতিয়া ঘাটে পৌঁছার পর প্রবল স্রোতের কারণে বোটটিকে সুস্থির রাখা কষ্টকর হচ্ছিল। ড্রাইভার বার বার চেষ্টা করেও যখন যথাস্থানে বোটটি নিয়ে যেতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন ঠিক তখনই এক তরুণ এগিয়ে এসে পানিতে নেমে বোটটি টেনে নিয়ে নোঙর করাতে সহায়তা করলো। এতে তরুণটির সারা শরীর ভিজে গেল।

ওর নাম মনিরউদ্দিন। ইত্যবসরে লোকমানের দেখা পেলাম। মনিরউদ্দিনের একাগ্রতা দেখে আমি ওকে স্পীডবোটটি দেখাশোনা করার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তাব দিলাম। মনির তাৎক্ষণিকভাবে রাজী হয়ে বোট থেকে আমাদের মালামাল নামাতে শুরু করলো। ঘাটের সন্নিকটে ওর বাড়ি, সুতরাং কাজটি সহজভাবে করতে পারবে বলে ও জানালো। আমি ড্রাইভারকে বললাম যে সে যেনো আগামী দুইদিন স্পীডবোট চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে মনিরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। আমরা রিক্সা নিয়ে অফিসের দিকে এগিয়ে গেলাম। মনির ড্রাইভারের সাথে স্পীডবোট বিষয়ে মনোযোগী হলো।

অফিসে গিয়ে মঈনউদ্দিনের দেখা পেলাম। অফিসটা গোছানো হয়েছে। নতুন চেয়ার টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র কেনা হয়েছে। মঈনউদ্দিনের একাগ্রতা ও কর্মতৎপরতা দেখে একটু আশ্চর্যই হলাম কারণ মাত্র দু সপ্তাহ পূর্বে তাঁকে এ সকল অফিস ফার্নিচারগুলো সংস্থানের জন্য বলা হয়েছিল। হাতিয়ায় ফার্নিচারের কোন দোকান ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে, এই সময়ে কাঠ সংগ্রহ ও মিস্ত্রী যোগাড় করা খুব একটা সহজসাধ্য ছিলনা। আমি মঈনউদ্দিনকে মঈন ভাই সম্বোধন করে বললাম যে এই কয়েকদিনের মধ্যেই আপনি সত্যিই অসাধ্য সাধন করে ফেলেছেন। তিনিও আমাকে ভাই সম্বোধন করে বললেন যে, আসবাবপত্রগুলো তৈরী করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছে কারণ কাঠ ও মিস্ত্রী দুটোরই প্রকট অভাব ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত কাজটা যে সমাধা হয়েছে সে জন্য আমি আনন্দিত।

আমি বললাম সময় এখন সংক্ষিপ্ত কারণ জাপানিজ মেডিকেল টিম আগামী মাসেই হাতিয়ায় আসছে, সুতরাং আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁদের অফিস, ক্লিনিক ও আবাসনের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে। মঈন ভাই আমার বক্তব্যের রেশ ধরে বললেন যে সকল আয়োজন আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্পীডবোট নিয়ে হাতিয়া থেকে চট্টগ্রাম গমন

কয়েকদিন পর ট্যাডি হাতিয়াতে ফিরে এলেন। ফিরে আসার পরদিনই তিনি জরুরি কাজে চট্টগ্রাম যাবেন বলে জানালেন। ঐ সময়ে নিয়মিত কোন জাহাজ না থাকায় চট্টগ্রাম যাওয়া সহজতর ছিল না। ট্যাডি বললেন যে স্পীডবোট নিয়েই

চট্টগ্রাম যেতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঈন ভাই, সালাউদিদন নানা এবং আমি ট্যাডির সহযোগী হলাম। ঢাকা থেকে আগত ফায়ার সার্ভিসের ড্রাইভারকে বোট চালনার দায়িত্ব দেয়া হলো। প্রয়োজনীয় জ্বালানী কয়েকটা কন্টেইনারে ভরে সেদিন সকাল দশটায় স্পীডবোট নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর মোহনা পেরিয়ে সাগরে গিয়ে পড়লাম। উন্মুক্ত নীল সমুদ্রের স্বচ্ছ পানির উপর দিয়ে দুরন্তগতিতে ছুটে চলেছে স্পীডবোট। একঘন্টারও কম সময়ের মধ্যেই আমরা সন্দীপের উপকূল স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। এরপর সন্দীপের পাড় ঘেঁসে আমরা প্রবলবেগে পূর্বদিকে এগিয়ে চললাম। আমি ড্রাইভারকে বোটের গতি কিছুটা কমিয়ে দিতে বললাম যাতে করে সাগরের বুকে ভেসে থাকা সন্দীপের অপরূপ দৃশ্যাবলী ভালভাবে দেখতে পারি।

আমি খুব উৎসাহ নিয়ে এই ভ্রমণটা উপভাগ করছিলাম এবং এর খুঁটিনাটি স্মরণ রাখার চেষ্টা করছিলাম। আরও ঘন্টাখানেক চলার পর আমরা সন্দীপ পেরিয়ে চট্টগ্রামের উপকূলরেখা দেখতে পেলাম। এরপর কিছুটা তরঙ্গসংকুল পানিতে ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। ড্রাইভার বললো যে আমরা কর্ণফুলী নদী ও সাগরের সংযোগস্থল অতিক্রম করছি। ওখানে অনেকগুলো জাহাজের অবস্থান দেখে বুঝলাম যে ওগুলো সাগর থেকে নদীতে ঢোকার অপেক্ষায় রয়েছে। কর্ণফুলী নদীতে অনেক জাহাজ, পরিবহণের বড় বড় বোট ও সাম্পান এদিক সেদিক ছড়িয়ে থাকায় আমাদের স্পীডবোট ধীর গতিতে চালাতে হচ্ছে। আমরা যখন চট্টগ্রাম সদরঘাটে পৌঁছলাম তখন দুপুর দুইটা বাজে। আমি হিসাব করে দেখলাম যে হাতিয়া থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছতে সাগরের উপর দিয়ে আমাদেরকে সাড়ে তিন ঘন্টা চলতে হয়েছে, আর বাকি সময়টা মূলত কর্ণফুলী নদীতে ব্যয় হয়েছে। স্পীডবোট থেকে নেমে আমরা হোটেল আগ্রাবাদে গিয়ে উঠলাম। হোটেলে যাওয়ার পর ট্যাডিকে দেখলাম প্রায় মধ্যবয়সী একজন বিদেশীর সাথে ঘনিষ্ট আলোচনায় ব্যতিব্যস্ত। রাতে ডিনারের সময় ট্যাডি ঐ বিদেশীর সাথে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন যে তিনি একজন জাপানিজ সাংবাদিক এবং আমাদের কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য আমাদের সাথে হাতিয়া যাবেন।

পরদিন সকাল দশটার পর সিদ্ধান্ত হলো যে আজই আমরা হাতিয়ায় ফিরে যাব। ড্রাইভারকে জ্বালানী সংগ্রহ করে প্রস্তুত থাকার জন্য বলা হলো। দুপুরের খাবার শেষ করে ঘাটে যেতে যেতে তিনটা বেজে গেল। ড্রাইভার স্পীডবোট সচল

করলো এবং জাপানিজ সাংবাদিকসহ আমরা হাতিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। যখন আমরা কর্ণফুলী ও সাগরের সংযোগস্থলে পৌঁছুলাম তখন হঠাৎ করেই একটি ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। ড্রাইভার ঐ ইঞ্জিনের কভার উন্মুক্ত করে দেখলেন যে একটি স্পার্কিং প্লাগ গরমে গলে গিয়ে কাজ করছে না বিধায় ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেছে। ষ্টক থেকে নতুন একটি প্লাগ বের করে প্রতিস্থাপন করতে করতে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হলো। মঈন ভাই বললেন যে এই অপরাহ্ন সময়ে রওনা না হয়ে আমরা কাল সকালে যাত্রা করতে পারি। সালাউদ্দিন নানা জোরালোভাবে মঈন ভাইয়ের প্রস্তাব সমর্থন করলেন কিন্তু আমি জোরগলায় বললাম যে চিন্তা করার কিছু নেই কারণ ঘন্টাখানেক চলার পরইতো আমরা সন্দীপের উপকূল পেয়ে যাব। আর সন্দীপ থেকে একঘন্টা চলার পর হাতিয়া উপকূল আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। হাতিয়া থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার সময় এই অভিজ্ঞতাটা আমি অর্জন করেছি। যাহোক শুধু আমার কথার উপর ভিত্তি করেই ট্যাডি যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ড্রাইভার পূর্ণ গতিতে বোটটি চালিয়ে দিলেন।

দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে আমাদের স্পীডবোট। এবার ড্রাইভার সমেত যাত্রী ছয়জন। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে একঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও সন্দীপ উপকূলের দেখা নেই। এভাবে চলতে চলতে পশ্চিম দিগন্তে রক্তিম আভা ছড়িয়ে সূর্য ডোবার উপক্রম হলো কিন্তু কোন কূলরেখা দৃষ্টিগোচর হলো না। আমি ড্রাইভারকে বললাম যে আমরাতো পশ্চিম দিকেই যাচ্ছি তবে দু ঘন্টা পার হবার পরও সন্দীপের উপকূল রেখা দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ড্রাইভার নিশ্চুপ থাকলো। এভাবে চলতে চলতে কিছুক্ষণ পর সূর্য অস্তমিত হলো। আজ আর সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য মনে কোন ছাপ ফেলতে পারলো না। আমি নিজেই একটা অজানা আশংকার মধ্যে নিমজ্জিত হলাম।

আবছা আলোতে তখনও বোট পূর্ণ গতিতেই চলছে। এভাবে চলতে চলতে রাত নেমে এলো। আকাশে তারার মিছিল। কারো মুখে কোন কথা নেই। আমি বোট থামাতে বললাম। বোট থেমে গেল। অসংখ্য তারার আবছা আলোতে পাঁচ সাত গজ দূর পর্যন্ত দেখা গেলেও এর পর নিকষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ট্যাডির সাথে আলোচনা করে বললাম যে সম্ভবত আমরা সোজা পশ্চিমে না গিয়ে কিছুটা দক্ষিণ পশ্চিমে সরে গেছি তাই কূলের কিনারা পাচ্ছি না। পশ্চিম আকাশে শুকতারা দেখিয়ে বললাম যে আমরা যদি সত্যি সত্যি দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে থাকি তবে উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর আমাদের চলতে হবে।

ট্যাডি আমার যুক্তি সমর্থন করলেন এবং ড্রাইভার বোটটি উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে চালাতে লাগলেন। আমি ড্রাইভারকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম যে এই পথে অনেক পরিবহণ নৌকা বা বড় বড় বোট চলাচল করে এবং তারা সাগরবক্ষেই নোঙর করে রাত কাটায় সুতরাং বোটের গতি কমিয়ে চালাতে হবে এবং কোন অবজেক্ট দেখামাত্রই বোটের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ড্রাইভার ট্যাঙ্কিতে পেট্রোল ভরে নিয়ে আমার কথামতো বোট চালাতে লাগল। এদিকে রাত বাড়তে থাকলো। মধ্যরাতের পর আবার বোট থামিয়ে ট্যাডি সবার সাথে আলোচনায় বসলো। এ অবস্থায় কি করা যায় তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সালাউদ্দিন রাগান্বিত হয়ে বললো যে সব দোষ হারুনের, বলা হলো যে বিকেল বেলাটা পরিহার করে সকালবেলায় যাত্রা করি কিন্তু হারুনের জন্য তা হলো না। এখন সাগরের মধ্যখানে পথ হরিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছি। এখানে হাঙরেরা ঘুরে বেড়ায়, টের পেলে স্পীডবোটসহ গিলে খেয়ে ফেলবে। ভয়ে সালাউদ্দিন নানার কম্পন ও ভয়ার্ত অভিব্যক্তি অন্যদেরকেও সংক্রমিত করে তুললো। পরিস্থিতিটাকে শান্ত করার জন্য আমি বললাম, সালাউদ্দিন নানা তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছ। আমরা পথ হারিয়ে ফেলাতে উপকূল রেখা দেখতে পাইনি এর মানে এই নয় যে আমরা পথের দিশা পাব না। বড়জোর রাতটা আমাদেরকে খোলা সমুদ্রে কাটাতে হবে, সকালে আলো ফুটলে কূলের দেখা অবশ্যই পাওয়া যাবে। আর এখানে হাঙর বা অন্য কোন সামুদ্রিক প্রাণীর উপস্থিতি থাকলেও ওরা আমাদেরকে আক্রমণ করবে না। আমার কথায় সবাই আশ্বস্ত হলেও সালাউদ্দিন নানা নিচের দিকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো। পশ্চিম দিক ঠিক রেখে বোট আবার চলতে লাগল।

বিষয়টি আমার কাছে রহস্যপূর্ণ বলে মনে হলো কারণ এতো দীর্ঘসময়ব্যাপী বোট চালনার পরও কেন কূলের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। যা হোক রাত তিনটার সময় বোটের গতির অনুকূলেই দূরে একটা বাতি দৃষ্টিগোচর হলো। আমরা সন্নিকটে গিয়ে দেখলাম মাছ ধরার নৌকা। নৌকার ছৈয়ের পাশে বিশেষ কায়দায় হারিকেন জাতীয় ল্যাম্প টানানো রয়েছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে জনৈক জেলে বললো যে আমাদের পেছনে কাওয়ার চর। আপনারা হাতিয়া ঘাট থেকে কমপক্ষে ৩০ মাইল দক্ষিণে রয়েছেন। সামনে এগিয়ে গেলেই হাতিয়া দ্বীপের উপকূল পাবেন এবং ঐ উপকূলরেখা বরাবর এগিয়ে গেলে হাতিয়ার মূল ঘাট পেয়ে যাবেন। আমরা আশ্বস্ত হয়ে সামনে পূর্ণ গতিতে এগুনোর সময় হঠাৎ করে বোটটা কিছুর সাথে আটকে গিয়ে প্রচণ্ড একটা টান খেয়ে স্থির হয়ে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। ঐ সময় পূর্ণভাটা

থাকায় পানি প্রচণ্ড বেগে নিচের দিকে নামছিল। বোটে থাকা টর্চলাইট দিয়ে ভাল করে দেখে বোঝা গেল যে মাছ ধরার জালের সাথে বোটের প্রপেলার জড়িয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে জাল ছাড়িয়ে প্রপেলার মুক্ত করতে না পারলে বোট চালনার আর কোন উপায় নেই, আর জাল ছাড়াতে হলে পানিতে নামতে হবে এবং প্রয়োজনে ডুব দিয়ে জাল ছাড়াতে হবে। রাতের আঁধারে বোটের কেউ এই কাজটি করতে রাজী হলো না। ড্রাইভারও তাঁর অক্ষমতার কথা জানালো। অবস্থাদৃষ্টে আমি নিশ্চিত হলাম যে এই দুরূহ কাজটি আমাকেই সম্পাদন করতে হবে। এই সুযোগে সালাউদ্দিন নানা দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বললো যে হারুনের প্ররোচনায় বিকেলবেলায় যাত্রা করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম সুতরাং জাল থেকে প্রপেলার অবমুক্ত করার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। অনেকটা দৃঢ়তা নিয়ে আমি উঠে বোটের পেছনে গিয়ে ষ্টিয়ারিং শ্যাফট খুলে ইঞ্জিনটা টেনে তোলার চেষ্টা করলাম কিন্তু জালে আটকে যাওয়ায় তুলতে পারলাম না। মঈন ভাই এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করায় ইঞ্জিনটা টেনে উপরে তুলে লক করে দিলাম। এরপর ইঞ্জিনের উপর ভর করে ৪৫ ডিগ্রি ঝুঁকে গিয়ে জাল ছাড়াতে থাকলাম। যেভাবে জাল প্রপেলারে পেঁচিয়ে গেছে তা হাত দিয়ে খোলা সম্ভবপর নয় বিধায় ট্যাডির কাছ থেকে সুইস নাইফ নিয়ে জাল কাটতে থাকলাম। এভাবে প্রপেলার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জাল বের করে কেটে আনতে ঘন্টাখানেক সময় লাগলো। কিন্তু সর্বশেষ জালটুকু হাতের নাগালে না পাওয়ায় পানিতে নামার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইঞ্জিনটাকে কিছুটা পানির দিকে অবনমিত করে প্রপেলারটা আঁকড়ে ধরে পানিতে নামলাম। প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে ভাসতে থাকলাম। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। মনে মনে ভাবলাম যদি এই অবস্থায় কোনক্রমে হাত ফসকে যায় তবে স্রোতের আবর্তে একটানে নিমিষের মধ্যে ভেসে যাব এবং অচল এই বোট দিয়ে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রপেলার থেকে অবশিষ্ট জালটুকু বের করতে সক্ষম হলাম এবং মঈন ভাই ও ড্রাইভারের সহায়তায় বোটে উঠে পড়লাম।

ট্যাডি ও জাপানিজ সাংবাদিক উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল এবং দেখা গেল যে প্রচণ্ড গতিতে আচমকা টান খেয়ে বোট থেমে যাবার ফলে দুটো ইঞ্জিন ও ষ্টিয়ারিংয়ের মধ্যে সংযোগকারী শ্যাফটটি বাঁকা হয়ে গেছে ফলে সামনে বসে ষ্টিয়ারিং দিয়ে ইঞ্জিন নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে সমাধান একটাই এবং তা হচ্ছে পেছনে বসে ইঞ্জিনদুটো হাত দিয়ে ধরে রেখে ডাইনে বায়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিক ঠিক রাখা। এখানেও সেই একই ফরমুলা

কাজ করলো অর্থাৎ আমাকেই ইঞ্জিনদুটো ধরে রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে। ড্রাইভার সামনে বসে গতি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং আমি পেছনে বসে দিক নিয়ন্ত্রণ করবো। সে এক অসম্ভব রকমের অস্বস্তিকর অবস্থা, কিছুতেই ইঞ্জিনদুটো ধরে রাখা যাচ্ছে না। গতি একটু বাড়লেই পুরো ইঞ্জিন ঘুরে যাচ্ছে। এরপর সিদ্ধান্ত হলো যে গতি না বাড়িয়ে খুবই স্বল্পগতিতে আমরা এগিয়ে যাব। এই অবর্ণনীয় কষ্টকর পরিস্থিতিতে শুধু মঈন ভাই আমাকে সহায়তা করলেন। কোন কোন সময় আমাদের চারটি হাত একত্রে ধরে ইঞ্জিনদুটো নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছিল। এভাবে চলতে চলতে আমরা যখন হাতিয়া ঘাটে পৌঁছুলাম তখন পূর্ব দিগন্ত আলোর রেখা ফুঠে উঠেছে। আমি ঘাটে নেমে মাটিতে বসে পড়লাম। সেসময় সূর্যের আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। ট্যাডি আমার পাশে মাটিতে বসে পড়লো এবং বললো, 'ফাইনালি উই হেভ মেইড ইট বাট ক্রেডিট ইজ ইওরস। ইউ হেভ ডেমনস্ট্রেটেড এ গ্রেট লিডারশীপ। থ্যাঙ্ক ইউ হারুন'। আমিও ওকে স্বাগত জানিয়ে রিক্সা নিয়ে অফিসে ফিরলাম।

এই ঘটনার মাত্র দুইদিন পর আবার স্পীডবোট নিয়ে খুলনা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। ট্যাডি, জাপানিজ সাংবাদিক, আমি এবং ড্রাইভারসহ মোট চারজন হাতিয়া থেকে প্রত্যুষে রওয়ানা হয়ে বিকেল বেলায় খুলনায় পৌঁছুলাম। খুলনায় একটা হোটেলে রাত্রিযাপন শেষে পরদিন প্রত্যুষে রওয়ানা হয়ে গোধূলিবেলায় হাতিয়ায় পৌঁছলাম। জাপানিজ সাংবাদিককে খুলনায় পৌঁছে দেয়ার জন্যই মূলত আমরা খুলনা গিয়েছিলাম। যুদ্ধোত্তর ঐ সময়ে জাপানিজ সাংবাদিককে চট্টগ্রাম থেকে উঠিয়ে স্পীডবোটে করে খুলনায় পৌঁছে দেয়াটা অত্যন্ত জরুরি ছিল বলে ট্যাডি আমাকে জানালো। তবে জরুরি পরিস্থিতিটা কি কারণে সৃষ্টি হয়েছিল সেই অনুসন্ধিৎসা থাকলেও তা নিয়ে পরবর্তী সময়ে আমি ট্যাডিকে কোন প্রশ্ন করিনি।

স্পীডবোটে চেপে দুটি লম্বা সফর সম্পন্ন করার পর এ সংক্রান্ত কিছু বিষয় আমাকে ভাবনার মধ্যে ফেলে দিল। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আরম্ভ করলাম। এর মধ্যে একটি হলো যে হাতিয়া থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে যেটুকু সময়ের মধ্যে আমরা সন্দীপ ও তারপর চট্টগ্রামের কূলরেখা দেখতে পেয়েছিলাম ফেরার সময় কেন সেভাবে দেখতে পেলাম না? এই প্রশ্নের যে উত্তর খুঁজে বের করলাম তা হলো যে শীতকালে পূর্বাহ্নের দৃষ্টিসীমা ও অপরাহ্নের দৃষ্টিসীমার মধ্যে পার্থক্য তৈরী হয়। এই পার্থক্যের কারণ হলো কুয়াশার আস্তরণ। বিশেষত শীতকালে দুপুরের পর থেকেই কুয়াশা পড়তে থাকে এবং এর প্রভাবে দিগন্তরেখায় দৃশ্যমান

বস্তু কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায় এবং শুধুমাত্র এই কারণেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সন্দীপের উপকূলরেখা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং আমরা একটা চরম বিপদের মধ্যে নিপতিত হয়েছিলাম। এটা আমার জন্য একটা বড়শিক্ষা ছিল। হাতিয়া দ্বীপের আশেপাশে অবস্থিত সাহেবানীর চর, মৌলভীর চর, ঢাল চর, নিঝুম দ্বীপ ইত্যাদি জায়গায় যেতে হরহামেশাই আমাকে স্পীডবোট ব্যবহার করতে হতো। এ ছাড়াও হেগস্ট্রমের নির্দেশমতো বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য আমাকে চর জব্বার, রামগতি, মনপুরা, তজুমদ্দিন, চরফ্যাসন ইত্যাদি জায়গায় মাঝে মধ্যেই স্পীডবোট নিয়ে সফর করতে হয়েছে। কিন্তু সাগর কিংবা সাগরের মোহনায় বিকেলবেলায় স্পীডবোট চালনার যে ঝুঁকির সন্ধান আমি পেয়েছিলাম তা কখনো ভুলিনি।

হাতিয়ায় রেড ক্রসের কার্যক্রম

হাতিয়ায় ত্রাণ কার্যক্রম পূর্ণমাত্রায় চলছে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্ধে ডঃ মায়েদার নেতৃত্বে জাপানিজ মেডিকেল টিম হাতিয়াতে আগমন করলো। সিনিয়র নার্স ফুজুসামা এবং আরো দুজন নার্সসহ মোট চারজনের মেডিকেল টিম হাতিয়াতে তাঁদের কাজ শুরু করলো। ১৯৭০ এর ঘূর্ণিঝড় এবং তৎপরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের পর হাতিয়া দ্বীপে উদ্বুদ্ধ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য জাপানিজ রেড ক্রসের মেডিকেল টিম হাতিয়া থানা সদর ছাড়াও বিভিন্ন ইউনিয়নে তাঁদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করলো।



হাতিয়ায় চিকিৎসাসেবা দানকারী জাপানিজ মেডিকেল টিমের ডাক্তার, নার্স ও কর্মিগণ

জাপানিজ রেড ক্রসের মেডিকেল টিম কাজ শুরু করার কিছুদিন পর মিঃ তাদাতেরু কোনোয়েদে হাতিয়ায় আগমন করেন। আসলে জাপান রাজ পরিবারের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় তিনি প্রিন্স কনোয়ে নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।



প্রিন্স কনোয়ে হাতিয়ার একটি স্কুল পরিদর্শন করছেন

হাতিয়াতে কাজ করার জন্য প্রিন্স কনোয়ে একটি নতুন ঝকঝকে মিৎসুবিসি জীপ হাতিয়াতে নিয়ে এসেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে প্রিন্স কনোয়ে পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অব রেড ক্রস এ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ এর প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন।

হাতিয়া দ্বীপে আমার জন্য একটি হোণ্ডা-৯০ মোটর সাইকেল প্রদান করা হয়েছিল। হাতিয়া দ্বীপে চলাচলের জন্য মোটর সাইকেল আদর্শ বাহন। সবকটি ইউনিয়নের সকল রাস্তাই কাঁচা ছিল তবে বৃষ্টিবাদলের পর মোটর সাইকেল চালানো কঠিন হয়ে পড়তো।

এর মধ্যে একদিন সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত রেডিও ইঞ্জিনিয়ার রবিউল ইসলাম ওয়্যারলেস স্থাপনের জন্য রেডিও সরঞ্জামাদি নিয়ে ঢাকা থেকে হাতিয়ায় আগমন করলো। হাতিয়া প্রশাসন থেকে বরাদ্দ পাওয়া তিনটি ভবনের মধ্যে একটিতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির অফিস হিসাবে নির্ধারিত ছিল এবং ঐ অফিসের ছাদে এ্যান্টিনা টানানো হলো এবং দোতালার একটি কক্ষে এইচ এফ ওয়্যারলেস সেট স্থাপন করা হলো। রেডিও সেটটি অন কারার পর ঢাকার সাথে কথোপকথন শুরু হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই হেগস্ট্রম আমার সাথে কথা বলতে চাইলেন।

ঐ মুহূর্তে অসম্ভব এক উত্তেজনা নিয়ে জীবনে প্রথমবারের মতো ওয়্যারলেসে মাধ্যমে কথা বললাম। হেগস্ট্রমের প্রশ্নের জবাবে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললাম যে হাতিয়াতে সবকিছুই পরিকল্পনা মাফিক চলছে। আগামীকাল হেলিকপ্টারযোগে সকাল দশটায় তিনি হাতিয়াতে আসবেন বলে জানালেন। হেলিকপ্টার অবতরণ স্থানে একটি রেড ক্রসের পতাকা স্থাপন এবং প্রশাসনের সাথে একটি মিটিংয়ের আয়োজন করার জন্য হেগস্ট্রম আমাকে নির্দেশ দিলেন।

এরপর রেডিও ইঞ্জিনিয়ার রবিউল ওয়্যারলেস রেডিও চালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে ঐদিন রাত পর্যন্ত সময় নিয়ে আমাকে হাতেকলমে সব শিখিয়ে দিলেন। আমিও মনোযোগ সহকারে সব জেনে নিলাম। সেদিন হাতিয়া রেড ক্রস অফিসে ওয়্যারলেস সেট স্থাপিত হওয়ায় আমি এতটাই উৎফুল্ল হয়েছিলাম যে ঐ দিন রাতে উত্তেজনার কারণে ঘুমুতে পারিনি।

পরদিন সকালে আমাদের অফিস বিল্ডিংয়ে ওয়্যারলেস এ্যান্টিনা থাকায় পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদে রেড ক্রসের একটি পতাকা টানিয়ে দিলাম। ছাদের যে পরিসর তাতে একটি হেলিকপ্টার নামার জন্য যথেষ্ট। অপেক্ষার পালা শেষ করে ঠিক দশটার সময় রেড ক্রস প্রতীক অংকিত সাদা ছোট্ট হেলিকপ্টারটি সোজা উড়ে এসে অফিসের উপর দিয়ে কয়েকটি চক্কর দিয়ে অবশেষে ছাদে অবতরণ করলো। হেলিকপ্টার দেখতে অফিসের চারিদিকে অনেক লোক সমাগম হলো। আমরা ছাদে উঠে হেগস্ট্রমকে নিচে নিয়ে এলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভীড় ঠেলে পাশেই অবস্থিত সার্কেল অফিসার এর অফিসে গেলাম। সার্কেল অফিসারের অফিসে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমি হেগস্ট্রমকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

এরপর হেগস্ট্রম আমাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, হাতিয়াতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু করার জন্য হারুন আল রশিদ হাতিয়াতে নিয়োজিত রয়েছেন। বিষয়টি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা বিগত ঘূর্ণিঝড় আমাদেরকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং আমরা কেউ চাইবো না যে স্বাধীন বাংলাদেশে আরেকটি ঘূর্ণিঝড় এসে আবার প্রাণহানী ঘটিয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত করুক। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম যেহেতু গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু হবে সেহেতু গ্রামের মেম্বার চেয়ারম্যান ও স্থানীয় পর্যায়ের লীডারগণ এই কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং এর

বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে আমরা আশা করি। কার্যক্রম শুরুর প্রথম ধাপেই স্থানীয় জনগণকে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে তাঁদের অংশগ্রহণের সূচনা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদেরকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পাশাপাশি থানা প্রশাসন থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট সবাই আন্তরিকতা নিয়ে সহযোগিতা করবেন এবং এ বিষয়ে আমি সার্কেল অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সার্কেল অফিসার মহোদয় বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বললেন, বিষয়টি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ৭০-এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময় আমি হাতিয়াতে না থাকলেও পরবর্তী সময়ে যে ধ্বংসলীলা আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা সত্যিই হৃদয়বিদারক। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সহযোগিতায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। অন্যান্য সবার মতো আমিও নিশ্চিত যে এই কর্মসূচির মাধ্যমে উপকূলীয় মানুষ ঘূর্ণিঝড়ের প্রাক্কালে সতর্ক সংকেত পাবে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে তাঁদের জান ও মাল রক্ষা করতে পারবে। এই মহতী উদ্যোগটি বাস্তবায়নে হাতিয়া থানা প্রশাসন সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। আমি উপস্থিত থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে যার যার অবস্থান থেকে অবদান রাখবেন বলে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এর পর নানাবিধ আলোচনার শেষে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও বাংলাদেশ রেড ক্রসের পত্র ও বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি সার্কেল অফিসারকে প্রদান করা হবে জানিয়ে হেগস্ট্রম তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন।

থানা প্রশাসনের সাথে মিটিংয়ের পর হেগস্ট্রম জাপানিজ রেড ক্রসের মেডিকেল টিমের চিকিৎসা কার্যক্রম অবলোকন করলেন। তিনি প্রিন্স কনোয়ে এবং ট্যাডির সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা শেষ করে আমার অফিস কক্ষে গিয়ে বসলেন এবং আমাকে বললেন, সার্কেল অফিসারের সাথে আজকের মিটিং অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। এখন যে কাজটি তোমাকে করতে হবে তা হলো প্রতিটি ইউনিয়ন সফর করে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের সাথে প্রস্তুতি বিষয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ নিবিড় আলোচনা করবে এবং এর বিভিন্ন দিক তাঁদের সামনে তুলে ধরবে। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রধান হলেন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান।

তাঁর অনুমোদন ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন কাজই তুমি করতে পারবে না। আমাদের প্রস্তুতি কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণটাই জননির্ভর হওয়ায় জনগণের আস্থা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি এবং তা করতে হলে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের সহযোগিতার বিষয়টি তোমাকে সর্বাগ্রে ভাবতে হবে। কয়েকদিন পর আমি আবার হাতিয়াতে আসবো এবং ইউনিয়ন চেয়াম্যানদের সাথে তোমার বন্ধুত্ব কতটুকু হয়েছে সে কথা শুনবো। বিদায়কালে তিনি নোয়াখালীর এস ডি ও মহোদয়ের সাথে মিটিং করে বিকেলের মধ্যেই ঢাকায় ফিরবেন বলে জানালেন।

হেগস্ট্রমের নির্দেশ মোতাবেক আমি ইউনয়ন পর্যায়ে সফর শুরু করলাম। এই সময়ে দু তিনজন স্থানীয় তরুণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমার সাথে কাজ করার জন্য এগিয়ে এলো। এদেরকে নিয়ে চললো আমার ইউনিয়ন পর্যায়ের সফর ও মিটিং। ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণ প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রমকে গুরুত্বপূর্ণ বলে অবহিত করলেন এবং এটি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে অঙ্গীকার করলেন।

প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিট গঠনকল্পে প্রস্তাবিত ইউনিটের চৌহদ্দি নির্ণয় করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারদের নিয়ে পৃথক পৃথক মিটিং করে একটি খসড়া ম্যাপ তৈরী করে ফেললাম। স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের প্রয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষিত, কর্মঠ ও স্বাস্থ্যবান যুবকদের তালিকা প্রণয়নের জন্য ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদেরকে অনুরোধ করলাম। এছাড়াও হাতিয়ার বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের সাথে মিটিং করে এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য তাঁদের সহযোগিতা কামনা করলাম। কোন কোন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদেরকে জমায়েত করে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রমের ধারণা নিয়ে কথা বলার প্রয়াস পেয়েছি, যদিও বেশীরভাগ স্কুল তখনো ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারেনি। এছাড়াও টি ষ্টল আড্ডার মাধ্যমে এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে একটা স্পষ্ট ধারণা প্রচারে সফলতা পেয়েছি।

একপক্ষকাল সময়ব্যাপী পরিচালিত এই নিবিড় আলোচনা থেকে আমি যা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারলাম তা হলো, এই এলাকায় দীর্ঘকাল যাবৎ ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হলেও ১৯৭০ এর ১২ নভেম্বর তারিখের ঝড়টি ছিল নজিরবিহীন। বেঁচে যাওয়া অনেকেই বলেছেন যে তারা এটিকে রোজ কেয়ামত বলে মনে করেছিলেন এবং বাঁচার আশা ত্যাগ করেছিলেন। রাতের অন্ধকারে ঘটেছিল এই মহা-প্রলয়।

সেদিন পূর্ণিমার রাত থাকা সত্ত্বেও চাঁদের আলো ঘন মেঘে ঢাকা ছিল। প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলা বাতাসের সাথে পাহাড় সমান উঁচু হয়ে সাগরের পানি বসতির উপর আছড়ে পড়ল। নিমিষের মধ্যে ঘরবাড়ি সব ডুবে গেল এবং রাতের আঁধারে অগণিত অসহায় মানুষের সলিল সমাধি ঘটল। অনাকাঙ্খিত এই মৃত্যুর মিছিলে মহিলা, শিশু ও বয়স্ক মানুষেরাই ছিল সর্বাধিক। যারা জলোচ্ছ্বাসের পানিতে নিমজ্জিত হয়েও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল তাদের সিংহভাগই ছিল যুবক শ্রেণী ও শক্ত সমর্থ মানুষ। আকাশের অবস্থাদৃষ্টে একটা ঝড়ের আলামত সম্পর্কে অনেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন ঠিকই তবে এটা যে এমন নির্মম ও বিধ্বংসী হবে তা বুঝতে পারেননি। রেডিওর খবরে মহাবিপদ সংকেত প্রচার করা হলেও তা উপকূলীয় জনমানুষের নিকট পৌঁছুতে পারেনি। এর একটা বড় কারণ ছিল যে মানুষের কাছে ট্রানজিষ্টার রেডিও ছিল না। যাদের বাড়িতে রেডিও ছিল তারাও এটাকে গতানুগতিক একটা ঝড় হিসাবে ভেবেছিল। গ্রামাঞ্চলে সতর্ক সংকেত প্রচারের জন্য সরকারী কোন প্রকার ব্যবস্থা ছিল না। এ ছাড়াও হাতিয়ার কোন ইউনিয়নে কোন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ছিল না।

চায়ের ষ্টলে বসে আলোচনায় একজনতো বলেই বসল যে দেশের মানুষকে বাঁচানোর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। এতোদিন পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন নিরাপত্তা পাইনি তবে এবার বাংলাদেশ রাষ্ট্রে আবার এমনটি ঘটুক আমরা তা চাইনা। সদ্য স্বাধীন দেশে অনেক অগ্রাধকার রয়েছে কিন্তু দুর্যোগের কবল থেকে উপকূলবাসীকে বাঁচানোর বিষয়টিও অগ্রাধিকারের বাইরে রাখা যাবে না। চলমান কথার রেশ ধরে আরেকজন বললেন যে ঘূর্ণিঝড় শুধুমাত্র বাংলাদেশেই হয় এমনটা নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও একই ধরনের ঝড় বয়ে যায় কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর সংখ্যা সর্বোচ্চ দুই অথবা তিন সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েও আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

এ কথাগুলো আমার কাছে নতুন না হলেও এর গুরুত্ব নিয়ে ভাবার অবকাশ রয়েছে বৈকি। পক্ষকালব্যাপী এই আলাপ আলোচনার একটা সংক্ষিপ্তসার তৈরী করে নির্দিষ্ট করে রাখলাম যা পরবর্তীতে হেগস্ট্রম হাতিয়াতে আসলে তাঁর সাথে আলোচনা করব বলে।

জাপানিজ মেডিকেল টিম ও ট্যাডিকে আমি আর আগের মতো সময় দিতে পারছি না। তবে চলাফেরা ও খাওয়া-দাওয়া একসাথেই চলছিল। সন্ধ্যাবেলা ডিনারের

টেবিলে আলোচনায় ডঃ মায়েদা তাঁর তৎপরতার কথা বলতেন এবং প্রিন্স কনোয়ে ও ট্যাডি তা নিয়ে আলোচনা করতেন ঠিক তেমনি আমার কর্মকাণ্ড নিয়েও একই ধরনের আলোচনা হতো। এ সকল আলোচনা আমার কাছে সবসময়ই ফলপ্রসু বলে মনে হয়েছে।

হাতিয়াতে সদ্য স্থাপিত ওয়্যারলেস সেট চালনার জন্য রেডিও অপারেটর হিসাবে সামসুদ তিবরীজ নামে একজন তরুণকে নিয়োগ প্রদান করা হলো। একদিন তিবরীজ জানালো যে আগামীকাল দুপুর নাগাদ হেগস্ট্রম হাতিয়ায় আসবেন এবং আমি যেন ঐ সময়ে অফিসে উপস্থিত থাকি। পরদিন দুপুরের পূর্বেই হেগস্ট্রম হেলিকপ্টারে চেপে হাতিয়ায় এলেন। তাঁর সাথে অল্পবয়সী একজন ফুটফুটে তরুণ হেলিকপ্টার থেকে নেমে অফিসে গিয়ে বসল।

আমার অনুসন্ধিৎসা প্রশমিত করে হেগস্ট্রম বললেন, এ হচ্ছে আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান জোয়াকিম। আমি জোয়াকিমকে স্বাগত জানিয়ে আমার নাম বললাম।

হেগস্ট্রম আমাকে বললেন, জোয়াকিম কিছুদিন হাতিয়াতে তোমার তত্ত্বাবধানে থাকবে, তুমি ওকে দেখেশুনে রাখবে। জোয়াকিম অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির সুতরাং ওকে চোখের আড়াল করবে না। আমি হেগস্ট্রমকে আশ্বস্ত করে বললাম যে হাতিয়াতে জোয়াকিম ভাল থাকবে, চিন্তার কোন কারণ নেই।

এরপর দাপ্তরিক কাজকর্ম নিয়ে হেগস্ট্রমের সাথে কথাবার্তা হলো। আমি বিগত পক্ষকালব্যাপী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, স্কুলের শিক্ষক ও টি ষ্টলে আলোচনার সার সংক্ষেপ হেগস্ট্রমকে জানালাম। তিনি আমার এই ইউনিয়ন ড্রাইভের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এর গুরুত্ব ও সুদূরপ্রসারী কি কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা বুঝিয়ে বললেন। এই কাজটি সফলভাবে করার জন্য তিনি আমাকে কয়েকবার ধন্যবাদ জানালেন। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা প্রণয়ন এবং প্রস্তাবিত ইউনিটগুলোর গঠন ও চৌহদ্দি নির্ণয় সংক্রান্ত ম্যাপ দেখে অতিশয় খুশি হয়ে হেগষ্টম বললেন যে থানা পর্যায়ে কাজ করার জন্য বেশ কয়েকজন ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিয়োগ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। কয়েকদিন যাবত হেলিকপ্টারে করে তাঁদেরকে থানায় থানায় পৌঁছে দেয়ার কাজ চলছে। আজকেও ভোলার চরফ্যাসনে শহিদুল আযমকে নামিয়ে আমরা হাতিয়ায় তোমার এখানে এলাম। থানা কর্মকর্তাদের কাজের তদারকি করার জন্য মাঝে মাঝে আমার সাথে তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব, সেক্ষেত্রে তোমার অভিজ্ঞতা তুমি তাঁদেরকে বলতে

পারবে। এখন যে কাজটা তোমাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে তা হলো ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রস্তাবিত তালিকা যাচাই বাছাই করা এবং কর্মঠ, মানবতার সেবায় আগ্রহী ও নিয়মানুবর্তীতায় বিশ্বাসী যুবকদেরকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে মনোনীত করা।



মিঃ হেগস্ট্রম, জনাব সাইদুর রহমান, জনাব এমদাদ হোসেন, জনাব হারুন আল রশিদ ও ১৯৭২ সালে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত সিপিপি-র কর্মকর্তাবৃন্দ

এ প্রসঙ্গে আমি বললাম, যেহেতু বিষয়টি সংবেদনশীল সেহেতু প্রাথমিক সভাগুলোতে আমি ইউনিয়ন চেয়াম্যানদেরকে বিশেষভাবে অবহিত করছি যে স্বেচ্ছাসেবকদের চূড়ান্ত মনোনয়ন দাপ্তরিক নিয়মকানুন অনুযায়ী হবে এবং এ ক্ষেত্রে তালিকাভূক্ত কোন প্রার্থী স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে মনোনীত নাও হতে পারেন। সুতরাং এ বিষয়ে যে কোনপ্রকার আপোষের সুযোগ নাই তা সকল ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণ অবগত আছেন।

আমার সাথে আলাপ আলোচনায় খুশি হয়ে হেগস্ট্রম আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি রামগতি হয়ে ঢাকায় ফিরবেন বলে জানালেন। জোয়াকিমকে ভালভাবে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়ে হেগস্ট্রম হেলিকপ্টারে উঠে প্রস্থান করলেন।

ঐ সময়ে হাতিয়াতে রেড ক্রস সম্পাদিত নানাবিধ কার্যক্রম থেকে আমি ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু করার প্রতি মনোযোগী হলাম। হাতিয়া দ্বীপের সর্বত্রই আমাকে কাজ করতে হবে বিধায় পুরো দ্বীপটার

চারিদিকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও বসতি দেখার জন্য মোটর সাইকেল নিয়ে বের হলাম। একসপ্তাহ সময় এই কাজের জন্য বরাদ্দ করলাম।

হাতিয়া দ্বীপটি লম্বায় প্রায় ৫০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ গড়ে ১২ কিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার। বিগত ৭০ এর ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। হাতিয়াতে ইউনিয়ন দশটি। সর্ব উত্তরে অবস্থিত ইউনিয়নের নাম হরনী, হাতিয়া দ্বীপের প্রবেশ পথ এবং সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত ইউনিয়নের নাম জাহাজমারা যেখানে বিখ্যাত নিঝুম দ্বীপের অবস্থান। হাতিয়া দ্বীপটি উপকূলীয় বেঁড়ীবাঁধের বেষ্টনীর মধ্যে থাকলেও বিগত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে অনেক এলাকাতেই তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা মেরামত করা অতীব জরুরি বলে বিবেচিত হলো। অনেক এলাকাতেই বেঁড়ীবাঁধের বাইরে জনবসতি দেখলাম যা বিগত ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পরও পুনরায় গড়ে উঠেছে।

এই দ্বীপটির চরিদিক জুড়ে বেশ কয়েকটি চরের অবস্থান রয়েছে, যেমন মৌলভীর চর, সাহেবানীর চর, ঢাল চর, চর মুক্তারিয়া, চর উছমান ইত্যাদি। আবার এর মধ্যে ঢাল চরের আধিপত্য নিয়ে হাতিয়া ও মনপুরার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে বলে জানতে পারলাম।

এ সকল চরে মানুষের স্থায়ী বসতি না থাকলেও ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষের চারণক্ষেত্র হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। তবে নিঝুম দ্বীপের অবস্থা দেখে মনে হলো যে এখানে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠতে বেশীদিন সময় লাগবে না। এভাবে ঘোরাঘুরি করে হাতিয়ার দ্বীপটার অবস্থানগত একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমার মানসপটে এঁকে নিলাম।

কাজের সুবাদে হাতিয়া সদরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আমার সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে একজন ছিলেন হাতিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযুদ্ধের কমাণ্ডার মোঃ রফিকুল আলমের পিতা এ্যাডভোকেট ফসিউল আলম। তিনি মাঝে মধ্যেই আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে চা পানের আমন্ত্রণ জানাতেন। ঐ চা এমনই অনবদ্য ও সুস্বাদু ছিল যে প্রিন্স কনোয়ে ও ট্যাডিসহ পুরো জাপানিজ টিম ঐ চায়ের দারুণ ভক্তে পরিণত হয়েছিল।

একদিন এ্যাডভোকেট ফসিউল আলম আমাকে বললেন, আমার ছেলে রফিক মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে এজন্য বাবা হিসাবে আমি খুবই গর্বিত।

যুদ্ধোত্তর বর্তমান সময়েও মানুষের জন্য সে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে সে কথাও সত্যি তবে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তিত। আপনারা মানব সেবামূলক যে সকল কাজ করেন রফিক তা পছন্দ করে এবং আপনাদের কাজের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। আপনারা যদি মনে করেন যে রফিক মানবসেবামূলক কাজের উপযুক্ত তবে তাঁকে আপনাদের কাজে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এ্যাডভোকেট সাহেবের প্রস্তাবটি তাৎক্ষণিকভাবে সমর্থন করে বললাম, রফিক যদি আমাদের সাথে কাজ করতে আগ্রহী হয় তবে সেটাতো আনন্দের কথা, ওকে রেড ক্রস অফিসে যেতে বলবেন। এ বিষয়ে আমার চেষ্টার কোন ক্রুটি থাকবে না।



অফিসে ফেরার সময় মনে মনে ভাবলাম যে রফিকের মতো একজন কর্মী আমাদের সাথে থাকলে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন আমরা দ্রুততর সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারবো। এ ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে সৃষ্ট নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য রফিকের চেয়ে উপযুক্ত হাতিয়াতে আর কেউ আছে বলে মনে হলো না।

এ্যাডভোকেট সাহেবের প্রস্তাবটি আমি লোভনীয় একটি সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করলাম। এই ঘটনার দু তিন দিন পর রফিকুল আলম আমাদের অফিসে এলেন। আমি তাঁর সাথে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম সংক্রান্ত খুঁটিনাটি আলাপ আলোচনা করলাম। তিনি আপাতত সপ্তাহে তিন দিন আমাকে সময় দেবেন বলে জানালেন। খুশি হলাম এই ভেবে যে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক বৈচিত্রপূর্ণ কর্মকাণ্ড সম্পাদনে আমি একজন যোগ্য সহকারী পেয়ে গেলাম।

হাতিয়া দ্বীপে আমার জনসংযোগ কার্যক্রম জোরেশোরে চালাতে থাকলাম। এই সময়ে হাতিয়াতে রেড ক্রসের ত্রাণ বিতরণ, জাপানিজ রেড ক্রস টীমের স্বাস্থ্য কার্যক্রম, বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে রেড ক্রসের সহায়তা প্রদান, ঘূর্ণিঝড়

প্রস্তুতি কার্যক্রম ইত্যাদি একসাথে বাস্তবায়িত হচ্ছিল বিধায় রেড ক্রসের ভাবমূর্তি পুরোটা দ্বীপ জুড়েই দারুণভাবে প্রসারিত হয়েছিল। এমন একটা পরিবেশের মধ্যে আমি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ওয়ার্ডভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করলাম। অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী সকল প্রার্থীদেরকে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের উপস্থিতিতে প্রাথমিক সভা অনুষ্ঠান করলাম।

এই সভায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা, মনোনয়ন প্রাপ্তির যোগ্যতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিষদভাবে জানানো হলো। স্বেচ্ছাসেবক কাকে বলে, স্বেচ্ছাসেবকের সংজ্ঞা কি এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম যে সর্বপ্রকার আর্থিক সুবিধা বিবর্জিত তা বিষদভাবে বলার পর যারা এই সকল শর্তাদি মেনে স্বেচ্ছাসেবক হতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে নিয়ে শুরু হলো দ্বিতীয় ধাপের কার্যক্রম। গ্রাম পর্যায়ে গিয়ে তালিকাভূক্ত প্রার্থীদের খোঁজ-খবর নেওয়ার পর ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সাথে সমন্বয় রেখে তালিকা পুনর্বিন্যাস করা হলো। যারা তালিকভূক্ত হতে পারেন নাই এমন অনেক যুবক স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য সরাসরি হাতিয়া অফিসে এসে আমাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করলো। আমরা তাঁদেরকে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের সাথে যোগাযোগের জন্য উপদেশ দিলাম।

ঐ সময়ে এই বিষয়টি আমাকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল যে কেন মানুষ কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা নাই জেনেও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে চায়? আলাপ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখতে পেলাম যে বিষয়টি সিংহভাগই মনস্তাত্ত্বিক। বিগত ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় প্রতিটি পরিবারের কেউ না কেউ প্রাণ হারিয়েছেন। সেই দুঃসহ বেদনা থেকে জন্ম নেওয়া দুরন্ত এক প্রেরণা তাঁদেরকে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। আবার যখন ঝড় আসবে তখন তাঁদের আপনজনের মতো আর যেন কেউ প্রাণ না হারায় সেই অভিলাষটুকু প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে নিভৃতে লালিত হচ্ছে তা আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম। অনেকেই চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছেন, আপনারা যদি বিগত ঝড়ের পূর্বে এই কার্যক্রমটি শুরু করতে পারতেন তবে হয়তোবা আমার প্রিয় জন্মদাত্রী, আমার সন্তান, আমার প্রিয়জনকে এভাবে হারাতে হতোনা। এই ধরনের মর্মস্পর্শী, স্পর্শকাতর ও প্রত্যয়ী পরিবেশের মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের মনোনয়ন ও নির্বাচনের কাজটি পরিচালিত হতে থাকলো। অবশ্য স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার পেছনে আরো অনেক কারণ রয়েছে যা এখনো

আমার কাছে অদৃশ্য, ঐ কারণগুলো ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে উদঘাটন করবো বলে মনে মনে অঙ্গীকার করলাম। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ নাগাদ হাতিয়ার দশটি ইউনিয়নের মোট ১২৮টি ইউনিটের প্রতিটিতে ১০ জন হিসাবে সর্বমোট ১২৮০ জন স্বেচ্ছাসেবকদের নির্বাচন ও মনোনয়ন চূড়ান্ত করে ফেললাম।

এবার স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্য থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিট টিম লীডার নির্বাচন করার পালা। এই কাজটি বেশ ব্যাপক বিধায় ইউনিয়ন পর্যায়ে সভার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তা বাস্তবায়ন করার কাজ এগিয়ে চলছিল। প্রথম পর্যায়ে দু একটি ইউনিয়নে তেমন অসুবিধা না হলেও পরবর্তী সময়ে কতিপয় ইউনিয়নে তা প্রকটভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে একটি ইউনিয়নের ইউনিট ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সাংগঠনিক কাজ শেষ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, তৎপর স্বেচ্ছাসেবকদেরকে সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি প্রদান করা হবে এবং সে মতোই কাজ চলছিল। হরনী ও চানন্দি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি প্রদান করার পর স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে এ নিয়ে দারুণ সাড়া পড়ে গেল। ঐ সময়ে এ ধরনের সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রত্যক্ষ করার পর সবাই উপলব্ধি করলো যে সদ্য স্বাধীন দেশের নবগঠিত বাংলাদেশে রেড ক্রিসেন্ট বিশাল এক কর্মকাণ্ড নিয়ে মাঠে নেমেছে।

হেগস্ট্রম নিজেই এ সকল সাংকেতিক যন্ত্রাদি যাচাই বাছাই করে নির্বাচন করেছেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সরাসরি জাপান থেকে এ সকল সামগ্রী আমদানী করা হয়েছে। এগুলার মধ্যে সনি ব্রান্ডের বিশেষ ধরনের ট্রানজিষ্টার রেডিও, লাল রংয়ের টোয়া ব্রাণ্ডের মেগাফেন, হ্যাণ্ড সাইরেন, ফ্লাশ লাইট, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাগ, উদ্ধারের জন্য হালকা যন্ত্রপাতি, লাইফ জ্যাকেট, রেইনকোট, গাম বুট, হার্ড হ্যাট ইত্যাদি নির্ধারিত ছিল। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাগ, উদ্ধারের যন্ত্রপাতি, লাইফ জ্যাকেট, রেইনকোট, গাম বুট, হার্ড হ্যাট ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল। সবাই অনুধাবন করলো যে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করে উপকূলীয় জনমানুষের নিরাপত্তার জন্য এবার বিরাট কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে সিপিপি কমিটি গঠন

এভাবে ক্রমান্বয়ে আমরা ১০টি ইউনিয়নের ১২৮টি ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো গঠনের লক্ষ্য নিয়ে নিরলশভাবে কাজ করে যাচ্ছিলাম। এর মধ্যে চর কিং ইউনিয়নের ইউনিয়ন টিম লীডার নির্বাচন নিয়ে এক বিরাট জটিলতার সৃষ্টি হলো। নবগঠিত ১৬টি ইউনিটের মোট ১৬০ জন স্বেচ্ছাসেবক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একজন ইউনিয়ন টিম লীডার নির্বাচন করবে। এখানে প্রার্থী হলেন দুজন। একজন ঐ ইউনিয়নের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান জনাব তালুক মিয়া ও অপরজন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব জনাব কামাল হোসেন ওরফে প্রিন্স কামাল। দুজনই বিত্তশালী ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। দুজন প্রার্থীই এমনভাবে জনসংযোগে অবতীর্ণ হলেন যে সমস্ত ইউনিয়ন জুড়ে তা এক মহা-আলোড়ন সৃষ্টি করলো। নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছিল উত্তেজনা সে অনুপাতেই বাড়তে থাকলো। নির্বাচনের দুদিন পূর্বে সংবাদ পেলাম যে দু পক্ষই লাঠি-ছোটা এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত যোগাড় করে ফেলেছে এবং প্রয়োজনে হলে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে জয় নিশ্চিত করা হবে। এরমধ্যে দু পক্ষই অনেক স্বেচ্ছাসেবকদেরকে তুলে নিয়ে তাঁদের স্ব-স্ব নির্দিষ্ট ডেরায় অন্তরীণ করে ফেলেছে। ক্রমান্বয়ে অবস্থা এমনই সঙ্গিন হলো যে দু পক্ষের কাছ থেকেই নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পেলাম। কিন্তু আমি নির্দিষ্ট দিনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই প্রত্যয়ে অনঢ় থাকলাম। নির্বাচনের পূর্বদিন আমি হাতিয়া থানায় গিয়ে বিষয়টি জানিয়ে রাখলাম। থানার ওসি সাহেব আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে নির্বাচনের সময়ে পুলিশ আশেপাশেই থাকবে এবং সংঘর্ষ জাতীয় কিছু হলে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নির্বাচনের দিন সকালবেলায় রফিককে সঙ্গে নিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে নির্বাচনের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম তাতে শংকিত হওয়ার কথাই বটে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ভবনটির অনতিদূরে দুই পাশে দুটি বাড়িতে গরু জবাই করে বিশাল ভোজের আয়োজন করা হয়েছে এবং পুরো এলাকায় লোক সমাগম বেড়ে গেছে। রফিকের সাথে আলাপ করে সম্ভাব্য তৃতীয় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সন্ধান নিয়ে রাখলাম। নির্দিষ্ট সময়ে হল রুমে প্রবেশ করে সারিবদ্ধ সকল স্বেচ্ছাসেবকদেরকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলাম।

আমি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, এই ইউনিয়নে বিগত এক সপ্তাহ যাবৎ যা যা ঘটেছে তার সবটুকুই আমরা ভালভাবে অবগত আছি। আমরা এ কথাও শুনেছি যে এই নির্বাচন নিয়ে এখানে মারামারি এমনকি গোলাগুলির ঘটনাও ঘটতে পারে। তবে ঐ রটনা আমার কাছে গুজব বলে বিবেচিত হয়েছে। জনাব তালুক মিয়া ও প্রিন্স কামাল দুজনাই এই ইউনিয়নের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। আপনারা ভাল করেই জানেন যে রেড ক্রস দুর্গত মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে, কখনো মানুষের রক্ত ঝরানোর জন্য নয়। বাইরের কোন লোক যদি এখানে কোনরূপ মারামারি বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটানোর অপচেষ্টা করে তবে আমিই সর্বপ্রথম তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব এবং আমাকে ডিঙ্গিয়ে অন্য কারো গায়ে সে আঘাত পড়বে না।

এরপর আমি বললাম, চর কিং ইউনিয়নের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক তালিকা থেকে জনাব তালুক মিয়া ও জনাব কামাল হোসেন ওরফে প্রিন্স কামালের নামদুটো অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপাততঃ আমাদেরকে স্থগিত রাখতে হচ্ছে।

আমার একথা শুনে জনাব তালুক মিয়া প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠায় আমি তাঁকে বিনীতভাবে বললাম, পরিস্থিতির প্রয়োজনে এই সিদ্ধান্তটি নিতে হচ্ছে বলে আমরা সত্যিই দুঃখিত। আপনি এই ইউনিয়নের মুরুব্বী ও উপদেশদাতা হিসাবে স্বেচ্ছাসেবকদের পাশে সবসময়ই যে থাকবেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষের কল্যাণে আপনার অবদানের কথাও সবাই অবহিত। যুবকদের কাজে মুরুব্বিরা প্রেরণা যোগাবে এটাইতো স্বতঃসিদ্ধ।

আমার কথা শুনে জনাব তালুক মিয়া হাত উঠিয়ে একটু নাড়লেন, এতে তাঁর সম্মতির বহিঃপ্রকাশ ঘটল বলে মনে হলো। অন্যদিকে প্রিন্স কামাল অতি সহজেই হাসি মুখে আমাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। এরপর একজন তৃতীয় ব্যক্তি চর কিং কলেজের প্রিন্সিপাল এনামুল হককে ইউনিয়ন টিম লীডার হিসাবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দায়িত্ব পালন করবেন বলে ঘোষণা করলাম। আমার এই ঘোষণা শুনে স্বেচ্ছাসেবকেরা সবাই যেনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন কারণ এই স্পর্শকাতর নির্বাচনে কোন পক্ষ অবলম্বন করবেন তা নিয়ে তাঁরা দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে ছিলেন। একটা কঠিন পরিস্থিতির সহজতর সমাধান করার জন্য রফিক আমাকে ধন্যবাদ জানালো। আমরা নির্বাচন স্থান ত্যাগ করে সোজা প্রিন্সিপাল এনামুল হকের সাথে দেখা করে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করলাম এবং কেন তাঁকে ইউনিয়ন টিম লীডার হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বললাম। জনাব এনামুল হক আমাদের সিদ্ধান্ত

মেনে নিলেন এবং যত দ্রুত সম্ভব একটা নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন টিম লীডার নির্বাচন করে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের কথা ব্যক্ত করলেন।

কর্মসূচির সূচনা লগ্নে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ ও নেতৃত্ব গঠন প্রক্রিয়াতে মানুষের অংশগ্রহণ যে কত গভীর, সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল তা উপরোক্ত ঘটনাটি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে। অন্যান্য ইউনিয়নে কর্মসূচির নেতা নির্বাচনে প্রবল প্রতিদ্বন্দিতা থাকলেও তা চর কিং ইউনিয়নের মত এতটা প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। সবকটি ইউনিয়নের কমিটি গঠন সম্পন্ন করার পর সকল ইউনিয়ন টিম লীডাদের নিয়ে থানা কমিটি গঠন করা হলো। কোনরূপ প্রতিদ্বন্দিতা ছাড়াই হরনী ইউনিয়নের টিম লীডার জনাব আলমগীর হোসেন সিপিপি থানা টিম লীডার নির্বাচিত হলেন। আমরা সবাই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নিলাম। উল্লেখ্য যে হাতিয়ার মোট ১২৮ জন ইউনিট টিম লীডারদের মধ্যে ৩০ জনের অধিক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

এই সময়টাতে হাতিয়া থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোঃ আমিরুল ইসলাম কালাম আমাদের কাজে সহায়তা প্রদান করেছেন। সিপিপি-র যে কোন সমস্যায় তাঁর কাছ থেকে আমরা তড়িৎ সমাধান পেয়েছি। সিপিপি-র কার্যক্রম নিয়ে তিনি হেগস্ট্রমের সাথে মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনা করতেন। একবার কালাম সাহেব সিপিপি-র সকল কর্মর্তাদেরকে ঢাকায় তাঁর বাসায় ডেকে নিয়ে আপ্যায়নও করেছিলেন। হাতিয়াতে তিনি নিজে থেকেই মাঝে মাঝে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে সিপিপি-র খোঁজ খবর নিতেন।

সকলের সমর্থনে হাতিয়ার কার্যক্রম এগিয়ে চললো। এবার স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের পালা। আমার কাজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে দুই তিন জন যুবক কাজ করতো তাঁদেরকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগী প্রশিক্ষক হিসাবে গড়ে তুললাম। এরপর পার্শ্ববর্তী চানন্দি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে প্রথম প্রশিক্ষণের সূচনা করলাম। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সূচনালগ্নের সেই প্রশিক্ষণ এখনকার মতো এতো বিস্তৃত না হলেও দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল মাত্র সাতটি।

প্রথমটি হলো রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের ধারণা, নীতিমালা ও আদর্শ।

দ্বিতীয়টি হলো দুর্যোগের ধারণা প্রদানসহ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি কেন সৃষ্টি হলো এবং এর গুরুত্ব কতটুকু।

তৃতীয়টি হলো ঘূর্ণিঝড় কি, কেন সৃষ্টি হয়, কিভাবে তা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে।

চতুর্থটি হলো ঘূর্ণিঝড়ের সংকেতের অর্থ ও এর তাৎপর্য।

পঞ্চমটি হলো স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন ওয়ার্ড পর্যায়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণের মধ্যে সতর্ক সংকেত প্রচার পদ্ধতি এবং জনগণকে প্রস্তুতি কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা প্রদান।

ষষ্ঠ বিষয়টি ছিল ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সপ্তম ও সর্বশেষ বিষয়টি ছিল স্বেচ্ছাসেবার গুরুত্ব ও আর্তমানবতার সেবায় স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা। সহযোগী প্রশিক্ষকগণের আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ভালভাবেই এগিয়ে চললো। প্রতিটি ইউনিয়নে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর স্বেচ্ছাসেবকদের আনন্দমূখর অভিব্যক্তি আমার দৃষ্টি কেড়েছে। জ্ঞানের বিস্তৃতি হওয়ায় ওরা এখন সংকেতের অর্থ ও কিভাবে সংকেত প্রচার করে সমাজের বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা যায় তা আয়ত্ব করে ফেলেছে, এই জন্যই আনন্দে ওরা আত্মহারা। প্রতিবারই ওদের অনাবিল ঐ আনন্দের সাথে আমার আনন্দটুকুও সবার অজান্তে ভাগাভাগি করে নিয়েছি।

দশটি ইউনিয়নে বিরতিহীনভাবে একের পর এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলতে থাকলো। দুই মাসের মধ্যেই সকল ইউনিয়নের সকল স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করতে পেরে আমরা অনন্দিত হলাম। এবার থানা পর্যায়ে ইউনিয়ন টিম লীডারদের একটি সভা আহ্বান করলাম। নির্ধারিত দিনে সকাল এগারোটায় হেগস্ট্রম হেলিকপ্টারে চেপে হাতিয়াতে আসলেন। সভায় স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে হেগস্ট্রমের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ইউনিট ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

হেগস্ট্রম তাঁর ভাষণে হাতিয়ার কার্যক্রম সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে বললেন, উপকূলীয় অন্যান্য থানাগুলোতে এই একই কার্যক্রম সর্বোচ্চ শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী সমাপ্ত হয়নি। এই কাজগুলো হাতিয়াতে যেভাবে সম্পাদন করা হয়েছে তা সবার জন্য দৃষ্টান্ত বলে আমি মনে করি। আপনারা যারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন বস্তুতপক্ষে তারা সমাজের এক বিশেষ মর্যাদার মানুষ। মানুষের মধ্যে আপনারা আলোকিত মানুষ। মানবসেবার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আপনারা সমাজকে উদ্ভাসিত করেছেন। আপনাদের মতো মানুষ

আছে বলেই যুগে যুগে দুঃস্থ মানুষের ব্যথার উপশম হয়েছে। আমি আপনাদের জন্য গর্ব অনুভব করছি এবং আপনাদের এই গল্প আমি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপন করবো। মনে রাখবেন যে একটা দুর্যোগ যত শক্তিশালীই হোক না কেন মানুষের কৌশল তারচেয়েও বেশী শক্তিশালী। আপনারা প্রত্যেকেই এক একটি ইউনিয়নের নেতা এবং আপনাদের নেতৃত্বেই প্রতিটি ইউনিয়নের প্রস্তুতি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। এ সংক্রান্ত যে প্রশিক্ষণ আপনারা পেয়েছেন তা সর্বশেষ কথা নয়, স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবনের মাধ্যমে আপনারা উত্তম ও সর্বাপেক্ষা কার্যকর পন্থা নির্ধারণ করে কাজ করবেন। তথ্যগত জ্ঞানের সাথে বাস্তব অবস্থার সম্মিলন ঘটিয়ে কাজ করলে তা কার্যকর হতে বাধ্য এবং তা যে আপনারা করবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এই যে সিপিপি যা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতে হবে এবং অগণিত মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনায় নিয়ে এটিকে টিকিয়ে রাখতে হবে।

আলোচনার এক পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। একজন টিম লীডার নির্দিষ্ট করেই বললেন যে হাতিয়াতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য পাকা দোতালা ভবনের অভাব রয়েছে, এই অবস্থায় যদি জলোচ্ছ্বাসসহ কোন ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে তবে শুধুমাত্র সতর্ক সংকেত প্রচার করে প্রাণহানি রোধ করা যাবে না। একইভাবে গবাদিপশুর জন্য মাটির উঁচু ঢিবি বা কিল্লা ছাড়া ওগুলো রক্ষা করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে হেগস্ট্রম বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক উপকূলব্যাপী বেশ কিছু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানলেন। গবাদিপশুর আশ্রয়ের জন্য কিল্লা নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও তিনি স্বেচ্ছাসেবকদেরকে জানালেন।

এরপর টিম লীডারদের পক্ষ থেকে হেগস্ট্রমকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য পেশ করা হলো। সভায় সবার সাথে বসে হেগস্ট্রম চা নাস্তা খেলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে টিম লীডারদের সাথে আলাপ আলোচনায় মগ্ন থাকলেন। স্বেচ্ছাসেবকদর সাথে হেগস্ট্রমের ব্যবহার ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দেখে আমি বিস্মিত হলাম। মনে মনে ভাবলাম যে এমনতর বিনম্র ব্যবহার ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটলে একজন স্বেচ্ছাসেবক কেন অনুপ্রাণিত হবে না?

হেগস্ট্রমের সান্নিধ্যে থাকলে সব সময়ই কিছু না কিছু শেখা যায়। আজকেও দেখলাম যে কি দারুণ শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রদর্শন করে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ভাব বিনিময় করছেন। যদিও বেশীরভাগ কথাই আমি তরজমা করে হেগস্ট্রমকে বলছিলাম, তিনি আমার কথা শুনছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর চোখ স্বেচ্ছাসেবকদের

দিকে নিবদ্ধ ছিল সারাক্ষণই। তাঁর কাছ থেকে এ ধরনের শিক্ষা আমি অনন্য সম্পদ বলে মনে করি। স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাঁদেরকে অনুপ্রেরণা যোগানোর বিষয়টি সহজ কোন বিষয় নয় যা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রসঙ্গটি নিয়ে ভাবতে ভাবতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে একজন কর্মকর্তাকে অবশ্যই স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে, তাঁকে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং তাঁকে বন্ধুর মত আচরণ করতে হবে। স্বেচ্ছায় যারা সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে কাজ করে তাঁদের মন জয় করতে হবে এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেনো আমাদের কোন প্রকার আচার আচরণে তারা মনে কষ্ট না পায়। সর্বোপরি স্বেচ্ছাসেবকদের ভাল-মন্দ দেখা ও সার্বিকভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করার একটা মনোভাব সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বদাই লালন করতে হবে।

মিটিং শেষ হওয়ার পর অফিসে বসে হেগস্ট্রম আমাকে বললেন, ২৩টি থানার মধ্যে হাতিয়ার কাজ সর্বাগ্রে রয়েছে। এখানে তুমি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম সমাপ্ত করে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের কাজও শেষ করে ফেলেছো, কিন্তু অন্যান্য থানার কেউ তাঁদের সাংগঠনিক কাজ এখনো সমাপ্ত করতে পারেনি।

আমি বললাম, হাতিয়ার কথা কিছুটা ভিন্ন কারণ আমি কাজ শুরু করেছি সবার আগে। অন্যান্য থানায় কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়ে যখন পাঠানো হয় তখন আমি প্রায় চল্লিশ শতাংশ কাজ শেষ করে ফেলেছি। ট্রেনিং সমাপ্তির পর টিম লীডারদেরকে সাংকেতিক যন্ত্রাদি প্রদান করছি।

এ প্রসঙ্গে হেগস্ট্রম সাংকেতিক যন্ত্রাদি সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে সকল স্বেচ্ছাসেবককে অবহিত করার জন্য বললেন এবং ইউনিয়নের মাসিক সভায় যন্ত্রপাতি তদারকি করার ব্যবস্থা রাখার জন্য বললেন।

ইত্যবসরে জোয়কিম এসে আমাদের সাথে চা চক্রে যোগদান করলো। বাবা ও ছেলের মধ্যে কিছুক্ষণ সুইডিস ভাষায় কথাবার্তা হলো যা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। জোয়াকিম অফিস কক্ষ ত্যাগ করার পর আমি হাতিয়াতে একজন কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য হেগস্ট্রমকে অনুরোধ জানালাম এবং সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে রফিকের কথা বললাম। আমার কথা শোনার পর হেগস্ট্রম আমাকে সমর্থন

করলেন এবং পরশুদিন তিনি আবার যখন হাতিয়ায় আসবেন তখন রফিকের আবেদনপত্রটি তাঁর নিকট দেয়ার জন্য বললেন। ভবনের ছাদে উঠার সময় তিনি বললেন যে আরো দুটি থানা সফর করার পর সন্ধ্যার পূর্বে তিনি ঢাকায় ফিরবেন। হেগস্ট্রমের হেলিকপ্টার শূন্যে উড়াল দিল এবং নিমিষেই দিগন্তে অদৃশ্য হলো।

মনে মনে ভাবলাম একটা মানুষ কতটুকু নিবেদিতপ্রাণ হলে এমনতর দিনরাত ক্রমাগত কাজ করে যেতে পারে। একমাত্র রবিবার বন্ধের দিন ছাড়া সপ্তাহে ছয়টা দিন হেগস্ট্রম হেলিকপ্টার নিয়ে উপকূলীয় ২৩টি থানা চষে বেড়াচ্ছেন। প্রত্যেকটি কর্মকর্তার সাথে তিনি নিবিড়ভাবে আলোচনা করছেন এবং সমস্যার কথা শুনলেই তা তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা করছেন। থানা পর্যায়ের কাজের অগ্রগতির একটি তুলনামূলক চিত্র তিনি সকল কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করে সবাইকে একটি অদৃশ্য প্রতিযোগিতার মধ্যে নিমগ্ন করেছিলেন। এ কারণেই আগষ্ট মাসের মধ্যেই সবকটি থানায় কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ ও সাংগঠনিক কাঠামো গঠনের কাজ কর্মকর্তারা সফলভাবে সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন।

তিনদিন পর হেগস্ট্রম আবার হাতিয়াতে এলেন। সাথে এ্যাসোসিয়েটেড কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং (এসিই)-এর একজন প্রকৌশলী। অফিসে বসে তিনি আমাকে একটি নকশা দেখিয়ে বললেন যে হেগস্ট্রমের পরামর্শ মতে এই কিল্লার নকশা তৈরী করা হয়েছে এবং এটা নির্মাণ করতে অনেক লেবার নিয়োগ করতে হবে। আমি ভালভাবে দেখে ও আলোচনা করে কিল্লার নকশাটি বুঝে নিলাম।

এরপর হেগস্ট্রম বললেন, হারুন আমরা অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই কিল্লা নির্মাণের দায়িত্বটা তোমার উপর অর্পণ করছি কারণ ইতিপূর্বে টিম লীডারদের সভায় তারা এই বিষয়টি বাস্তবায়নের কথা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছে এবং তুমি নিজেও কিল্লার প্রয়োজনীয়তার কথা উপস্থাপন করেছ। এখন এই কিল্লা নির্মাণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করবে। এই প্রথম কিল্লাটি নির্মাণের জন্য এমন একটা জায়গা তুমি নির্ধারণ করবে যেটা একটা বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল হবে এবং যেখানে গরু, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদি বেশী থাকবে। আমাদের হাতে সময় অত্যন্ত কম বিধায় আজ থেকেই এই কাজে তোমাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

একটু বিরতি নিয়ে হেগস্ট্রম আরো বললেন, এই কিল্লাটি একটি মডেল কিল্লা হবে। আমরা আশা করছি যে মডেল কিল্লাটির অনুকরণে আরো অনেক কিল্লা নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হবে সুতরাং মডেল কিল্লা নির্মাণের প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত

সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করবে এবং বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করে রাখবে কারণ এই কিল্লা নির্মাণের অভিজ্ঞতা আমরা সর্বত্রই কাজে লাগাতে পারবো। কিল্লার মাটি কাটার মুজুরী বাবদ অর্থের পরিবর্তে আমাদের নিকট মজুদ চাউল ব্যবহার করবে। তুমি এমনভাবে লেবার নিয়োগ করবে যাতে চল্লিশ দিন সময়ের মধ্যে কিল্লাটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এবার তুমি কাজ শুরু করতে পার। আজ সারাদিন অনেকগুলো কাজের মধ্যে হাতিয়ায় কিল্লা নির্মাণের কাজটি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারায় আমি খুবই আনন্দিত বোধ করছি। এরপর প্রিন্স কনোয়ে হেগস্ট্রমের সাথে ঢাকা যাবেন বিধায় তিনি এসে হাজির হলেন। পরিবেশিত চা পান করার পর আর কোন কথা না বলে প্রিন্স কনোয়ে এবং প্রকৌশলীকে নিয়ে হেগস্ট্রম হেলিকপ্টারে গিয়ে উঠলেন এবং প্রস্থান করলেন।

হাতিয়ায় মুজিব কিল্লা নির্মাণ

হেগস্ট্রমের প্রস্থানের পর আমি কয়েকবার কিল্লার নকশাটি উল্টে পাল্টে দেখলাম এবং মাপঝোকগুলো ভালভাবে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম। অনতিবিলম্বে কিল্লার জায়গা নির্ধারণ করে কাজ শুরু করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব কাজটি সফলতার সাথে শেষ করতে হবে। আমি দারুণভাবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম।

সমস্ত কাজ স্থগিত রেখে কিল্লা নির্মাণের কাজে নেমে পড়লাম। সর্বপথম রফিকের সাথে আলোচনা করে ঠিক করলাম যে হাতিয়ার হুজিমিজি ঘাট থেকে দুই কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত মৌলভীর চরে কিল্লাটির জায়গা নির্ধারণ করা হলে সেটিই হবে আদর্শ জায়গা। রফিককে সাথে নিয়ে ঐ দিনই আমি মৌলভীর চরে গেলাম। চরটির পূর্বপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরেও অবতরণের ভাল জায়গা বের করতে না পেরে শেষ অব্দি কাদার মধ্যেই নেমে পড়লাম। মনির স্পীডবোট নিয়ে স্বল্প দূরত্বে নোঙর ফেলে অবস্থান নিল। আমি এবং রফিক হাঁটু সমান কাদা পেরিয়ে চরে গিয়ে উঠলাম। প্রথম দেখাতেই চরের দৃশ্য আমাকে বিমোহিত করলো। জনবসতিহীন মৌলভীর চরে প্রচুর গবাদি পশুর বিচরণ দেখতে পেলাম। বহুদূরে দু একজন বাতানের রাখালের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে বিগত ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার গবাদিপশু ও কিছুসংখ্যক মানুষ এই চর থেকে ভেসে গেছে।

আমরা ঘুরেফিরে চরের মোটামুটি মাঝ বরাবর গিয়ে একটা জায়গা নির্ধারণ করলাম যেখানে কিল্লা নির্মাণ করলে চরের সব জায়গা থেকে দূরত্ব প্রায় সমান সমান হবে। মোটামুটি সীমানা নির্ধারণ করার পর আবার কাদা পেরিয়ে বোটে উঠলাম এবং হুজিমিজি ঘাটে এসে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। রফিক স্থানীয় কয়েকজনকে ডেকে পাঠালো। কাছেই একটা স্কুল ঘরে বসে তাঁদের সাথে আমরা কিল্লা নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করলাম। উপস্থিত সবাই কিল্লা নির্মাণের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালো। আমাদের চিহ্নিত জায়গার বর্ণনা শুনে স্থানীয় লোকজনের সম্ভাব্য মালিক হিসাবে দুজনের নাম উল্লেখ করলো। কিল্লা নির্মাণে সবাইকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়ে আমরা হুজিমিজি থেকে প্রস্থান করে জমির সম্ভাব্য মালিক দুজনার সাথে সাক্ষাত করলাম এবং কিল্লা নির্মাণের বিষয়টি তাদেরকে জানালাম।

জমির মালিকদের সাথে আলোচনা মতে পরদিন তাঁদেরকে নিয়ে আবার মৌলভীর চরে গেলাম। আমাদের চিহ্নিত মোটামুটি পাঁচ-ছয় একরের জায়গাটি দেখে দুজনাই বললেন যে ঐ পুরো জায়গাটি তাঁদের দুজনার। রফিকের এক প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বললো যে চরের জমি খাস জমি হলেও স্থানীয় বিভিন্নজন পত্তন নিয়ে এগুলো চাষবাস করছে। একটা কিল্লার প্রয়োজনীয়তার কথা শোনার পর জমির মালিক দুজনাই খুবই উৎফুল্ল হয়ে বললো যে মানুষের উপকারের জন্য কিল্লা নির্মাণে তাঁদের কোনরূপ আপত্তি নেই তবে পত্তনি নেওয়া খাস জমি বিধায় তাঁরা লিখিত কোন অঙ্গীকারনামা দিতে পারবে না।

আমরা হাতিয়ায় ফিরে এসে সংসদ সদস্য জনাব দেলওয়ার হোসেনের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বললাম। তিনি কিল্লা নির্মাণের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে এ জন্য সকল সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে জানালেন। এরপর সার্কেল অফিসার (ডেভেলপমেন্ট) এর নিকট গিয়ে কিল্লা সংক্রান্ত আলোচনা করলাম এবং তাঁর নিকট থেকেও উৎসাহব্যাঞ্জক সাড়া পেলাম। সর্বশেষ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা করে খুঁটিনাটি মাপঝোক ও নকশা মোতাবেক কাঠামো বিন্যাস করার জন্য সহযোগিতা চাইলাম। প্রকৌশলী মহোদয় তাঁর একজন সহকারীকে ডেকে আমাদের সাথে কাজ করার জন্য বললেন।

এরপর কতিপয় লেবার সর্দারদের ডাকা হলো এবং আলোচনা করা হলো। লেবার সর্দারগণ বললেন যে ১৫০ ফিট লম্বা, ১০০ ফিট প্রশস্ত এবং ২০ ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট একটা কিল্লা যদি ২০/২৫ দিনের মধ্যে নির্মাণ করতে হয় তবে কমপক্ষে দুই হাজার লেবার নিয়োগ করতে হবে। তারা আরো বললো যে মৌলভীর চর

থেকে প্রতিদিন পারাপারের সুযোগ না থাকায় ওখানে লেবারদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

লেবারদের মুজরী নগদ অর্থের পরিবর্তে চাউল দিয়ে পরিশোধ করা হবে শুনে সর্দারগণ কোন আপত্তি করলেন না বরং খুশী হলেন। আমরা লেবার সর্দারদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে ফেললাম।

আগামী ১৫ ও ১৬ মার্চের মধ্যে এক হাজার পাঁচ শত লেবার মৌলভীর চরে অবস্থান নেবেন বলে সর্দারগণ জানালেন। তবে লেবারদের চরে যাওয়ার জন্য হুজিমিজি ঘাটে একটা বড় ট্রলার রাখার ব্যবস্থা করার জন্য সর্দারগণ আমদেরকে অনুরোধ জানালেন। ট্রলার সংস্থানের বিষয়ে আমরা সম্মত হলাম এবং জানালাম যে আগামী ১৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে কিল্লার কাজ শুরু করার শুভ উদ্বোধন হবে। আলোচনা সভায় উপস্থিত সবাই উল্লাস প্রকাশ করলেন।

হিসাব করে দেখলাম যে হাতে মাত্র বারো দিন সময় রয়েছে। রফিককে সাথে নিয়ে কাজে ঝাপিয়ে পড়লাম। পরদিন হুজিমিজি ঘাটে গিয়ে চরে শেড নির্মাণের জন্য স্থানীয় লোকদের সাথে আলোচনা করলাম। স্থানীয়রা জানলো যে প্রয়োজনীয় সি আই শীট, বাঁশ, দড়ি ইত্যাদি পেলে তারা আগামীকাল থেকেই কাজ শুরু করতে পারবে। যারা কাজ করবে তারা লেবার হিসাবে দৈনিক মুজুরী প্রাপ্ত হবে। স্থানীয়দের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর তাঁদের সমর্থনের ভিত্তিতে একজন সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া হলো।

সুপারভাইজারের কাজের ফিরিস্তি প্রসঙ্গে বলা হলো যে সে হুজিমিজি ঘাটে লেবারদের পারাপারে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে এবং মাটি কাটার সময় চরে অবস্থানপূর্বক মাটির হিসাব ও অন্যান্য কাজ সম্পাদন করবেন।

ঘাটের কাছাকাছি এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় বাঁশ ক্রয় করার জন্য সুপারভাইজারকে বলা হলো। পরদিন রেড ক্রস গুদামে থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সি আই শীট ও কম্বল হুজুমুজি ঘাটে পাঠিয়ে দেয়া হলো। প্রচুর পরিমাণে খেজুরের পাতার তৈরী পাটি ক্রয় করা হলো। তৃতীয় দিন ট্রলার যোগে সকল মালামাল ও শেড তৈরীর জন্য পঞ্চাশ জন লেবার মৌলভীর চরে পৌঁছে গেল।

দুই হাজার লেবারের জন্য শেড তৈরী করতে তাঁদের চারদিন সময় লাগলো। শেড মানে বাঁশের খুঁটি ও আড়ার সাথে সিআই শীটগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা।

পানীয় জলের সহজলভ্যতার জন্য চরে একটা অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হলো। রান্না করার জন্য প্রয়োজনীয় ডেগ, হাড়ি-পাতিল, লাকড়ী, চাউল, ডাল, আলু, ডিম ইত্যাদি চরে পাঠানো হলো। চল্লিশ জন স্থানীয় বাবুর্চি রান্নাবান্না করার কাজে নিয়োগ করা হলো। দুইটা ট্রলার দুই ঘাটে সার্বক্ষণিকভাবে চলাচলের জন্য মোতায়েন করা হলো। মনির স্পীডবোট নিয়ে হুজিমিজি ঘাটে শক্তভাবে অবস্থান নিলো।

বিশাল বিশাল অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের মধ্যেও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লেবারদের থাকার জায়গাসহ প্রাথমিক কাজগুলো ভালভাবে সমাপ্ত করতে পারায় আমরা তৃপ্তি অনুভব করলাম এবং পরম করুণাময় আল্লাহতালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

১৫ ও ১৬ মার্চ এক হাজার দুই শত লেবার মৌলভীর চরে অবস্থান গ্রহণ করলো। আমি কয়েকটা দিন ধরেই মৌলভীর চরে যাওয়া আসা করছি এবং যেখানে যে সমস্যা হচ্ছে তা নিরসন করে চলেছি। অনেক লোকের সমাগমে কাজ করার সময় কেউ আহত হতে পারে বিধায় কয়েকটা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাগ সুপারভাইজারের নিকট প্রদান করে প্রয়োজনের সময়ে এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বললাম।

১৭ মার্চ সকালে আমন্ত্রিত অতিথি হাতিয়ার এমপি জনাব দেলওয়ার হোসেন, সার্কেল অফিসার, ওয়াপদার প্রকৌশলী, প্রিন্স কনোয়ে, ট্যাডি, জোয়াকিম, হরনী ও চানন্দী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং সিপিপি-র কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক টিম লীডার সহযোগে আমরা মৌলভীর চরে পৌঁছলাম। ঐ সময় ভরা জোয়ার থাকার কারণে কলের কিছুটা কাছাকাছি যেতে পারলেও কাদার উপর সি আই শীট বিছিয়ে দিয়ে অতিথিদেরকে স্পীডবোট থেকে নামাতে হলো। নির্ধারিত জায়গায় অতিথিবৃন্দ উপবেশন করলেন।

আমি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, গত ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা ইউনিয়নে এসে একটি কিল্লার কাজ উদ্বোধন করেন এবং বলেন যে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস থেকে পশুসম্পদ রক্ষার জন্য উপকূলীয় এলাকায় মাটির কিল্লা অত্যন্ত কার্যকরী। আপনারা মাটির কিল্লা নির্মাণে যত্নবান হবেন। আমি ও রফিকুল আলম ঐ দিন স্পীডবোট নিয়ে রামগতি গিয়েছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সময়মত অনুষ্ঠানে পৌঁছুতে পারিনি। কিন্তু স্থানীয়

জনগণ ঐ কিল্লাটির নাম 'মুজিব কিল্লা' হিসাবে চিহ্নিত করেছে তা জানতে পারলাম। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সহযোগিতায় আমাদের বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এটা হাতিয়ায় আপনারা সবাই প্রত্যক্ষ করছেন। এবার একই ধারাবাহিকতায় মৌলভীর চরে আধুনিক ডিজাইনে একটা মডেল কিল্লা নির্মাণ হতে যাচ্ছে। প্রায় পাঁচ একর জায়গা জুড়ে বিশাল আকারের এই কিল্লাটির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আপনারাও ইতিহাসে অংশ হয়ে থাকলেন।

ওয়াপদার সুপারভাইজার জায়গাটার চারকোণে চারটি নিশান সমেত খুঁটি গেড়ে দিলেন। এরপর অতিথিবৃন্দ সবাই কোদাল দিয়ে কিছুটা করে মাটি কেটে কিল্লার কাজ উদ্বোধন করলেন।

এমপি জনাব দেলওয়ার হোসেন রেড ক্রসের এই মহতী উদ্যোগকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করে বললেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে যে কিল্লার কাজ শুরু হলো তা 'মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত হবে। বিগত ঘূর্ণিঝড়ে এই চর থেকেও শত শত গরু ও মহিষ ভেসে গেছে। এবার কিল্লাটি নির্মাণ করা হলে ভবিষ্যতের জন্য আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারবো।

এরপর হালকা নাস্তা দিয়ে সকলকে আপ্যায়ন করা হলো। লেবারদেরকে ভালভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা দিয়ে অতিথিগণ নদী পার হয়ে হাতিয়ায় ফিরে গেলেন। এরপর শুরু হলো মাটি কাটার কাজ। আমি অফিসে ফিরে গিয়ে ওয়্যারলেস মারফৎ কিল্লা উদ্বোধনের সংবাদ হেগস্ট্রমকে জানালাম। খুশীতে আপ্লুত হয়ে হেগস্ট্রম আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে আগামী দু-চার দিনের মধ্যেই তিনি মাটি কাটার কাজ দেখার জন্য আসছেন। তিনি চরের শুকনো জায়গায় হেলিকপ্টার নামার জন্য স্থান নির্ধারণ করে ওখানে রেড ক্রস পতাকা টানানোর কথা বললেন।

কিল্লাটির যে পরিমাপ তা হলো ১৫০ ফুট দীর্ঘ, ১০০ ফুট প্রস্থ যা ২ : ১ ঢাল দ্বারা বিন্যস্ত হয়ে ২০ ফুট উচ্চতায় প্রায় ১৫,০০০ বর্গফুটের একটি প্লাটফর্মের নির্মাণ। পরিমাপের পর দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম যে কিল্লাটি একটি বিশাল আকারের স্থাপনায় পরিণত হতে যাচ্ছে। কিল্লাটি দৈর্ঘের দিক থেকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত হবে এবং কিল্লার দক্ষিণ পাশ থেকে মাটি কেটে ওখানে একটা বড় আকারের পুকুর নির্মিত হবে।

পরদিন ট্যাডি ও রফিককে সাথে নিয়ে চরে গেলাম। কিল্লার সীমানা থেকে কিছুটা দূরে শক্ত ও শুকনো একটা জায়গায় হেলিকপ্টারের অবতরণ স্থল নির্ধারণ করে সেখানে একটা রেড ক্রস পতাকা টানিয়ে দিলাম। সর্দাররা বললো যে সকালে আরো একশত পঞ্চাশ জন লেবার কাজে যোগদান করেছে। শত শত লেবার কাজ করছে, এর মধ্যে অনেকগুলো দল মাটি কাটছে ও ঝুড়িতে ভরে অন্য লেবারদের মাথায় তুলে দিচ্ছে এবং পথিমধ্যে আরো দু-তিনবার ঝুড়ি বদল হয়ে নির্ধারিত স্থানে মাটি ফেলা হচ্ছে। ট্যাডি পাগলের মত ছুটোছুটি করে তাঁর বিশেষ ক্যামেরা দিয়ে একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছে। এ যেনো এক মহামেলা। মহা আনন্দ নিয়ে শত শত মানুষ একনাগাড়ে কাজ করে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার গলা ছেড়ে গান গাইছে। প্রখর সূর্যের তাপ, গরম গুমোট পরিবেশে আমরা ঘেমে ঘেমে সবাই একাকার। লেবাররাও খালি গায়ে গামছা কাঁধে ফেলে কাজ করছে এবং মাঝে মাঝে গামছা দিয়ে ঘাম মুছছে।

সুপারভাইজার আমাদের জন্য চা পরিবেশন করতে করতে জানালো যে প্রথম দিনের সকল ব্যবস্থাপনা এখানে পরিকল্পনা মাফিক হয়েছে এবং কোনরূপ সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। একজন লেবারের পেট খারাপ হওয়ায় তাকে বিশ্রামে রাখা হয়েছে এবং ঔষধ দেয়া হয়েছে। আমি সুপারভাইজারকে বেশী পরিমাণে পেট খারাপের ঔষধ কিনে সংরক্ষণের জন্য বললাম।

এরপর চা পান করতে করতে রফিককে বললাম, আমরা তাড়াহুড়ো করে কিল্লার কাজ শুরু করে ভালই করেছি। কোন কারণে কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব হলে বর্ষার মৌসুমে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যেতো।

রফিক আমাকে সমর্থন করে বললো, বর্ষা মৌসুমে নদী উত্তাল থাকায় চলাচলেও বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। আসলে বিচ্ছিন্ন কোন চর এলাকায় এ ধরনের কাজ করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন যা স্বল্প সময়ের মধ্যে হলেও আমরা তা করেছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করলে আরো সময় নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সুপারভাইজারের সাথে জরুরি কিছু আলোচনা সেরে নিয়ে দুপুরের পর আমরা অফিসে ফিরে গেলাম।

কিল্লার কাজ পরিকল্পনা মাফিক চলতে থাকলো। আমরা প্রতিদিনই চরে যাওয়া আসা করছি। কিল্লা নির্মাণের প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন

ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে কারণ এর খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়াদি হেগস্ট্রমকে অবহিত করতে হবে। কাজ শুরু করার পর চতুর্থ দিন ওয়্যারলেস মারফৎ সংবাদ পেলাম যে আগামীকাল হেগস্ট্রম কিল্লার কাজ দেখতে আসছেন। পঞ্চম দিন সকালবেলায় চরে গিয়ে হেগস্ট্রমের আগমনের সংবাদ সবাইকে জানানোর জন্য সুপারভাইজারকে বললাম। রফিক ও ট্যাডিসহ আমরা হেগস্ট্রমের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

সকাল দশটার পর হেগস্ট্রমকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি চরের উপর দিয়ে কয়েকটা চক্কর দিয়ে অবশেষে অবতরণ করলো। হেগস্ট্রমের সঙ্গে সিপিপি-র এ্যাডমিনিসট্রেটর জনাব এমদাদ হোসেন রয়েছেন।

হেলিকপ্টার দেখে লেবাররা সবাই উৎফুল্ল হয়ে আনন্দ চিৎকারে মেতে উঠল। কিছুক্ষণের জন্য কাজ বন্ধ হলো এবং লেবাররা সবাই একযোগে হাততালি দিয়ে হেগস্ট্রমকে স্বাগত জানালো। এরপর কাজ পুনরায় শুরু হলো এবং দ্বিগুণ উদ্যমে তারা কাজ করে চললো। পরিস্থিতি দেখে হেগস্ট্রম দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে লেবারদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আমরা তাঁকে লেবার সর্দারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি উৎফুল্লতা নিয়ে সবার সাথে করমর্দন করলেন।

হেগস্ট্রম এগিয়ে এসে ট্যাডি, রফিক, সুপারভাইজার এবং আমার সাথে করমর্দনের পর হাসিভরা মুখে বললেন, আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে এভাবে এতবড় একটা আয়োজন করে তোমরা কাজ শুরু করেছো। এতো লেবার একসাথে কাজ করছে তা দেখেতো অবাক হবারই কথা। পাইলটকে বললাম যে নামার পূর্বে কয়েকবার চক্কর লাগাও, আমি ভাল করে দেখে নেই। যা হোক স্বল্পসময়ের মধ্যে এই বিশাল আয়োজন করে কাজটি যে সুন্দরভাবে শুরু করতে পেরেছে সেজন্য তোমাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এমদাদ হোসেন আমাকে ও রফিককে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, এই কিল্লার নকশা অংকনসহ কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে এ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং। ইনঞ্জিনিয়ারিং ইন্সিষ্টিটিউটে অবস্থিত ওদের অফিসে বিষয়টি নিয়ে আমিই যোগাযোগ করছি। তবে নকশা দেখে কিন্তু বুঝতেই পারিনি যে এই কিল্লাটির পরিসর এত বড় হবে। উপকূলীয় এলাকায় এতো বড় কিল্লা নির্মাণের উদ্যোগ ইতিপূর্বে কখনো নেয়া হয়েছে বলে মনে হয়না। তবে এটা নিঃসন্দেহে

বলছি যে একটা দুর্গম চরে মাত্র একমাস সময়ের মধ্যে বিশাল আকৃতির কিল্লা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে তোমরা একটা ইতিহাস রচনা করলে।

কিল্লার নকশা অংকন ও কারিগরী কাজগুলো প্রকৌশলী ফার্মের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে সম্পাদন করার জন্য আমি এমদাদ হোসেনকে ধন্যবাদ জানালাম।

এরপর চারিদিকটা ঘুরে ফিরে দেখার সময় আমি বললাম, কিল্লার একপাশ থেকে মাটি কাটার ফলে লেবারদের মাটি বহন করার সময় ও দূরত্ব দুটোই বেড়ে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে যদি দুইপাশ থেকে মাটি কাটা হতো অর্থাৎ একটি পুকুরের পরিবর্তে দুইপাশে দুটি পুকুর খনন করা হতো তবে লেবারদের শ্রম যেমন কম হতো তেমনি সময়েরও অনেক সাশ্রয় হতো।

হেগস্ট্রম বললেন, এটা নিঃসন্দেহে একটা যুক্তিযুক্ত পর্যবেক্ষণ। এ জন্যইতো তোমাকে বলেছি যে এই মডেল কিল্লাটির সমুদয় খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখবে কারণ এরূপ কিল্লা আরো নির্মাণের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

এরপর ট্যাডির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, কিল্লা নির্মাণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম ক্যামেরাবন্দি করে রাখবে। নির্মাণ শেষ হলে ভাল ভাল কিছু ছবি দিয়ে একটা এ্যালবাম তুমি আমাকে দেবে। আমি ঐ এ্যালবাম দিয়ে আমার এ্যাডভোকেসি চালিয়ে যাব।

ট্যাডি তাঁর স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বললো যে এ্যালবাম আপনি ঠিক সময়মত পেয়ে যাবেন। এরপর কলা, বিস্কুট ও চা পানের অবসরে আরো কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর হেগস্ট্রম হেলিকপ্টারে উঠে বসার পরও লেবারদের মাটি কাটার দৃশ্য অবলোকন করতে থাকলেন। এই অবস্থায় লেবাররা সবাই আবার হাততালি দিয়ে হেগস্ট্রমকে বিদায় জানালো। হেগস্ট্রমও লেবারদের দিকে তাঁকিয়ে হাত নাড়তে থাকলেন। হেলিকপ্টার শূন্যে উঠে উড়াল দিয়ে দিগন্তে অদৃশ্য হলো।

প্রায় চৌদ্দ শত লেবার কি করে একসাথে হাততালি দিয়ে পরিবেশটাকে এতো মোহনীয় করে তুলেছিল তা বুঝতে পারলাম না। সুপারভাইজার বিষয়টি বুঝতে পেরে এগিয়ে এসে বললো যে পরিকল্পনাটা সেই করেছিল এবং একটা চমক সৃষ্টি করার জন্য সে পূর্বে তা আমাদের কাউকে বলেনি। যা হোক আমি সুপারভাইজারকে তাঁর এই চমক সৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

এরপরও আরো কয়েকবার হেগস্ট্রম মৌলভীর চরে এসে কিল্লার কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। কোন কোন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে কিল্লার কাজ দেখানোর জন্য তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

কোন দূর্ঘটনা বা বড় কোন সমস্যা ছাড়াই কিল্লার কাজ এগিয়ে চললো। দুই সপ্তাহের মধ্যেই কিল্লার মূল অংশটি তৈরী হয়ে গেল। এর পরবর্তী সপ্তাহে কিল্লাস্থিত উপরের মাটি দুরমুজের কাজ শুরু হলো। সর্বশেষে কিল্লার ঢালে ঘাস লাগানোর পর কিল্লার কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো।

কিল্লাটি নিয়ে মানুষের আগ্রহের যেন আর শেষ নেই। ইতিপূর্বে হাতিয়াতে কোন কিল্লা নির্মিত হয় নাই বিধায় স্থানীয় মানুষের কাছেও কিল্লাটি এখন মূখ্য আলোচ্য বিষয়। ওদিকে কিল্লার ছবির এ্যালবাম নিয়ে হেগস্ট্রমের দৌঁড়ঝাঁপ চলছে অবিরাম। আমরা একটা সাইনবোর্ডে ‘মুজিব কিল্লা’ লিখে কিল্লার উপরে স্থাপন করলাম।

এপ্রিল মাসের ২০ তারিখে কিল্লাটির উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণ করা হলো। হাতিয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সরকারী সকল কর্মকর্তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। হেগস্ট্রম ও এমদাদ হোসেনকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থকার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। হাতিয়ার সংসদ সদস্য জনাব দেলওয়ার হোসেন অনুষ্ঠানে প্রধান অথিথি হিসবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানালেন। রফিককে নিয়ে আমি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করলাম। হুজিমিজি ঘাটে মুনিরের স্পীডবোট এবং একটা ট্রলার রাখা হলো। সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকেরা অতিথিদেরকে সংবর্ধনা জানিয়ে চরে নিয়ে আসবেন সে মতে চানন্দী সিপিপি ইউনিয়নের টিম লীডারকে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

২০ এপ্রিল সকাল এগারটার মধ্যে সবাই মৌলভীর চরে কিল্লায় এসে হাজির হলেন। সব মিলিয়ে শতাধিক মানুষের সমাগম। তবে অপরিহার্য কোন কারণে হেগস্ট্রম অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারলেন না। কিল্লার উপরিভাগের প্লাটফর্মে চেয়ার-টেবিল স্থাপনপূর্বক শামিয়ানা টানানো হয়েছে। অনাড়ম্বর একটা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সদ্য নির্মিত মুজিব কিল্লার শুভ উদ্বোধন হলো।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণ বললেন, গবাদি পশুর নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কিল্লার কোন বিকল্প নাই। উপকূলীয় চরাঞ্চলে যেখানে গবাদিপশুর আবাসস্থল সেখানে

প্রচুর পরিমাণে কিল্লার সংস্থান থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রেড ক্রসের উদ্যোগে এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সহায়তায় নির্মিত এই ধরনের কিল্লার আরো ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। আমি এই কিল্লা নির্মাণের সাথে জড়িত বাংলাদেশ রেড ক্রস, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস, হাতিয়া থানা প্রশাসন, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও সিপিপি-র সকল স্বেচ্ছাসেবকদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ প্রস্থান করলেন। ওয়াপদার দুইজন ওভারসিয়ার, রফিক, সুপারভাইজার ও আটজন লেবার সর্দার মিলে কর্তিত মাটির চূড়ান্ত হিসাব করার কাজে নিয়োজিত হলাম।

পুকুরের গভীরতা মেপে কি পরিমাণ মাটি অপসারিত হয়েছে তা মাপা হলো। চূড়ান্ত হিসাবের পর দেখা গেল যে অতিরিক্ত প্রায় এক লক্ষ সিএফটি মাটির মূল্য আমরা বেশী প্রদান করে ফেলেছি। আমারতো মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার যোগাড় হলো। আমি সুপারভাইজারকে শুধালাম, তুমিতো প্রতিদিনের মাটি কাটার হিসাব রেখেছো এবং সে মতেই মুজুরী হিসাবে চাউল প্রদান করেছো তবে এ ধরনের সমস্যা কেন সৃষ্টি হলো?

সুপারভাইজার এর কোন যুক্তিযুক্ত জবাব দিতে পারলো না, শুধু বললো যে হিসাবে তার ভুল হয়েছে। রফিক রাগান্বিত হয়ে সুপারভাইজারকে প্রহার করতে উদ্যত হলো। আমি পরিস্থিতি শান্ত করে বললাম যে এক লক্ষ সি এফ টি মাটির মূল্য সম্পূর্ণ অবৈধভাবে পরিশোধ করা হয়েছে এবং অনতিবিলম্বে ফেরৎ প্রদান করতে হবে। উপস্থিত লেবার সর্দারদারগণকে তাঁদের গৃহীত চাউল ফেরৎ দেয়ার জন্য বললাম। লেবার সর্দারেরা বললো যে ঐ অতিরিক্ত চাউল চৌদ্দশত লেবারের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে যা ফেরৎ নেওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয় কারণ গরীব লেবারেরা তা ইতিমধ্যে ভক্ষণ করে ফেলেছে। আমি আগামীকাল সবাইকে রেড ক্রস অফিসে হাজির থাকার জন্য নির্দেশ দিলাম। একটা মহা-আনন্দের পর অত্যন্ত দুঃখজনক এই ঘটনার গ্লানি মাথায় নিয়ে অফিসে ফিরে এলাম। ভাবলাম হেগস্ট্রমকে আমি কি জবাব দেব?

সারাটা রাত নির্ঘূম কাটিয়ে পরদিন অফিসে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে সংসদ সদস্য জনাব দেলওয়ার হোসেনের নিকট সবাইকে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিকট এর একটা সুরাহা চাইবো। সর্দারগণ ও সুপারভাইজার অফিসে এলো। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে

সংসদ সদস্যের নিকট গিয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা করলাম। সংসদ সদস্য অতিরিক্ত চাউল ফেরৎ প্রদানের জন্য সর্দারদের চাপ দিলেন। লেবার সর্দারেরা বললো যে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চৌদ্দশত গরীব লেবারের নিকট থেকে ঐ চাউল ফেরৎ নেওয়া যাবে না কারণ ইতিমধ্যে তারা তা ভক্ষণ করে ফেলেছে।

সকল কথাবার্তা শোনার পর সংসদ সদস্য অভিমত পোষণ করলেন যে যেহেতু গরীব লেবারদের মধ্যে ঐ চাউল বিতরণ করা হয়েছে এবং তারা তা ভক্ষণ করে ফেলেছে সেহেতু ঐ চাউল রিলিফ হিসাবে গণ্য করে ওদেরকে দায়মুক্ত করে দিতে পারেন। আমি ঐ মুহুর্তে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে অফিসে ফিরে আসলাম। প্রচণ্ড অবসাদে মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠলো।

এরপর বিকেল বেলায় যে ঘটনা ঘটলো তাতে মাথা আরো ঘুরে গেল। মৌলভীর চরের কিল্লাস্থিত জমির দুই মালিক অফিসে এসে হাজির হয়ে জমির মূল্য পরিশোধের জন্য বললো। আমি বললাম, প্রাথমিক আলোচনার সময়ে তো আপনারা স্বতঃপ্রণোদিত কিল্লা নির্মাণের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেন এবং জমির মূল্য পরিশোধের কোন শর্তের কথা তখন উল্লেখ করেননি। এখন এতোদিন পর যখন কিল্লা নির্মাণ সম্পন্ন হলো তখন আপনারা জমির মূল্য চাইছেন কেন? প্রারম্ভিক আলোচনার সময়ে জমির মূল্য দাবী করলে আমি আমার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জমির মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারতাম। জমির মালিকগণ বললেন যে মূল্য ছাড়া জমি দেয়া যাবেনা এবং প্রয়োজন হলে কিল্লা সরিয়ে নেয়ার জন্য তারা কোর্টে কেস ফাইল করবে।

আমি এক মহা যন্ত্রণার মধ্যে নিপতিত হলাম। এই সকল কথা আমি কি করে হেগস্ট্রমের কাছে উপস্থাপন করবো তা ভেবে ভেবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লাম।

এরপর রফিক ঐ দিন এবিষয়ে জমির মালিকদের সাথে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে জমির মূল্য বাবদ পঞ্চাশ বস্তা চাউল প্রদান করতে হবে। পরপর দুটি ঘটনার আতিশয্যে আমি মুষড়ে পড়লাম। দুটো দিন যাবৎ বলতে গেলে অভূক্ত অবস্থাতেই রয়েছি। পরদিন সকাল নয়টায় মনিরকে ডেকে স্পীডবোট নিয়ে মৌলভীর চরে গেলাম।

নির্জন কিল্লার উপরে উঠে নিশ্চুপ বসে রইলাম। কিল্লার মাটি বেশী দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করার ঘটনা কেন ঘটল তা বিশ্লেষণ করে দেখলাম যে আমার তদারকির

অভাবেই এমনটি ঘটেছে। আমি যদি প্রতিদিনের মাটির হিসাব প্রতিদিন দেখতাম তবে হয়তো ওরা ঐ অপকর্মটি করতে ওরা সাহস পেতো না। আমার অদক্ষতার জন্য চাকুরি চলে যেতে পারে তাতে আমার দুঃখ নেই কিন্তু হেগস্ট্রম যদি ভেবে বসে যে অন্যায়টা আমি ইচ্ছে করে করেছি তবে সে দুঃখ আমি কোথায় রাখবো।

এভাবে আবোল-তাবোল চিন্তার মধ্যে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে রেড ক্রসের হেলিকপ্টারটি হাতিয়ার দিকে উড়ে যাচ্ছে। প্রমাদ গুনলাম, নিশ্চয়ই হেগস্ট্রম আমার খোঁজেই এসেছে। ভাবলাম এখন এখান থেকে হাতিয়া অফিসে যেতে প্রায় দেড়ঘন্টা সময় লাগবে এবং ততক্ষণ সময় নিশ্চয়ই হেগস্ট্রম আমার জন্য অপেক্ষা করবে না সুতরাং নির্লিপ্ত অবস্থায় কিল্লার উপরই বসে রইলাম।



এর পনেরো-কুড়ি মিনিট পর দেখলাম যে হেলিকপ্টারটি হাতিয়ার দিক থেকে উড়ে চরের দিকে আসছে। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই হেলিকপ্টারটি সরাসরি কিল্লার উপরে এসে অবতরণ করলো। আমি এগিয়ে গিয়ে হেগস্ট্রমকে স্বাগত জানালাম। হেলিকপ্টারের রোটার ব্লেডের শব্দ প্রবল থাকায় আমরা কিল্লার একপাশে চলে এলাম। আমার বিষণ্নতা তাঁর চোখ এড়াতে পারলো না।

হেগস্ট্রম আমার হাত দুটো ধরে চোখে চোখ রেখে শুধালো, কি হয়েছে তোমার? আজ তুমি এতো বিষণ্ন কেন? এখানে এই কিল্লার উপর একা একা কি করছ তুমি?

আমি আর আমাকে ধরে রাখতে পারলাম না, আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। আমার দু চোখ বেয়ে অঝোরে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। প্রথমে কিছুটা আশ্চর্য হলেও হেগস্ট্রম নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, কি হয়েছে আমাকে খুলে বল।

কিল্লার মাটি কাটায় অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাৎ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বললাম যে এই ঘটনাটি আমার অসতর্কতার জন্যই ঘটেছে। মাত্র দুদিন পূর্বে

কিল্লার উদ্বোধনীর দিনই কেবলমাত্র বিষয়টি আমার গোচরীভূত হয়েছে কিন্তু ইতিমধ্যে লেবাররা অতিরিক্ত চাউল নিয়ে নিয়েছে। এই ঘটনায় আমি এতটাই কষ্ট পেয়েছি যে কিল্লা নির্মাণের এক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রম এখন আমার কাছে অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে।

হেগস্ট্রম আমার কথা শুনে কিছুটা রাগান্বিত হয়ে গলা চড়িয়ে বললেন, এই কিল্লাটা কে তৈরী করেছে? এটি তৈরী করতে কাদের অবদান সবচেয়ে বেশী?

আমি বললাম, চৌদ্দ শ লেবার যারা মাটি কেটে কিল্লাটা তৈরী করেছে।

হেগস্ট্রম বললেন, এবার বলো তোমার ষ্টকে কত চাউল রয়েছে?

আমি বললাম, এখনো কমপক্ষে দু হাজার বস্তা রয়েছে।

হেগস্ট্রম বললেন, ঐ চালগুলো চৌদ্দশত লেবারদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে দাও। আমি হতচকিত হয়ে হেগস্ট্রমের দিকে তাঁকিয়ে থাকলাম। ভাবলাম এ লোক বলছেটা কি? মাত্র সত্তুর আশি বস্তা চাউল অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে বিধায় আমার নাওয়া-খাওয়া নেই উপরন্তু সে বলছে মজুদ দুই হাজার বস্তা চাউল সবই লেবারদের দিয়ে দিতে। তবে কি সে আমার সাথে হেয়ালী করছে? তাই বা কি করে হয়। ভেবে কূল কিনারা কিছুই পেলাম না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমি হেগস্ট্রমের দিকে তাঁকিয়েই রইলাম।

হেগস্ট্রম আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, তুমি কি জান হারুন কতটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তুমি করেছো? এ কথাতো দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে এই কিল্লা নির্মাণের ফলে এই চরের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে অনেক। কিল্লা নির্মাণকালীন ট্যাডির তোলা ছবিগুলো দেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপকূলব্যাপী আরো দুই শতাধিক কিল্লা নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছেন। চৌদ্দশত লেবার এবং তোমরা সবাই মিলে যে কিল্লাটি নির্মাণ করলে তারই প্রেক্ষিতে যে বিশাল অর্জনটা হলো সেই সংবাদটা তোমাকে জানাতেই তো আজ আমি হাতিয়াতে এসেছি। এই কিল্লা নির্মাণে আমি তোমার অবদানটাকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছি। এখন কিল্লা নির্মাণে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমরা তোমাকে দেখছি।

এরপর তিনি আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে পার্কিং করা হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমার বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটেনি। আমি নির্বাক, হেগস্ট্রমের কথাগুলো যেনো প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে আমার কর্ণকুহরে।

হেগস্ট্রম হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসে বললেন, এই কেকটা তোমার জন্য। হোটেলের বেকারী থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানানো কেকটার কমপক্ষে অর্ধেকটা তুমি খাবে। বাকীটা অন্যদেরকে দিলে আমার আপত্তি নেই।

আমি বললাম, এখন আমার পেটে যে পরিমাণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে তাতে পুরো কেকটাই আমি গলাধঃকরণ করতে পারবো।

হেগস্ট্রম খুশী হয়ে বললেন, চল হেলিকপ্টারে করে তোমাকে অফিসে নামিয়ে দেই। আমি হেগস্ট্রমকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, ড্রপ দেবার প্রয়োজন নেই, স্পীডবোটেই পার হবো। মনির আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

এরপর ফেরার সময় হেগস্ট্রম একটা অট্টহাসি দিয়ে পুনরায় বললেন, দু হাজার বস্তা চাউলতো আর দিতে পারবে না, তবে চৌদ্দশত লেবারদের প্রত্যেককে অন্তত আধা মন করে চাউল বন্টন করবে, এটা আমার নির্দেশ।

হেলিকপ্টারটি উপরে উঠে একটা চক্কর দিয়ে পুনরায় আমার দিকে অনেকটা নিচু হয়ে উড়ে এসে বাক নিলো। আমি দেখলাম আমার দিকে তাঁকিয়ে হেগস্ট্রম হাত নাড়ছে। আমিও হাত নাড়লাম। দু মিনিটের মধ্যেই হেলিকপ্টারটি দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল। আমি আরো কিছুক্ষণ কিল্লার উপর ঠায় বসে রইলাম। এইমাত্র এখানে যে ঘটনাটি ঘটে গেল তা যেনো স্বপ্নকেও হার মানিয়ে দিল। এমন একটা মহেন্দ্রক্ষণে আমার মনে হলো যে হেগস্ট্রম একজন অনন্য মানুষ। হাজার মানুষের মধ্যে সন্ধান করে বেড়ালেও আরেকটি হেগস্ট্রম খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ধরনের মানুষেরা যুগে যুগে সমাজের পরিবর্তনের প্রয়োজনেই আবির্ভূত হন এবং চলার পথে আলো ছড়িয়ে পৃথিবীকে আলোকোজ্জল করে তোলেন। কল্পনায় হেগস্ট্রমকে সামনে এনে বড় করে স্যালুট জানালাম।

অফিসে ফিরে যাবার সময় স্পীডবোটে কেকের মোড়কটি খুলে কিয়দংশ মনিরকে দিলাম এবং কিছুটা নিজে খেলাম বাকীটুকু রফিকের সাথে ভাগাভাগি করে খাব বলে সঙ্গে নিলাম। ফিরে এসে রফিককে পুরো ঘটনা অবহিত করলাম। রফিক আমার কথা শুনে বললো যে মানবতার প্রতি যারা অঙ্গীকারবদ্ধ তারা এমনই হয়, শত বিপত্তির মধ্যেও তাঁরা প্রকৃত চিত্রটাই দেখতে পারেন।

এই ঘটনার দুদিন পর হুজিমিজি ঘাটে সকল লেবার সর্দারদের উপস্থিতিতে তাঁদের অধীনস্ত চৌদ্দ শত লেবারের প্রতিজনকে আধা মন করে চাউল দেয়ার সময় লেবার সর্দারদের একজন বললো যে আপনারা সত্যিই আজব মানুষ, যেখানে অতিরিক্ত

মুজুরী নিয়েছি বলে অভিযোগ রয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা গৃহীত হবে বলে আমরা শঙ্কিত সেখানে উল্টো আরো আধা মন করে চাউল জনপ্রতি আমাদের মধ্যেই বন্টন করে দিচ্ছেন।

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা বললাম যে মৌলভীর চরের কিল্লার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করেই সারা উপকূলব্যাপী আরো দুই শতাধিক কিল্লা নির্মাণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুমোদনসহ অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন।

এই যে এতো বড় একটা কৃতিত্ব এতে নিঃসন্দেহে আপনাদের অংশ রয়েছে। আপনাদের সেই শ্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ হেগস্ট্রম সাহেবের নির্দেশে আজ এই চাল বিতরণ করা হচ্ছে। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে দুই শতাধিক কিল্লার অংশ হিসাবে নতুন আরো বিশ-পচিশটা কিল্লা হাতিয়াতেও নির্মিত হবে। হাতিয়াতে আরো নতুন কিল্লা নির্মাণ করা হবে শুনে সবাই খুশিতে উৎফুল্ল হলো এবং হাততালি দিলো। চাল বিতরণ শেষে দুপুরের পর আমরা অফিসে ফিরে এলাম।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর এমদাদ হোসেন হেলিকপ্টারযোগে হাতিয়ায় এলেন। অফিসে বসে মিটিংয়ের এক পর্যায়ে আমি তাঁকে কিছু বিষয়াদি বিস্তারিত আলোচনার জন্য হাতিয়াতে একদিন অবস্থানের জন্য অনুরোধ জানালাম এবং তিনি রাজী হলেন। ইত্যবসরে জোয়াকিম ঢাকা যাওয়ার জন্য বায়না ধরলো। আমি ওয়্যারলেস মারফৎ হেগস্ট্রমের সাথে আলাপ করে জোয়াকিমকে ঢাকা যাওয়ার সম্মতি দিলাম এবং বললাম যে অফিসের গাড়ি এয়ারপোর্টে থেকে ওকে গুলশানের বাসায় নামিয়ে দেবে। আমি ভবনের ছাদে উঠতে উঠতে বললাম যে কয়েকদিন পরই আবার ফিরে এসো। জোয়াকিম মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে হেলিকপ্টারের পাইলটের সাথে করমর্দন করলো। সম্ভবত সুইডিস ভাষায় দুজন কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললো এবং তাঁদের উৎফুল্লতা দেখে মনে হলো যেন তাঁরা পরস্পর অতি পরিচিত জন।

জোয়াকিমকে নিয়ে হেলিকপ্টার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। আমি নিচে নেমে এলাম এবং এমদাদ হোসেনের সাথে পুনরায় আলোচনায় যোগ দিলাম। ইত্যবসরে রফিক অফিস কক্ষে প্রবেশ করলো। রফিককে দেখে এমদাদ হোসেন বললেন, স্বাগতম আপনাকে, আপনার চাকুরি হয়ে গেছে। দু-একদিনের মধ্যেই নিয়োগ পত্র পেয়ে যাবেন। এমদাদ হোসেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে রফিক আলোচনায় যোগদান করলো। আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম।

কিল্লা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে এমদাদ হোসেন বললেন, আমি কিল্লা নির্মাণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যই মূলতঃ আজ হাতিয়াতে অবস্থান করছি। হাতিয়ার জন্য ২২টি নতুন কিল্লা বরাদ্দ হয়েছে। এই কিল্লাগুলো কোথায় কোথায় নির্মাণ করা যায় তা নির্ধারণ করতে হবে। নতুন কিল্লা নির্মাণ খুব একটা সহজ হবে না কারণ কিল্লার জমি অবশ্যই দানকৃত হতে হবে। জমি দান করার জন্য প্রচারণা চালানোর উপর জোর দিতে হবে।

হাতিয়া যেহেতু দ্বীপাঞ্চল সেহেতু পুরো দ্বীপের যেকোন জায়গাই কিল্লা নির্মাণের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে তবে প্রস্তাব পাওয়ার পর প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে তা নির্দিষ্ট করবেন। আপনারা তো জানেন যে কিল্লা নির্মাণে হেগস্ট্রম খুবই উৎসাহী। আমরা যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে পারি তবে পরবর্তীতে আরো অধিক কিল্লা নির্মাণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারবো।

আমি বললাম, বিষয়টি নিয়ে আগামীকাল থেকেই আমাদেরকে মাঠে নামতে হবে। সকল ইউনিয়নের টিম লীডারদের এই কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাছাড়া হাতিয়া দ্বীপে জোতদার ও কারা জমি দান করতে পারে তাতো রফিকের নখদর্পণে রয়েছে। রফিক বললো যে আগামী তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যেই আমরা নতুন কিল্লা নির্মাণের দানকৃত জমির পরিমাণ ও অবস্থানসহ তালিকা তৈরী করতে পারবো বলে আশা করছি।

আমি প্রসঙ্গ পাল্টে হাতিয়ার বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল চর উসমান (বর্তমানে নিঝুম দ্বীপ) এবং দূরবর্তী ইউনিয়নসমূহ রেডিও নেটওয়ার্কের অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি উত্থাপন করলাম। এমদাদ হোসেন বললেন, সিপিপি অন্তর্ভূক্ত সকল থানাতেই 'হাই ফ্রিকোয়েন্সি' ওয়্যারলেস সেট স্থাপন করা হয়েছে। দ্বীপাঞ্চল ও দূরবর্তী ইউনিয়নসমূহে 'ভেরী হাই প্রিকোয়েন্সি' ওয়্যারলেস সেট স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। রেডিও ইঞ্জিনিয়ার রবিউল ইসলাম সহসাই হাতিয়াতে আসবে ও প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করবে এবং সেটগুলো স্থাপন করবে।

আলোচনার এই পর্যায়ে রেডিও অপারেটর তিবরীজ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে চিৎকার করে বললো যে হাতিয়া থেকে যাওয়ার পথে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। আমিও চিৎকার দিয়ে ছুটে রেডিও রুমে প্রবেশ করে মাইক্রোফোন

হাতে নিলাম। রেডিওতে তখন ঐ দুর্ঘটনা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। ঢাকা থেকে হোসেন কথা বলছে। আমি হোসেনকে বললাম, কি হয়েছে আমাকে বিস্তারিত খুলে বলুন। ইত্যবসরে এমদাদ হোসেন ও রফিক রেডিও সেটের সামনে চলে এসেছে।

হোসেন বললো, হাতিয়া থেকে রওয়ানা হওয়ার পর নোয়াখালীর এক প্রত্যন্ত গ্রামে হেলিকপ্টারটির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায় এবং তা ভূপাতিত হয়। পাইলট ও জোয়াকিম দুজনাই হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। হেলিকপ্টারটি একটা পুকুরের কাঁদার মধ্যে গিয়ে পড়ায় দুজনার কেউই গুরুতর আঘাত পাননি। দুর্ঘটনা স্থলটি ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ের কাছাকিছি হওয়ায় তাঁরা হেঁটে গিয়ে একটা ট্রাকে উঠে ঢাকার দিকে রওয়ানা হয়েছেন। দুর্ঘটনা স্থলে হাজার হাজার লোক সমাগম হয়েছে এবং ঢাকা চট্টগ্রাম রাস্তায় যানযটের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশা করছি যে বিকেলের মধ্যেই পাইলট এবং জোয়াকিম ঢাকায় পৌঁছুতে পারবে।

আমি হেগস্ট্রমের সাথে রেডিওতে কথা বললাম। হেগস্ট্রম বললেন যে পাইলট এবং জোয়াকিম দুজনেই ভাল আছে। তিনি আমাদেরকে চিন্তা করতে নিষেধ করলেন।

পরদিন এমদাদ হোসেন ট্রলারে নদী পার হয়ে মাইজদী হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আমি রফিককে তুলে মোটর সাইকেল নিয়ে হাতিয়াতে নতুন কিল্লা নির্মাণের জন্য জমিদাতাদের সন্ধানে বের হলাম। প্রথম দিনই আমরা সাত জন ব্যক্তিবর্গের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সাথে দেখা করলাম। রফিকের সাথে জানাশোনা থাকায় সবাই আমাদের আবেদন ও আর্জি মনোযোগ সহকারে শুনলেন। এদের মধ্যে দুজনকে পাওয়া গেল যারা কোন প্রকার আপত্তি ছাড়াই কিল্লার জমি দিতে রাজি হলেন।

এভাবে প্রতিদন সকালে বের হয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ঘোরাফেরা করে উনিশ দিনের মাথায় সতেরোজনকে পেলাম যারা জমি দিতে রাজি হলেন। আরো পাঁচটি কিল্লা প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে চরাঞ্চল ও বেড়ীবাঁধের বাইরে খাস জমিতে নির্মাণ করা হবে বলে সাব্যস্ত হলো।

এরপর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন কিল্লা নির্মাণের প্রস্তুতি নেয়া হলো। কিল্লা নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে এল জি ই ডি মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ

ও প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। কিল্লার কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে নির্দেশ মোতাবেক প্রতিটি কিল্লার জন্য প্রজেক্ট কমিটি গঠন করা হলো। এই প্রজেক্ট কমিটি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, সিপিপি ইউনিয়ন টিম লীডার ও সংশ্লিষ্ট ইউনিট টিম লীডার, জমি দাতা, রেড ক্রস সদস্য ও স্থানীয় দু-একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হলো। সিপিপি কর্মকর্তার উপর বাস্তবায়ন ও তদারকির দায়িত্ব অর্পিত হলো। কারিগরী বিষয়াদি দেখার দায়িত্ব পড়লো এল জি ই ডি এর উপর। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর উপর কিল্লা নির্মাণের সার্বিক দায়িত্ব অর্পিত হলো।

কিল্লার মডেল ও নকশা কি প্রকারের হবে তা সিপিপি-র উপর ন্যস্ত ছিল। এখানে হেগস্ট্রমের অবদান ছিল প্রভূত। মৌলভীর চরে মডেল কিল্লাটি নির্মাণের পর থেকে তিনি প্রকৌশলী ফার্ম এ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেই যাচ্ছিলেন। প্রথম কিল্লাটি ছিল চতুর্ভূজ আকারের যা ছুটে আসা পানির তোড়ে বাঁধাপ্রপ্ত হয়ে কিল্লার ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা বেশী বলে ধারণা করা হলো। এর সমাধান কল্পে গোলাকার কিল্লার মডেল তৈরী করা হলো। এগুলোও আবার বেড়ী বাঁধের ভেতরে একরকম ও বেড়ী বাঁধের বাইরে অন্যরকম করে নামকরণ করা হলো। চতুর্ভূজ কিল্লার নাম হলো 'ওল্ড টাইপ', বেড়ী বাঁধের ভেতরের গোলাকার কিল্লার নাম হলো 'এ টাইপ' এবং বেড়ী বাঁধের বাইরের কিল্লার নাম হলো 'বি টাইপ'।

এর মাঝে একদিন হেগস্ট্রম এ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের একজন প্রকৌশলীকে সঙ্গে নিয়ে হাতিয়াতে এলেন এবং কিল্লার সবগুলো মডেল ও নকশা আমাদের হাতে দিলেন। প্রকৌশলী সবগুলো কিল্লার মডেলের বৈশিষ্ট ও প্রায়োগিক বিষয়সমূহ সবিস্তারে আলাদা আলাদাভাবে বুঝিয়ে বললেন। এবার আমরা ভালভাবে বুঝতে পারলাম যে কোন স্থানে কোন টাইপের কিল্লা নির্মাণ করতে হবে। কিল্লা নির্মাণে আমাদের কাজের পদ্ধতির কথা শুনে হেগস্ট্রম খুশী হলেন।

রফিককে নিয়ে আমি কিল্লা নির্মাণের কাজে ঝাপিয়ে পড়লাম। প্রজেক্ট কমিটি গঠনের সাথে সাথেই সেখানে সীমানা নির্ধারণপূর্বক কাজ শেষ করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি। এভাবে এক মাসের মধ্যেই দানকৃত জমির উপর সতেরটি কিল্লার প্রজেক্ট কমিটি গঠন করে নির্মাণ কাজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললো। রফিককে সাথে নিয়ে সকাল বেলা মোটর সাইকেল নিয়ে বেরুতাম এবং সবকটি

কিল্লার কাজ তদারকি করে অফিসে ফিরে আসতে বিকেল কিংবা সন্ধ্যা পার হয়ে যেতো। প্রতিটি কিল্লার কাজ দেখা ও প্রজেক্ট কমিটিসহ লেবারদেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্য স্থানীয় সিপিপি স্বেচ্ছসেবকদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এবং সেই মত তাঁরা কার্যকর অবদান রেখে চলছিলেন। সে সময়ে রাস্তাঘাট পুরোটাই কাঁচা ছিল এবং ইউনিয়নে যাতায়াত কষ্টসাধ্য ছিল বিধায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা কিল্লার কাজ দেখতে বা তদারকি করতে যেতে চাইতেন না। কাজের পুরোটাই আমাদেরকে করতে হতো। চর ওসমান (নিঝুম দ্বীপ) ও বেড়ী বাঁধের বাইরে চারটি কিল্লার কাজও সমানভাবে চলছিল। কিন্তু কাজ আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিন পরই কথিত মতে অতি প্রাকৃতিক কিছু ঘটনার পর চর ওসমানের কিল্লার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। পরবর্তীতে এই কিল্লার কাজ সমাপ্ত করতে অনেক সময় লেগেছিল।

হাতিয়া ছাড়াও মনপুরার কিল্লার জায়গা সংস্থান এবং নির্মাণের তদারকিও হাতিয়া থেকে আমাদেরকেই করতে হতো। যদিও স্থানীয় বাসিন্দা হাফিজুল্লাহ চৌধুরী কর্মকর্তা হিসাবে ঐ সময়ে কর্মরত ছিলেন এবং তাঁর বাড়িতেই সিপিপি অফিস স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু কিল্লা নির্মাণ বিষয়ে তাঁর অনুরোধের প্রেক্ষিতে নিয়মিতভাবে তাঁকে সহায়তা প্রদান করতে হতো। মনপুরা ও তজুমদ্দিনের কিল্লা সংক্রান্ত আইনী জটিলতার কারণে আমাকে ও রফিককে বেশ কয়েকবার হাতিয়া থেকে স্পীডবোটে তজুমুদ্দিন গিয়ে সেখান থেকে মোটর সাইকেলে চেপে ভোলা যেতে হয়েছে।

উল্লেখ্য যে প্রতিবারই স্পীডবোটে মোটর সাইকেল উঠিয়ে নিয়ে আমরা এই সফরগুলো করেছি শুধুমাত্র এই কারণে যে বিকেলের মধ্যেই যেনো হাতিয়াতে ফিরে আসা যায় কারণ সেই সময়ে ব্যস্ততা এতো বেশী ছিল যে একটা দিন নষ্ট করার মতো অবকাশ আমাদের ছিল না। সেই সময়ে আমাদের নির্ভরযোগ্য স্পীডবোট ড্রাইভার মুনীরের সতকর্তা সত্ত্বেও অনেকসময় ডুবো চরে আটকা পড়ে আমাদেরকে পরবর্তী জোয়ার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।



লেখক হারুন আল রশিদের সাথে কর্মরত হাতিয়ার রফিকুল আলম

এর মধ্যে মাঝে মাঝেই হেগস্ট্রম হেলিকপ্টার নিয়ে হাতিয়ায় আসতেন এবং আমাকে ও রফিককে নিয়ে নির্মীয়মাণ কিল্লাগুলোর কাজ দেখতেন। হেলিকপ্টার যখন কিল্লার উপর দিয়ে চক্কর দিতে তখন প্রজেক্ট কমিটির সদস্য ও লেবারগণ এতটাই উৎসাহিত হতেন যে তাঁদের কাজের গতি বেড়ে যেতো এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যেও একটা সাড়া পড়ে যেতো।

ঐ সময়ে একই সাথে মহেশখালী, কুতুবদিয়া, চকোরিয়া, সুধারাম (সুবর্ণচর), সন্দীপ, হাতিয়া, রামগতি, মনপুরা, দৌলতখান, তজুমদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাসন, গলাচিপা, কলাপাড়া, আমতলী ও পাথরঘাটায় একই সাথে কিল্লা নির্মাণের কাজ হয়েছিল। কিন্তু হেগস্ট্রমের হিসেব মতে হাতিয়া ছিল প্রথম সারির প্রথম স্থানে। এভাবে কাজ করার ফলে পরবর্তী মাসের মধ্যে শতকরা ষাটভাগ কাজ সমাপ্ত হলো।



১৯৭৩ সালে কলাপাড়া উপজেলায় নির্মিত মুজিব কিল্লার বর্তমান চিত্র



১৯৭৩ সালে গলাচিপা উপজেলায় নির্মিত মুজিব কিল্লার বর্তমান চিত্র

এর মধ্যে একদিন হেগস্ট্রম হাতিয়াতে এলেন। অফিসে গিয়ে কিল্লার অগ্রগতির কথা শুনে দুঃখ ভারাক্রান্ত বদনে তিনি বললেন, তোমরা এখানে এতো কাজ করছো অথচ সন্দীপ ও কুতুবদিয়াতে এখনো কিল্লার জায়গাই নির্ধারণ করা যায় নাই। ওখানকার কর্মকর্তারা বলছে যে জায়গার মূল্য অধিক হওয়ায় কেউ জায়গা দান করতে আগ্রহী হয়নি। হাতিয়াতে তো পুরো কাজটাই শুরু হয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে অনেকগুলো কিল্লার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমরা ভাবছি যে হাতিয়ার বাকী কাজ রফিক সামলাবে এবং হারুন তুমি কুতুবদিয়া ও সন্দীপে কিল্লার জায়গা সংগ্রহের কাজ করবে।

পাশে উপবিষ্ট রফিকের মতামত চাইলে সে এই প্রস্তাবে রাজী হলো। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

হেগস্ট্রম বললেন, আগামী পরশু আমি হেলিকপ্টার নিয়ে তোমাকে কুতুবদিয়া ড্রপ করবো। ওখানে কাজ শেষ করার পর তুমি সন্দীপ যাবে।

আমি বললাম, রফিক এখানে কাজের সাথে ভালভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে এবং বাকী কাজ সে ভালভাবেই সম্পন্ন করতে পারবে। রফিক স্থানীয় এবং মুক্তি বাহিনীর কমাণ্ডার হওয়ায় সে হাতিয়ার মানুষের খুবই আস্থাভাজন। ইতিমধ্যে প্রিন্স কনোয়ে, ট্যাডি, ডাঃ মায়েদা ও জাপানিজ মেডিকেল টিমের অন্য সদস্যরাও হাতিয়ার কাজ শেষ করে চলে গেছেন, সুতরাং এমন একটা সময়ে হাতিয়া থেকে অন্যত্র যেতে আমার কোন আপত্তি নেই।

আমার বক্তব্যে হেগস্ট্রম খুশী হলেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে হেলিকপ্টারে উঠে প্রস্থান করলেন। রফিকের সাথে হাতিয়ার বিভিন্ন কাজ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করলাম। কি করতে হবে এবং কোথায় কোথায় কি ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা পর্যালোচনা করলাম। সিপিপি থানা টিম লিডারের সাথে দেখা করলাম। তাঁর সহযোগিতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। হাতিয়া শহরের অতি পরিচিত দু-একজনের সাথে দেখা করলাম। ঐ দিন রফিকের সাথে অনেকটা সময় কাটালাম এবং একসাথে রাতের খাবার খেলাম। পরের দিন সিপিপি-র সকল মালামালের তালিকা প্রণয়ন করার পর রফিকের কাছে চার্জ হস্তান্তর করলাম। হাতিয়াতে আমার কোনরূপ দায়-দেনা না থাকায় স্বস্তি অনুভব করলাম। ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে একটা ঘুম দিলাম।

পরদিন সকালে হেগস্ট্রম এলেন। হেলিকপ্টার থেকে নেমে তিনি অফিসে গিয়ে বসলেন। লোকমান চা পরিবেশন করলো।

হেগস্ট্রম রফিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি জানি সিপিপি হাতিয়াতে অত্যন্ত গোছালো, এর কারণ কাজের প্রতি তোমাদের একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা। এবার হারুনের অবর্তমানে পুরো খেলাটা তোমাকেই খেলতে হবে রফিক । আমরা দেখব কত ভাল খেলা তুমি খেলতে পার। অবশ্য আমি সপ্তাহে কমপক্ষে দুইদিন তোমার সাথে সাক্ষাত করবো এবং কাজ-কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

রফিক বললো, সিপিপি বাস্তবায়নে হাতিয়াতে হারুন ভাই একটা শক্ত ভিত্তি স্থাপন করে ফেলেছেন। আমি হারুন ভাইয়ের সাথে সাথে থেকে এ যাবত অনেক কাজে সহযোগিতা করেছি এবং তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছি। মিষ্টার হেগস্ট্রম, আমি আপনাকে কথা দিতে পারি যে আগামীতেও কাজের ক্ষেত্রে হাতিয়াই অগ্রগামী থাকবে।

এরপর রফিক, মঈনউদ্দিন, লোকমান, ডাঃ মায়েদা ও জাপানিজ নার্সদেরকে বিদায় জানালাম। হেলিকপ্টার উপরে উঠে গেল। জানালা দিয়ে সুশোভিত সবুজ গাছপালা, বাড়ি-ঘর, অতি চেনা রাস্তাঘাট অপসারিত হয়ে বিশাল জলরাশির মধ্যে হাতিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা দৃষ্টিগোচর হলো। আমরা সন্দীপের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে চট্টগ্রামে অবতরণ করলাম। পাইলট হেলিকপ্টারে জ্বালানী ভরে নিলেন এবং একটু অপেক্ষার পর আবার উপরে উঠলেন। নিচে সাগরের পানি উপকূল বরাবর আছড়ে পড়ছে। একদিকে সবুজ তটরেখা অন্যদিক আদিগন্ত সাগর। এমন মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কুতুবদিয়া পৌঁছে গেলাম।

হেলিকপ্টার থেকে নামার পর ওখানের সিপিপি কর্মকর্তা লুৎফুল মতিন আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। অফিসে গিয়ে হেগস্ট্রম আমাদেরকে কিছু নির্দেশনা দিলেন। এরপর আমরা একই ভবনে অবস্থিত সিপিপি-র পাশের রুমে সার্কেল অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। সার্কেল অফিসার আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। হেগস্ট্রম আমাকে সার্কেল অফিসারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমার কুতুবদিয়া সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। এ বিষয়ে তিনি সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবেন বলে হেগস্ট্রমকে জানালেন।

হেগস্ট্রমের প্রস্থানের পর লুৎফুল মতিনের সাথে প্রাথমিক আলোচনায় তিনি বললেন, কুতুবদিয়াতে কেউ কিল্লা নির্মাণের জন্য জমি দান করতে আগ্রহী নন। এ যাবৎ আমরা অনেক অবস্থা-সম্পন্ন মানুষের সাথে দেখা করেছি, আলোচনা করেছি ও তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছি কিন্তু ফলাফল শূন্যের কোঠাতেই আটকে আছে।

আমি বললাম, কালকে থানা কমিটির একটা বিশেষ সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখুন। ঐ সভায় সকল ইউনিয়ন টিম লীডারদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাবেন।

কুতুবদিয়ার একমাত্র ডাকবাংলোতে লুৎফুল মতিনের পাশের এটি রুমে আমার থাকার জায়গা নির্ধারিত হলো। পরদিন সকাল দশটায় সকল ইউনিয়ন টিম লীডার সিপিপি অফিসে এসে হাজির হলেন।

লুৎফুল মতিনের স্বাগত বক্তব্যের পর আমি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, ঘূর্ণিঝড়ের কবল থেকে গবাদিপশু রক্ষার জন্য কিল্লার কোন বিকল্প নাই সে কথা আপনারা অবগত রয়েছেন। কুতুবদিয়ার পশ্চিম দিকে বিশাল ও অবারিত সাগরের অবস্থান থাকায় কুতুবদিয়া খুবই বিপদাপন্ন একটি থানা। এখানে ঘূর্ণিঝড়ের সময় জলোচ্ছ্বাস হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। বিগত সময়ে বহুবার প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস কুতুবদিয়াতে আঘাত হেনেছে এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতিসহ হাজার হাজার গবাদিপশু সাগরে ভেসে গেছে তাতো আপনারা জানেন। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে এখানে আমাদেরকে কিল্লা নির্মাণ করতেই হবে।

ইদানিং হাতিয়াতে একটি মডেল কিল্লা নির্মাণের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা উপকূলব্যাপী দুই শতাধিক মাটির কিল্লা নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন এবং তিনি আশা পোষণ করেছেন যে সবাই তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন।

সিপিপি-র রূপকার মিঃ হেগস্ট্রম অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন যাতে ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। এ সকল মহৎ ব্যক্তিবর্গের আহ্বান এড়িয়ে গিয়ে একরাশ ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কেন আমরা নির্লিপ্ত থাকবো? আপনারা একটা মহৎ দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম লিখিয়েছেন এবং এখানকার ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক সকল কাজ সম্পাদনের জন্য এগিয়ে এসেছেন।

আমি অনুরোধ করবো কুতুবদিয়ার সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে অনুপ্রাণিত করে কমপক্ষে দশটি কিল্লার জমি সংস্থানের জন্য আপনারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করবেন।

একজন টিম লীডার বললেন, কুতুবদিয়া একটি ছোট দ্বীপ এবং এখানকার জমি খুবই মূল্যবান, অনেকেই মনে করছেন যে কিল্লা নির্মিত হলে জমি দাতার কতটুকু লাভ হবে। আমি বললাম, জমি দাতার লাভই এখানে সর্বাধিক কারণ যে জমিটা তিনি দান করবেন সেটা নিশ্চয়ই তাঁর বাড়ির কাছাকাছি কোথাও হবে এবং প্রয়োজনের সময়ে তিনিই সর্বপ্রথম ওটা ব্যবহার করতে পারবেন। দ্বিতীয় লাভ হচ্ছে, তিনি মানুষ ও গবাদি পশুর নিরাপত্তার জন্য জমি দান করছেন, এটা অবশ্যই একটা সদকায়ে জারিয়া। তৃতীয় লাভ হচ্ছে, সমাজে তিনি একজন মানবদরদী হিসাবে পরিচিত হবেন। চতুর্থ লাভ হচ্ছে, কিল্লা করার ফলে কিল্লা সংলগ্ন যে পুকুরগুলো সৃষ্টি হবে তা এলাকার জনগণের সুপেয় পানির যোগান দেবে, এমনিতেইতো কুতুবদিয়াতে মিষ্টি পানির বেশ অভাব রয়েছে। ভবিষ্যতে কোন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ বা অন্য কোন স্থাপনা তৈরী করার পরিকল্পনা হলে কিল্লাকে কেন্দ্র করেই তা গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে সেটাও একটা বড় আকারের লাভ হিসাবে বিবেচনা করা যায় বৈকি।

আমার বক্তব্য শুনে ইউনিয়ন টিম লীডারগণ অনুপ্রাণিত হলেন এবং দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বললেন যে সবাই এজন্য কাজ করবেন। আরো প্রায় ঘন্টাখানেক আলাপ আলোচনা করার পর ইউনিয়ন পর্যায়ে একটা প্রচারণা সূচি তৈরী করা হলো এবং সম্ভাবনাময় জমি দাতাদের সাথে প্রাথমিক আলোচনা আমার উপস্থিতিতে হবে বলে নির্ধারিত হলো। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এই কর্মধারা অনুযায়ী এরপর শুরু হলো আমাদের অভিযান। ইউনিয়ন টিম লীডার কর্তৃক প্রণীত তালিকা অনুযায়ী অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের বাড়িতে গিয়ে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করতে থাকলাম। ফলাফল ভালই হলো বলতে হবে। এর মাঝখানে হেগস্ট্রম দুবার কুতুবদিয়ায় সফর করে আমাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি কি তা তদারকি করেছেন। একবার থানা টিম লীডারকে হেলিকপ্টারে উঠিয়ে নিয়ে কিল্লার সম্ভাব্য জায়গাগুলোর উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে তা অবলোকন করেছেন।

সকল টিম লীডারদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে আমাদের প্রচারাভিযান ভালই হলো। দু সপ্তাহ সময়ের মধ্যে সাতজন অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ কিল্লা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করলেন। আমি উপস্থিত থেকে দুটি কিল্লার কাজ উদ্বোধন

করলাম। ওয়্যারলেস মারফৎ এ সংবাদ শুনে হেগস্ট্রম অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি এবার আমাকে সন্দীপ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন।

দুদিন পর হেগস্ট্রম এসে হাজির হলেন এবং আমাকে উঠিয়ে নিয়ে সন্দীপ রওয়ানা হলেন। কিছুক্ষণ উন্মুক্ত সাগরের উপর দিয়ে এবং তারপর উপকূল রেখা বরাবর আমাদের হেলিকপ্টার উড়ে চললো। কিছুক্ষণ পর আমরা সন্দীপে অবতরণ করলাম। সিপিপি কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন শিকদার আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। অফিসে গিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনার পর সার্কেল অফিসারের সাথে একটা সংক্ষিপ্ত সভা শেষ করে হেগস্ট্রম প্রস্থান করলেন।

রুহুল আমিনের সাথে আলোচনায় কুতুবদিয়ার সমপর্যায়ের অবস্থা সন্দীপেও দেখতে পেলাম। তবে রুহুল আমিন দুটো কিল্লার বিষয়ে জমি দাতাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছেন বলে জানালেন। কুতুবদিয়ার মতো একই প্রক্রিয়ায় সিপিপি থানা কমিটির সভা করে ইউনিয়ন পর্যায়ে অভিযান শুরু হলো। এখানেও দু সপ্তাহের মধ্যে রুহুল আমিনের সংগৃহীত দুটি কিল্লাসহ সাতটি কিল্লার জমির সংস্থান হলো।

কিল্লার জমি সংগ্রহের সময় সন্দীপে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার সম্মুখীন হলাম। একজন জমিদাতা জমি দেয়ার বিষয়ে রাজী হলেন এবং লে-আউট দিয়ে কাজ শুরু করার তারিখ নির্ধারণ করা হলো। নির্দিষ্ট দিনে সকালবেলায় এলজিইডি-এর একজন প্রকৌশলী এবং রুহুল আমিন সহ আমরা কিল্লার জমিতে গিয়ে হাজির হলাম। কিল্লার লে-আউট ও কিল্লা নির্মাণ শুরু হবে বিধায় সেখানে অনেক মানুষের সমাগম হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে জমির মালিক এগিয়ে এসে বললেন যে আমরা জমি দিতে অপারগ কারণ আমার ছেলেমেয়েরা চাচ্ছে না যে আমি জমি দান করি।

আমি বললাম, এটা আপনাদের এখতিয়ার। আপনারা চেয়েছিলেন যে জমি দান করবেন এবং আমরা সরকারী অর্থ খরচ করে কিল্লা নির্মাণ করে দেব যা আপনাদের গবাদি পশুসম্পদ যুগ যুগ ধরে রক্ষা করবে। এখন যখন জমি দেবেন না বলছেন তখন আর আমাদের করার কিছু নেই। আমরা ফিরে যাচ্ছি।

আমরা যখন মোটর সাইকেলে উঠতে যাচ্ছি তখন জমির মালিক বললেন যে আপনাদের দুপুরের খাবারের জন্য বাড়িতে পাকশাক হয়ে গেছে এবং আপনারা

না খেয়ে যেতে পারবেন না। আপনারাতো কথা দিয়েছিলেন যে আজ আমার বাড়িতে দুপুরের আহার করবেন।

আমি বললাম, অবশ্যই কথা দিয়েছিলাম কিন্তু আপনিওতো জমি দেবেন বলে আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন। আপনি যখন আপনার কথা রাখছেন না তাই আমরাও আমাদের কথা রাখতে পারছি না।

আমার কথা শুনে জমির মালিক যেনো বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। ওদিকে জমির মালিকের সাথে আমাদের কথাবার্তা উপস্থিত গ্রামবাসী শুনছিলেন এবং পরিস্থিতি অবলোকন করছিলেন।

আমরা মোটর সাইকেলে স্ট্রাট দিয়ে বাড়ির বাইরে এগিয়ে গিয়ে রাস্তায় উঠলাম ঠিক তখনি জমির মালিক চিৎকার করতে করতে দৌড়িয়ে এসে বললেন, আমি জমি দেব, আমি জমি দেব কিন্তু না খেয়ে আপনাদেরকে আমার বাড়ি থেকে যেতে দেব না। আমরা ফিরে গেলাম। উপস্থিত জনতা খুশিতে হাততালি দিয়ে আমাদেরকে স্বাগত জানালো। বাড়ির পাশেই জমিতে কিল্লার সীমানা নির্ধারণ করে কিছু মাটি কেটে কিল্লার উদ্বোধন করা হলো। স্থানীয় জনতা আবার হাততালি দিয়ে সবাইকে উৎসাহিত করলো। এরপর আমরা জমির মালিকের বাড়িতে দুপুরের আহার করলাম। রুহুল আমিন বললো, এটাই হয়তো বা পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল লাঞ্চ। তিনজন মানুষের খাবারের মূল্য পাঁচ একর জায়গা।

এই ঘটনার দুদিন পর হেগস্ট্রম হেলিকপ্টারে চেপে সন্দীপ এলেন। রুহুল আমিন তাঁকে কিল্লার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরলো। হেগস্ট্রম খুশী হয়ে বললেন যে সন্দীপে আরো কয়েকটা কিল্লা হলে ভাল হতো।

বরিশাল আঞ্চলিক অফিসের উদ্বোধন

হেগস্ট্রম আমাকে তুলে নিয়ে নিয়ে বরিশাল অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ঘন্টাখানেক সময়ের মধ্যে বরিশাল ষ্টেডিয়ামে হেলিকপ্টার অবতরণ করলো। এখানে বেশ কয়েকটা ড্রামে হেলিকপ্টারের জ্বালানী মজুত করা রয়েছে, সেখান থেকে পাইলট জ্বালানী নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। আমরা বাইরে বেরিয়ে অফিসের গাড়ীতে করে ডিসি লঞ্চঘাটে এলাম। এখানে একটা প্রিফেব্রিকেটেড স্থাপনায় সাংকেতিক

যন্ত্রপাতি মেরামত ওয়ার্কশপ এবং স্পীডবোট মেরামত ওয়ার্কশপ দেখতে পেলাম। অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন শেডটিতে কয়েকজন টেকনিশিয়ানকে কাজ করতে দেখলাম। স্পীডবোট ওয়ার্কশপ ইনচার্জ মোঃ শফিকুল ইসলাম এগিয়ে এসে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। একটু এগিয়ে ঘাটে গিয়ে দেখলাম একটি ক্রুবোট ও দুটি ল্যান্ডিং ক্র্যাফট সারিবদ্ধ অবস্থায় পানিতে ভাসমান। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ফজলুল হক এগিয়ে এসে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমরা একটা ল্যান্ডিং ক্র্যাফটে উঠে এবং ডেকে বিন্যস্ত চেয়ারে বসলাম। বোটের সকল ক্রু ও ওয়ার্কশপের টেকনিশিয়ানরা একে একে উপস্থিত হলেন। আজকের এই মিটিংটা পূর্বেই নিধারণ করা ছিল। বরিশালে সিপিপি-র এ সকল স্থাপনা ও কার্যক্রম দেখে আমার ভাল লাগলো।

সভার শুরুতেই হেগস্ট্রম আমাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন যে এখন থেকে মিঃ হারুন বরিশাল আঞ্চলিক পর্যায়ে সিপিপি ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। এখন থেকে আপনাদের কাজের সফল বাস্তবায়ন ও সমস্যাদি নিরসনের জন্য সকল প্রকার সহযোগিতা তাঁর কাছ থেকে আপনারা পাবেন।

আমি আর্শ্চযান্বিত হয়ে হেগস্ট্রমের দিকে তাকালাম, তাঁর মুখে রহস্যের হাসি দেখলাম। তিনি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন যে তোমাকে ইতিপূর্বে বিষয়টি বলিনি কারণ সারপ্রাইজ দেব বলে। বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর চা নাস্তা পরিবেশনের পর সভা শেষ হলো। এরপর ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল হক আমাদেরকে জর্দান রোডে সদ্য ভাড়া করা সিপিপি অফিসে নিয়ে গেলেন। বরিশাল অফিসার ক্লাবের উল্টোদিকে অবস্থিত অফিসের ছিমছাম ও মনোরম পরিবেশে দেখে উল্লসিত হলাম। ফজলুল হক বললেন যে অফিসের চেয়ার টেবিল ক্রয় করতে হবে। অফিস সংলগ্ন সবুজ ঘাসে ভরা মাঠটির পাশে ছোট একটি ভবন দেখিয়ে তিনি বললেন যে ওখানে আপনার থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। সব মিলিয়ে বরিশালের অবস্থা দেখে আমার খুবই ভাল লাগলো।

হেগস্ট্রম বললেন, হারুন এটাই তোমার অফিস এবং এখানেই তোমাকে অবস্থান করতে হবে। তুমি এবার বরিশাল অঞ্চলের থানাগুলোতে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করবে, ওয়ার্কশপ দুটির কার্যক্রমের তদারকি করবে এবং একই সাথে বরিশাল আঞ্চলিক দপ্তরকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এগুলোই এখন তোমার দায়িত্ব।

অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে কথাগুলো বলে হেগস্ট্রম একটা খাম বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা তোমার বরিশালে দায়িত্ব গ্রহণের অফিস অর্ডার।

আমি অফিস অর্ডারটি হতে নিয়ে বললাম, হেগস্ট্রম, বরিশালে সিপিপি-র কাজ সম্পাদনের সুযোগ দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আমার সাধ্যমতো সচেষ্ট থাকব যাতে এখানকার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারি। তাছাড়া তুমিতো সপ্তাহে অন্তত একবার হলেও বরিশাল আসবে, কোন সমস্যা হলে তোমার কাছ থেকেই সমাধান চেয়ে নেব।

হেগস্ট্রম বললো, তবে এখানে তোমার স্থায়িত্ব বেশীদিন হবে না। আমরা ভোলাতে একটা আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের চিন্তা ভাবনা করছি এবং সেখানের শুরুটা তোমাকেই করতে হবে। তবে তা বাস্তবায়ন করতে বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে।

আমি হেগস্ট্রমের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার খেলার মাঠটা ক্রমান্বয়ে বড় হচ্ছে সেক্ষেত্রে এখনকার মতো অহরহ গোল করতে পারবো কিনা সন্দেহ হচ্ছে।

হেগস্ট্রম একটা অট্টহাসি হেসে বললো, গোল করা যাদের অভ্যাস তাঁরা বড় মাঠেও তা পারবে। চিন্তার কিছুই নেই। পরিস্থিতির প্রয়োজনে সব ঠিক হয়ে যাবে। এরপর ফজলুল হক ও আমি হেগস্ট্রমের সাথে ষ্টেডিয়াম পর্যন্ত এলাম। আমরা হেগস্ট্রমকে বিদায় জানিয়ে অফিসে ফিরে এলাম। ফজলুল হক বললেন, থাকার জন্য খাট ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় করতে দু-একদিন সময় লাগবে এবং ঐ সময়টা আপনি জাপানি ক্রুবোটের ক্যাবিনে অবস্থান করতে পারেন।

আমি ফজলুল হককে বললাম, নৌকা বা জাহাজে ঘুমোতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনা কারণ ঢেউয়ের দোলায় যখন জাহাজ এদিক ওদিক দুলতে থাকে তখন আমি অস্বস্তি বোধ করি। চলুন বাজারে যাই এবং একটা ছোট খাট, তোষক, চাদর, বালিশ ইত্যাদি কিনে নিয়ে আসি। এরপর সকল দ্রব্যাদি কেনার পর আমার থাকার রুমটাকে পরিপাটি করে নিলাম। পরেরদিন অফিসের আসবাবপত্র কেনা হবে বলে ফজলুল হক জানালেন।

বরিশালের বেশীরভাগই তদারকিমূলক কাজ। ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা অঞ্চল থেকে কর্মকর্তারা এখান থেকেই লজিষ্টিক সাপোর্ট পেয়ে থাকেন। তবে আমাকেও যে মাঝে মাঝে মাঠ পর্যায়ে সফরে যেতে হবে তা মনে মনে ঠিক করে নিলাম।

একটি স্পীডবোট দুর্ঘটনা

এরই মধ্যে ঘটলো এক অঘটন। ওয়্যারলেস মারফৎ জানতে পারলাম যে গলাচিপা থানার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা মোজাম্মেল হকের কিশোর বয়সী পুত্র মিজানুর রহমান স্পীডবোট দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। চর এলাকায় কোন কাজ সম্পাদনের পর হঠাৎ করেই মিজান পানিতে পড়ে যায় এবং স্পীডবোটের প্রপেলার সরাসরি তার মুখমণ্ডলে আঘাত হানে। তার নাক, মুখ, চোয়াল ও গাল ছিন্নভিন্ন হয়ে মাংসপিণ্ড আকারে ঝুলে পড়েছে। অত্যন্ত মুমূর্ষ অবস্থায় গলাচিপা সদর হাসপাতালে আনা হলে ডাক্তার তাকে অবিলম্বে ঢাকায় স্থানান্তরের জন্য পরামর্শ দেন কারণ জখমটা এতই মারাত্মক হয়েছিল যে রক্তক্ষরণ কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিল না।

সংবাদটি সাথে সাথেই হেগস্ট্রমকে জানানো হলো। হেগস্ট্রম তাৎক্ষণিকভাবে হেলিকপ্টারের পাইলটকে তলব করলেন। সেদিন রবিবার থাকায় পাইলট ছুটির আমেজে ছিলেন। কিন্তু হেস্ট্রমের উদ্যোগে পাইলট হেলিকপ্টার নিয়ে গলাচিপায় এলেন এবং মিজানকে তুলে নিয়ে সরাসরি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রস হাসপাতালের ছাদে অবতরণ করলেন। হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানালেন যে এই প্রথমবারের মতো কোন রোগীকে হেলিকপ্টারে করে এই হাসপাতালে আনা হলো। প্রচুর রক্তক্ষরণে ম্রিয়মান মিজানকে হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে বেডে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার চিকিৎসা শুরু হলো।

মিজানের ভাগ্য সত্যিই সুপ্রসন্ন ছিল কারণ তাকে ঐ সময়ে জরুরিভাবে ঢাকায় না আনতে পারলে তার জীবন সংশয়ের মতো ঘটনা ঘটতে পারতো। মিজানের এই ঘটনার মধ্য দিয়ে হেগস্ট্রমের আরো একটি রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম এবং মানবতার শিখরে যে তাঁর অবস্থান তা সম্যক উপলব্ধি করলাম। এখনো মাঝে মধ্যে মিজানের সাথে দেখা হয় এবং তাঁর চেহারায় সামঞ্জস্যতা দেখে সেই বিশেষ দিনটির কথা আমার স্মরণে আসে।

ভোলায় সিপিপি-র আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন

এমনিতর কর্মমুখর ব্যস্ততার মধ্যে জুন মাসের শেষ দিকে একদিন হেগস্ট্রম ওয়্যারলেস মারফৎ বললেন যে হাতিয়া থেকে তুমি এবার ভোলা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আজই হাতিয়া থেকে রফিক বরিশাল যাচ্ছে। তাঁকে বরিশালের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তুমি লঞ্চে ভোলা চলে যাবে। ভোলার লালমোহনের কর্মকর্তা আব্দুল মোমেন তোমাকে প্রাথমিকভাবে কাজকর্মে সহযোগিতা করবে। ভোলায় পৌঁছার পর ওখানে অফিস স্থাপনের জন্য একটা ভবন ভাড়া নেবে। রেডিও ইঞ্জিনিয়ার রবিউল ইসলাম আগামী সপ্তাহে ভোলা অফিসে ওয়্যারলেস সেট স্থাপন করার জন্য ভোলা যাবে। ঐ দিনই রফিক বরিশালে এসে পৌঁছানোর পর আমরা হাতিয়ায় আমার অসমাপ্ত কার্যক্রম নিয়ে আলাপ আলোচনা করলাম। রফিক বললো যে হাতিয়াতে সিপিপি-র ভিত্তিপ্রস্তর অত্যন্ত সুদৃঢ় হওয়ায় সেখানকার পরবর্তী কাজগুলো সম্পাদনে আমার কোন বেগ পেতে হয়নি। আমরা অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে বরিশাল অফিসের চার্জ হস্তান্তর করলাম।

পরেরদিন লঞ্চে চেপে আমি ভোলার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। লঞ্চ চলছে। ক্যাবিনে বসা একজন দীর্ঘদেহী প্রাণবন্ত ব্যক্তির প্রতি বার বার আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হচ্ছিলো। লঞ্চের অনেক মানুষ তাঁকে সমীহ করে কথা বলছিলেন। আমার পাশে বসা যাত্রীটি বললেন যে ওনার নাম বশরত উল্লাহ চৌধুরী এবং উনি একজন স্বনামধন্য কন্ট্রাকটর। হঠাৎ আমার মনে পড়লো যে হেগস্ট্রম একদিন এই বশরত উল্লাহ চৌধুরীর প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন যে তিনি বঙ্গবন্ধুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং মনপুরাতে কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা যেনো তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখি।

আমি উৎসাহী হয়ে এক পর্যায়ে তাঁর সাথে পরিচিত হলাম। আমি আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মনপুরাতে আমি কাজ করেছি। মনপুরার সিপিপি কর্মকর্তা হিসাবে আপনার ভাই হাফিজুল্লাহ চৌধুরী কাজ করছেন। এখন ভোলায় আমাদের আঞ্চলিক অফিস স্থাপিত হতে যাচ্ছে এবং আমি ভোলার সবকটি থানাসহ মনপুরার উন্নয়নেও কাজ করবো। সিপিপি-র প্রতিষ্ঠাতা মিঃ হেগস্ট্রমের নিকট থেকে আমি আপনার কথা পূর্বেই শুনেছি। আজ আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে আনন্দিত হলাম।

বশরত উল্যাহ চৌধুরী বললেন, আপনার পরিচয় জেনে খুশী হলাম। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করছেন জেনে আরও খুশী হলাম। আমি শুনেছি যে হাফিজুল্লাহ একটা চাকুরিতে যোগদান করেছে কিন্তু সেটা যে আপনাদের সাথে তা জানতাম না। বিগত ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে মনপুরাতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুসহ যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা আমি যেমন পূর্বে কখনো দেখিনি তেমনি আমার বাপ-দাদারাও তাঁদের জীবদ্দশায় কখনো দেখেননি। আমার নিজের অনেক সহায় সম্পত্তি ঐ ঝড়ে বিনষ্ট হয়েছে। এখন যে কাজটা আপনারা করছেন তা সত্যিই আমাকে আশ্বস্ত করছে। আসলে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা থাকলে ক্ষয়ক্ষতিটা এতটা হতো না। তা ভোলাতে আপনার অফিসটা কোথায়?

আমি বললাম, ভোলাতে অফিস স্থাপন করার জন্য আমি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি তবে কোথায় অফিস স্থাপন করবো তা ঠিক হয়নি। এখন খুঁজে দেখতে হবে কোথায় অফিস করা যায়। বশরত উল্লাহ চৌধুরী বললেন, ভোলাতে আমার একটা বাড়ি রয়েছে, বলতে গেলে ওটা খালি পড়ে রয়েছে। আপনার পছন্দ হলে আমার বাড়িতে অফিস স্থাপন করতে পারেন।

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললাম, আপনার স্বতঃপ্রণোদিত প্রস্তাবের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে ওখানে ওয়্যারলেস এ্যান্টেনা স্থাপন করতে হবে বিধায় জায়গাটার অবস্থান দেখা প্রয়োজন। যদি আপনার অসুবিধা না থাকে তবে আমরা আজই বাড়িটা একবার দেখে আসতে পারি।

বশরতউল্লা চৌধুরী বললেন, কোন অসুবিধা নেই, আমার সাথে লোক রয়েছে, তারা আপনাকে আজই বাড়িটা দেখাতে পারবে।

ভোলা পৌঁছানোর পর ভোলা শহরের খালপাড়ে লঞ্চঘাট সংলগ্ন স্থানে বাড়িটি দেখলাম এবং বাড়িটি আমার পছন্দ হলো। সন্ধ্যার সময় বশরত উল্লাহ চৌধুরীর সাথে দেখা করে বাড়ির ভাড়া প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বললেন, আপনি ওখানে অফিস করুন এবং নিজেও একটা কক্ষে অবস্থান করুন তবে কোন ভাড়া দিতে হবে না। উপকূলীয় এলাকার ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মকান্ডে আপনাদের সাথে আমিও না হয় কিছুটা শরিক হলাম।

এরপর ঐ বাড়িতেই সিপিপি ভোলা আঞ্চলিক অফিস স্থাপিত হলো। চরফ্যাসন, লালমোহন, তজুমুদ্দিন, দৌলতখান এবং মনপুরা থানাসমূহ ভোলা আঞ্চলিক

অফিসের আওতাধীন ছিল। বিভিন্ন চরাঞ্চলে সফর করার জন্য ভোলা অফিসে একটি শক্তিশালী স্পিডবোট দেওয়া হলো এবং হাতিয়াতে ব্যবহৃত মিৎসুবিসি জীপটি ভোলা অফিসের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হলো। জীপ থাকায় বিভিন্ন থানায় সফর করাটা আমার জন্য সহজতর হলো। সপ্তাহে পাঁচদিনই বিভিন্ন থানার সাংগঠনিক কাজে আমাকে সফর করতে হতো।

এর মধ্যে একদিন এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটলো। স্থানীয় কতিপয় যুবক তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবসার কাজের জন্য আমার অফিসে এসে স্পীডবোট ব্যবহারের জন্য আবেদন করলো। আমি তাঁদেরকে বুঝিয়ে বললাম যে ব্যক্তিগত ব্যবসাজনিত কোন কাজের জন্য আমার দপ্তরের স্পীডবোট ব্যবহার করার কোন বিধান নাই। মানবতার সেবামূলক কোন জরুরি প্রয়োজন যদি দেখা দেয় তবে সেই পরিস্থিতিতে স্পীডবোট দিতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। কথাবার্তার এক পর্যায়ে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং স্পীডবোট না দিলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হবে বলে আমাকে শাসালো।

কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলাম। এরপর ঐ যুবকেরা আমার নামে নানাবিধ কুৎসা রটনা করতে থাকলো। একদিন একজনতো রাস্তার মধ্যে আমাকে দেখে নেবে বলে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকলো। পরপর কয়েকদিন একই ধরনের ঘটনা ঘটলো। মনটা ক্রমান্বয়ে বিষন্ন হয়ে উঠলো। ওদিকে আমার পূর্ববর্তী চাকুরিক্ষেত্র ভি জেড পি এর ব্রীজ নির্মাণ কোম্পানী আমাকে চাকুরিতে যোগদানের জন্য তাগাদা দিচ্ছিলো। চিন্তাভাবনা করে স্থির করলাম যে কর্মসূচির চাকুরি থেকে ইস্তফা দেব। আমি হেগস্ট্রমকে বিষয়টি জানিয়ে বললাম যে এভাবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারবো না।

ভোলা থেকে ঢাকা গমন

পরদিন হেগস্ট্রম ওয়্যারলেসে আমাকে ভোলা অফিস গুটিয়ে ফেলার জন্য বললেন। ভোলা দপ্তরের মালামালসহ চার্জ লালমোহনের কর্মকর্তা আবুল মোমেনের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে সরাসরি ঢাকা অফিসে রিপোর্ট করতে বললেন। হেগস্ট্রমের নির্দেশনা মতে পরদিনই আমি ভোলা অফিস ছেড়ে দিয়ে লালমোহনের কর্মকর্তার নিকট চার্জ বুঝিয়ে দিলাম এবং দুদিন পর ঢাকা অফিসে রিপোর্ট করলাম।

আমি সরাসরি হেগস্ট্রমের রুমে ঢুকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললাম, আমি চাকুরি থেকে ইস্তফা দিতে চাই কারণ আমার পূর্ববর্তী চাকুরির ক্ষেত্র থেকে আমাকে তাদের ওখানে যোগদানের জন্য তাগাদা দিচ্ছে।

হেগস্ট্রম আমার দিকে তাঁকিয়ে সামনের চেয়ারটায় বসার ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, কিন্তু আমরাতো অন্যরকম ভাবছি। এতোদিন তুমি কাজ করেছো এবং আমরাও সেটা দেখেছি। এই প্রথমবারের মতো তোমার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে তুমি সত্যিই ভালভাবে কাজ করছো। এই সত্যটাকে সামনে রেখে আমরা তোমাকে প্রমোশন দিয়ে দিয়েছি। এখন থেকে তুমি সিপিপি-র কন্ট্রোল রুম অফিসার হিসাবে ঢাকায় তোমার দায়িত্ব পালন করবে। এই ধর তোমার নতুন দায়িত্ব সংক্রান্ত পত্র।

হেগস্ট্রমের কথা শোনার পর আমি তাঁর দেওয়া পত্রটি হাতে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ারেই স্থিত হয়ে রইলাম। খাম থেকে পত্রটি বের করে পড়ার কোন ইচ্ছাই হলো না। আমার দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়লো।

হেগস্ট্রম তাঁর চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, শুধু তোমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই কিছু মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য মানবিক আইনগুলো ভেঙে ফেলছে। কিন্তু আমরা যারা মানবতার সেবা করবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি তাঁরা কি ওদের ঐ অনৈতিক ইচ্ছার কাছে হার মানবো? না, তা আমরা কখনোই করবো না। তুমি অনৈতিক কাজের জন্য স্পীডবোট দাওনি, সঠিক কাজটিই করেছো, কারণ তুমি জান যে তুমি ওটা দিতে পার না। ঐ পরিস্থিতিতে তুমি যদি স্পীডবোটটি দিয়ে দিতে তবে আমি তোমাকে

সমর্থন করতাম না বরঞ্চ তোমার উপর আমার আস্থা হারাতাম। এখন তুমি বাসায় যাও, বিশ্রাম করো এবং কাল তোমার ছুটি।

আমি হেগস্ট্রমকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেড়িয়ে এলাম। হেগস্ট্রমের অর্ন্তদৃষ্টি, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করার অসামান্য দক্ষতা দেখে আবারও বিস্মিত হলাম এবং তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। আমার মনের গভীরে জমে থাকা সমস্ত রাগ ও উষ্মা যেনো নিমিষের মধ্যেই দূরীভূত হলো। চাকুরি থেকে ইস্তফা দেওয়া ইচ্ছেটা আর থাকলো না।

মনে মনে ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে চাকুরি জীবনের সূচনালগ্নে এমন একজন দুরন্ত কৌশলী ও সুন্দর মনের মানুষের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ হলো যিনি শুধু ভাল করতে জানেন এবং ভালবাসতেও জানেন।

কুমিল্লা বার্ডে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিপিপি-র প্রথম পরিচালক হিসাবে জনাব সাইদুর রহমান যোগদান করলেন। ঐ সমসাময়িক সময়ে সিপিপি কর্মকর্তাদের জন্য একটি প্যাকেজ প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে মিঃ হেগস্ট্রম ও জনাব সাইদুর রহমান কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন এ্যাকাডেমিতে সপ্তাহব্যাপী একটি কোর্সের আয়োজন করেন। সুচিন্তিত ও সমন্বিতভাবে বিন্যস্ত ঐ বস্তুনিষ্ঠ কোর্সটি এতই নিবিড় ও প্রগাঢ় ছিল যে বেশীরভাগ কর্মকর্তাই সিপিপি-র কর্মক্ষেত্রে একটা বিশেষ ও শক্ত ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। কুমিল্লাতে অনুষ্ঠিত ঐ প্রশিক্ষণে তদানীন্তন লীগ অব রেড ক্রস এণ্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ-এর চীফ ডেলিগেট সেভন লাম্পেল একটি দিন কর্মকর্তাদের সাথে থেকে সবাইকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। ঐ প্রশিক্ষণের সময় হেগস্ট্রমও কয়েকদিন কুমিল্লায় অবস্থান করেছিলেন ফলে কর্মকর্তারা হেগস্ট্রমের সাথে অন্তরঙ্গ ভাব বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি বাংলা ভাষা জানতেন না কিন্তু প্রায়ই আমরা তাঁকে ক্লাশে উপস্থিত দেখতে পেতাম। আমর মনে হতো যে তিনি প্রশিক্ষণের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা গভীরভাবে তদারকি করতেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কে কিভাবে সাড়া দিচ্ছে তা উপভোগ ও মূল্যায়ন করতেন।

সিপিপি-র দীর্ঘ স্থায়িত্বের ব্যবস্থা

সদ্য প্রতিষ্ঠিত সিপিপি-র সাংগঠনিক সকল কাজ সম্পন্ন করার পর হেগস্ট্রম এর দীর্ঘ স্থায়িত্বের বিষয়ে পূর্ণভাবে মনোযোগী হলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের জানমাল রক্ষার্থে নিয়োজিত সিপিপি-র মতো একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংগঠনের দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে বিশ্ব ব্যাংক, আমেরিকান এ্যামব্যাসি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হলো কিন্তু কোন সংস্থাই দুই বা তিন বছরের বেশী অর্থায়নের নিশ্চয়তা দিতে পারলো না। লীগ অব রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ সিপিপিকে অবশ্যই চলমান রাখার চেষ্টা করবে কিন্তু দীর্ঘদিন অবশ্যই নয়। এমতাবস্থায় হেগস্ট্রম অনুধাবন করলেন যে বাংলাদেশ সরকারকে যদি কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা বোঝানো সম্ভব হয় তবে সরকারই কেবল এর দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হেগস্ট্রম ও জনাব সাইদুর রহমান সরকারের প্রশাসন ও নীতি নির্ধারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। এর মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব সামসুল হক, মন্ত্রণালয়ের সচিব এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ খান, আইআরডিপি-র মহাপরিচালক এম মোকাম্মেল হক প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা টেকসই সিপিপি-র প্রস্তাবনা সমর্থন করলেন। হেগস্ট্রমের অমায়িক ব্যবহার, বন্ধুত্বসুলভ আচরণ ও সিপিপি-কে টেকসই করার প্রাণান্ত চেষ্টার জন্য তিনি প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের সকলের আস্থাভাজন হয়ে উঠলেন। ঐ সময়ে ১২নং ইস্কাটন রোডে সিপিপি দপ্তরে কর্মকর্তাদের এক সম্মেলনে আইআরডিপি-র মহাপরিচালক এম মোকাম্মেল হক একটি অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলন। তাঁর বাড়ি ভোলার চর ফ্যাসনে হওয়ায় ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের ভূক্তভোগী তিনিও ছিলেন। মানবতার সেবা ও প্রেরণার কথা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি সবার হৃদয় ছুঁয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি হেগস্ট্রমকে আমাদের একজন দরদী বন্ধু হিসাবে অবহিত করেছিলেন।

চর হেয়ার সম্মেলন

সিপিপি-র দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও টেকসই করার পরবর্তী কৌশল হিসাবে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার বড়বাইজদিয়া ইউনিয়নের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ‘চর হেয়ারে’ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের একটি বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠান করা হয়। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ঐ সমাবেশে গলাচিপা থানার ১২ শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক যোগদান করেন।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি স্থায়ীকরণ ও এর নিরবচ্ছিন্ন পরিচালনা নিশ্চিত রাখার অংশ হিসাবেই মূলত হেগস্ট্রম ‘চর হেয়ারে’ সম্মেলনের আয়োজন করলেন। এই সম্মেলন আয়োজনে গলাচিপা উপজেলার রতনদি তালতলী ইউনিয়নের মোজাম্মেল হকের প্রভূত অবদান ছিল। তিনি স্থানীয় পর্যায়ের ১২ শত স্বেচ্ছাসেবক সংগঠিত করেন, তাঁদেরকে চর হেয়ারে স্থানান্তরের ব্যবস্থাসহ খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন।

বাসস্থানের জন্য ছোট বড় মিলিয়ে শতাধিক তাঁবু স্থাপন করেন এবং একই সাথে একটা বড় ষ্টেজ ও একটি প্যান্ডেল নির্মাণ করেন। ছোট ছোট অনেকগুলো জেনারেটর চালিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হলো। বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা সিপিপি-র দুটি ল্যান্ডিং ক্রাফ্‌ট ও আধুনিক রাডার সম্বলিত জাপানিজ ক্রুবোট চর হেয়ারে স্বেচ্ছাসেবক ও দ্রব্য সামগ্রী পরিবহণের কাজে ন্যস্ত হলো। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন কাজ করার জন্য এক ডজন শক্তিশালী স্পীডবোট সার্বক্ষণিকভাবে চর হেয়ারে রাখা হলো। চর হেয়ার সম্মেলনে প্রভূত অবদান রাখার জন্য মোজাম্মেল হক পরবর্তীতে স্বল্প সময়ের জন্য সিপিপি-র একজন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

আমি ঐ সময়টাতে সাইদুর রহমানের সাথে কাজ করছিলাম। আমরা জাপানিজ ক্রুবোট নিয়ে রাঙ্গাবালী, মৌডুবী ও চর হেয়ার যাতায়াত করছিলাম এবং সকল ধরনের লজিষ্টিক সহায়তা তদারকি করছিলাম। আমি সম্মেলন শুরুর তিনদিন পূর্বে চর হেয়ারে স্থাপিত একটি তাঁবুতে অবস্থান নিলাম। আমার পাশেই সিপিপি-র এ্যাডমিনিস্ট্রেটর এমদাদ হোসেন ও অফিস সেক্রেটারী মোঃ হোসেন অবস্থান

করছিলেন। আমরা পূর্বেই শুনেছিলাম যে চর হেয়ারের পাঁচ-সাত মাইল দক্ষিণে একটা বিশালাকায় গ্রীক জাহাজ বালুচরে আটকে আছে। আসলে দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঐ সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু জাহাজে অবস্থানরত বাঙ্গালী পথ-প্রদর্শকরা ভুল দিক নির্দেশনা দিয়ে জাহাজটিকে চরে আটকে দিয়েছিল। পাকিস্তানি সৈন্য ও জাহাজের গ্রীক ক্রুরা পরবর্তী দু-তিনদিনের মধ্যে হেলিকপ্টার যোগে পরিত্রাণ পেলেও সৈন্যরা বাঙ্গালী দিক-নির্দেশকদেরকে গুলি করে জাহাজের উপর ফেলে রেখে যায়। আমি পরিত্যক্ত ঐ জাহাজটি দেখার জন্য উৎসুক ছিলাম। আমরা শুনেছিলাম যে অনেক নৌকা-ট্রলার জাহাজটিকে ঘিরে অবস্থান করছে এবং জাহাজের মালামাল লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। আমার উপর্যুপরি অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জাহাজটি দেখতে যাওয়ার জন্য এমদাদ হোসেন রাজী হলেন। মোঃ হোসেনও আমাদের সাথে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সেদিন দুপুরের পর একটা স্পীডবোট নিয়ে আমরা চর হেয়ার থেকে রওয়ানা হলাম। কয়েক মাইল যাওয়ার পর জাহাজটা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। যতই কাছে এগিয়ে যাচ্ছি জাহাজের আকার ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানি কম হওয়ায় অতি সন্তর্পণে স্পীডবোট চালাতে হচ্ছে। আমরা যখন জাহাজের একশত গজের মধ্যে চলে এলাম তখন পাহাড়ের মতো উঁচু জাহাজটা দেখে বিমোহিত হলাম। সমুদ্রগামী বিশাল জাহাজটা চরে আটকে গেছে এবং আর কোনদিন ওটা ডুবো চর থেকে বাইরে যেতে পারবে না। জনমানবহীন অগভীর সমুদ্রে জাহাজের চারপাশে শত শত ট্রলার দেখে এমদাম হোসেন ও মোঃ হোসেন দুজনাই ভয় পেয়ে গেলেন। আমাকে এখান থেকে ফিরে যেতে বললেন।

আমি বললাম যে এতো কাছে এসে জাহাজে না উঠে আমি যাব না। এমন সময় পানি কম হওয়ায় স্পীডবোট মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিলো এবং দুলছিল। দুজনার ভয়ার্ত অবস্থা দেখেও আমি বোট চালিয়ে যেতে থাকলাম।

এবার এমদাদ হোসেন উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, আই অর্ডার ইউ হারুন, গেট ব্যাক।

এ সময়ে মোঃ হোসেনের ভিজা প্যান্ট দেখে বুঝলাম যে অবস্থা ভাল না এবং আর সামনে এগুনো যাবে না। অবশ্য ছিটকে আসা পানিতেও প্যান্ট ভিজতে







চর হেয়ার সম্মেলন

পারে তবে তা নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। আমি বোট ঘুরিয়ে দিলাম এবং চর হেয়ারের দিকে চলতে শুরু করলাম।

এবার এমদাদ হোসেন কিছুটা স্বস্তির সাথে বললেন, আসলে আমার কাছে সম্মেলনের খরচ মেটানোর জন্য অনেক ক্যাশ টাকা রয়েছে। এই টাকা নিয়ে অজানা একটা জায়গায় ট্রলার মাঝিদের রাজত্বে আমি আমাদেরকে নিরাপদ ভাবিনি বলেই তোমাকে ফিরে যেতে বলেছি। কিছু মনে কোরোনা হারুন। সম্মেলন শেষে আবার না হয় একবার এখানে আসা যাবে।

এমদাদ হোসেনকে তাঁর ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তে প্রতি সম্মান জানিয়ে বললাম, জাহাজটি সরেজমিনে দেখার যে সুযোগ আমরা হাতছাড়া করলাম তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তবে জাহাজটার অতি সন্নিকটে যে যেতে পেরেছি সেটাই বা কম কিসের। এমন পরিস্থিতিতে পরবর্তী কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষন্ন মনে চর হেয়ারে ফিরে এলাম।

চর হেয়ার সম্মেলনের মূল অনুষ্ঠানের আগের রাতে স্বেচ্ছাসেবকদের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল। বিদ্যুতের আলোতে ঝলমল চারিদিক। এক পর্যায়ে একজন স্বেচ্ছাসেবক এক মৌলভী সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় ও কৌতুক করে তাঁর পারদর্শিতা দেখাচ্ছিলেন। ষ্টেজের সামনে ১২ শত স্বেচ্ছাসেবক প্যান্ডেলের ভেতর ও বাইরে অবস্থান নিয়ে তা উপভোগ করছিলেন।

প্যান্ডেলের পাশেই কয়েকটি ড্রামে হেলিকপ্টারের জ্বালানী সংরক্ষণ করা ছিল। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ঐ ড্রামের সন্নিকটে বসে সিগারেট টানছিলো এবং অনুষ্ঠান দেখছিলো। ঐ কৌতুকাভিনয় শেষ হওয়ার পূর্বেই হঠাৎ করে সিগারেটের আগুন ড্রাম থেকে চুঁইয়ে পড়া জ্বালানীকে প্রজ্জলিত করলো। আগুন দেখতে পেয়ে সবাই দৌড়াতে শুরু করলো। আমি সাগরের দিকে ছুটতে শুরু করলাম।

পথিমধ্যে একটা ছোট জেনারেটর দেখতে পেয়ে ওটাকে বন্ধ করে হাতে তুলে নিয়ে পুনরায় দৌড়াতে শুরু করলাম। অন্যেরা কে কি ভাবে রয়েছেন তা দেখার সময় এটা নয়। সবাই শুধু দৌড়াচ্ছে এবং প্রজ্জলিত তেলের ড্রাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই যখন অবস্থা তখন বিকট শব্দ করে একটি ড্রাম বিস্ফোরিত হলো। খাড়া অবস্থায় থাকা ড্রামটির উপরের ঢাকনা বিচ্ছিন্ন হয়ে আগুনের গোলা অন্তত একশত ফুট উপরে উঠে গেল। আমি পেছন দিক থেকে একটা প্রবল চাপ অনুভব







চর হেয়ার সম্মেলন

করলাম এবং জেনারেটরটি নিয়ে সটান বালুর উপর হয়ে পড়ে গেলাম। চেয়ে দেখলাম সামনেই সাগরের পানি। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বেশীরভাগ জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় ড্রামটাও বিস্ফোরিত হলো, এবারও আগুন উর্ধ্বমূখী হয়েই উপরে উঠে গেল। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ভাইয়েরা দৌড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। চরের চারিদিকটা জ্বালানীর পোড়া গন্ধে ছেয়ে গেলো। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে কারণ দুটো ড্রামই খাড়া থাকায় বিস্ফোরিত আগুন উপরের দিকে উত্থিত হোল, ওগুলো যদি কাৎ অবস্থায় থাকতো তবে নির্ঘাত স্বেচ্ছাসেবকেরা আঘাতপ্রাপ্ত হতো। আগুন অন্য ড্রামগুলোতে না ছড়িয়ে নিভে গেল। আমরা সবাই ষ্টেজের কাছে ফিরে গেলাম এবং সবাই মিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক করে নিলাম। ষ্টেজের বাতি পুনরায় জ্বালানোর পর সাইদুর রহমান এই বলে ধূমপায়ীদেরকে ভর্ৎসনা করলেন যে নিষেধ সত্ত্বেও কেন তারা জ্বালানীর ড্রামের পাশে বসে ধূমপান করলেন। তিনি তাঁবু ও ষ্টেজের আশেপাশে ধূমপান না করার জন্য সবাইকে পুনরায় সতর্ক করলেন। হেগস্ট্রম মোজাম্মেল হককে ডেকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা লোকের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দিলেন।

চর হেয়ার সম্মেলন তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো এবং ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে তদানীন্তন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব শামসুল হক হেলিকপ্টারযাগে চর হেয়ারে আগমন করলেন। তাঁর সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ ছিলেন। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের হেড অব ডেলিগেশন মিঃ সেভন ল্যাম্পেল, বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির মহাসচিব ফখরুল ইসলাম এবং অন্যান্য স্থানীয় অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করলেন। সিপিপি-র পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান চর হেয়ার সম্মেলনের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করলেন। চর হেয়ারে আগমনের পূর্বে অতিথিবৃন্দ বড়বাইজদিয়া ইউনিয়নের মৌডুবিতে সদ্য নির্মিত মুজিব কিল্লার উপর একটি ঘূর্ণিঝড় মাঠ মহড়া উপভোগ করলেন। ঐ মহড়াটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও ওটাই ছিল সিপিপি-র সর্বপ্রথম মাঠ মহড়া। সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় লোকজন মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। তিনটি হেলিকপ্টার একসাথে মৌডুবিতে আগমন, মহড়ানুষ্ঠান ও পরবর্তীতে হেলিকপ্টাগুলো চর হেয়ারের দিকে উড্ডয়নসহ সমস্ত অনুষ্ঠানটি এলাকায় একটা সাড়া ফেলে দিল। সিপিপি কর্মকর্তা রফিকুল আলম ঐ মাঠ মহড়াটি পরিচালনা







চর হেয়ার সম্মেলন

করলেন। ঐদিন হাজার হাজার মানুষ মৌডুবিতে অনুষ্ঠান দেখতে জড়ো হলো।

আগত অতিথিবৃন্দ চর হেয়ারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করে মোহিত হলেন। দিগন্ত বিস্তৃত সুনীল আকাশের নিচে নীল জলরাশি বেষ্টিত নৈসর্গিক ছোট্ট একটি দ্বীপ 'চর হেয়ারে' সিপিপি-র ১২ শত স্বেচ্ছাসেবক যখন দাঁড়িয়ে দুই হাত প্রলম্বিত করে নিনাদ গর্জনে বলে উঠলো, "আমরা প্রস্তুত - মানুষকে বাচাঁবো - আমরা বাচঁবো, ভয় করি না সাইক্লোনে - আমরা আছি উপকূলে" তখন তাঁদের প্রত্যয় ও দৃঢ়তা দেখে সকল অতিথিবৃন্দ অভূতপূর্ব এক আনন্দে অভিভূত হলেন এবং অবাক বিষ্ময়ে তাঁদের দিকে অপলক তাঁকিয়ে থাকলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের কণ্ঠ নিসৃত সেই সুদৃঢ় প্রত্যয়ধ্বনি চর হেয়ারের চারিদিক বারংবার প্রকম্পিত করতে থাকলো।

প্রধান অতিথি তদানীন্তন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী শামসুল হক নব প্রতিষ্ঠিত সিপিপি-র অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে জানিয়ে তাঁর বক্তৃতায় বললেন যে ঘূর্ণিঝড়ের মতো বিপুল ধ্বংসক্ষমতা সম্পন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলীয় এলাকার জনমানুষের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা তথা নিরাপত্তার জন্য সিপিপি একটি আদর্শ সংগঠন। বিগত বছরের ১২ নভেম্বরে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় এই উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হেনে জান-মালের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছিল। এ কথা অনস্বীকার্য যে ঐ সময়ে সিপিপি-র মতো একটি সংগঠন থাকলে এতবড় ক্ষতি নিশ্চয়ই আমাদের হতোনা। সিপিপি গঠন করায় আমি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে সিপিপি-র রূপকার মিঃ ক্ল্যাস হেগস্ট্রমকেও আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

এরপর লীগ অব রেড ক্রস এণ্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি মিঃ সেভন ল্যাম্পেল, বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির মহাসচিব জনাব ফকরুল হোসেন এবং উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ তাঁদের ভাষণে সিপিপি-র ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করেন।

সফলতার এক আলোকবর্তিকা নিয়ে শেষ হলো চর হেয়ার সম্মেলন। এ কথা অনস্বীকার্য যে চর হেয়ার সম্মেলন সিপিপি-র ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক যা সিপিপি-কে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হোল। এই সম্মেলনের অভিজ্ঞতা এবং অঙ্গীকার নিয়ে সিপিপিকে দীর্ঘমেয়াদী একটি প্রতিষ্ঠান

হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু হলো। তবে সিপিপি-র দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করলেও সরকারী অর্থ কি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন রেড ক্রসকে দেয়া যেতে পারে তা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হলো।

এজন্য প্রধানমন্ত্রীর সুবিবেচনা প্রসূত অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে বলে বিজ্ঞজনেরা অভিমত পোষণ করলেন। পাবনার এমপি জনাব আব্দুর রব বগা মিঞার মাধ্যমে সরকারী দলের উচ্চ পর্যায়ে এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ কিছুদিন লবিং করার পর এ বিষয়টি যখন বঙ্গবন্ধুর কাছে উপস্থাপন করা হলো তখনই তিনি উপলব্ধি করলেন যে উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী কোটি মানুষের জানমাল রক্ষার্থে যে সংগঠন কাজ করছে, সেটির বিদেশী কোন সংস্থার অনিশ্চিত আর্থিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল থাকা উচিৎ নয়। ১৯৭৩ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে বঙ্গবন্ধু একটি যুগান্তকারী প্রস্তাবনায় এই মর্মে লিখিত অনুমোদন দিলেন যে সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের যাবতীয় খরচ বাংলাদেশ সরকার বহন করবে এবং এই সংগঠনটি বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। কর্মসূচি পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধুর অনুমোদনক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে পলিসি কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ইমপ্লিমেন্টেশন বোর্ড গঠিত হলো। সে দিন করুণাময় আল্লাহতালার অসীম রহমতে উপকূলীয় লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তার জন্য একটা টেকসই সিপিপি-র গোড়াপত্তন হলো।

আশির্বাদপুষ্ট ও টেকসই সিপিপি-র অগ্রযাত্রা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আশির্বাদপুষ্ট সিপিপি পূর্ণ উদ্যোমে কর্মতৎপরতা শুরু করলো। সিপিপি-র কার্যক্রম চ্যালেঞ্জিং হলেও সাফল্যের পাল্লাটা সবসময়ই ভারী হয়েই দেখা দিল। কর্মসূচির পরিচালকের নেতৃত্বে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নিয়ে সিপিপি-র সাংগঠনিক কার্যক্রম আরো গতিশীল করা হলো। স্বেচ্ছাসেবকদের একনিষ্ঠতায় একের পর এক প্রবল থেকে অতি-প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্কটকালে আগাম সতর্ক সংকেত প্রদান ও আপামর মানুষের জানমাল রক্ষার্থে যে সাফল্য অর্জিত হতে থাকলো তা অপূর্ব এবং অভূতপূর্ব। ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকলো। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলেই সিপিপি-র ওয়্যারলেস মারফৎ তা মুহর্তের মধ্যেই স্বেচ্ছাসেবকদের নিকট পৌঁছে গেল এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা তাৎক্ষণিকভাবে সেই সংবাদ এলাকার জনগণকে তাঁদের দ্বারগোড়ায় গিয়ে জানিয়ে দিলো। আপামর মানুষ যখন জানতে পারলো যে একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে, এর গতিবিধি কোনদিকে, কখন এটি আঘাত হানতে পারে এবং কখন নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে তখন আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রস্তুতিমূলক একটা স্পষ্ট ছক তাঁরা তৈরী করতে সমর্থ হলো। সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের আগাম সতর্কবার্তার মাধ্যমে কি করতে হবে তা তাঁরা নিজেরাই অতি সহজেই ঠিক করে নিতে পারলো।

সিপিপি প্রতিষ্ঠার ফলে উপকূলীয় মানুষের মনোবল বহু গুণে বৃদ্ধি পেলো। সবাই প্রত্যক্ষ করলো যে, এখন আর তারা একা নয়, বাড়ীর পাশেই রেড ক্রস অংকিত বিশেষ পোশাক পরিহিত এবং প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকগণ রয়েছেন যারা ঘূর্ণিঝড়ের মতো মহাবিপদের সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে, সিপিপি-র সৃষ্টির ফলে উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে একটা অসাধারণ মূল্যবোধ সংযোজিত হলো এবং একটা নীরব বিপ্লব সাধিত হলো।

হেগস্ট্রমের সাথে কাশ্মীর গমন

মানব দরদী হেগস্ট্রম যে মিশন নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন তা তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ করলেন। মাত্র দুই বৎসর সময়ের মধ্যেই তিনি এমন একটি কঠিন কাজ সম্পাদন করতে সমর্থ হলেন। দুই বৎসর সময়কাল খুব বেশী বড় না হলেও এই সময়টার সামান্যতম অংশও তিনি অবহেলায় কাটাননি। আমি তাঁর অন্তরঙ্গ সাহচর্য পাওয়ায় অত্যন্ত নিকট থেকে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সিপিপি-র গোড়াপত্তন করার জন্য তাঁকে নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়টাতে উপকূলীয় এলাকা সফরকালে পাকিস্তানি সৈন্যদের সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে তিনি এগিয়ে গেছেন।

হেগস্ট্রমের স্ত্রী সন্তানেরা মাঝে মাঝে বাংলাদেশ এসেছেন তবে তাঁদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল যে তিনি পরিবারের সদস্যদরকে মোটেই কোন সময় দিচ্ছেন না। মহৎ ব্যক্তিবর্গ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং এভাবেই সাধনার মাধ্যমে তাঁরা শত সমস্যা অতিক্রম করে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে পরিতৃপ্ত হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিপিপি-কে অনুমোদন করার পর হেগস্ট্রমের চেহারাটাই পাল্টে গিয়েছিল। ঐ সময়টাতে মনে হতো যে এতদিন তিনি একটা পাহাড় ঘাড়ে তুলে চলছিলেন এবং এখন তিনি তা নামিয়ে দিতে পেরেছেন।

এমনতর অবস্থায় অফিসে একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, হারুন তুমিতো কখনো দেশের বাইরে যাওনি। তোমাকে যদি দেশের বাইরে যেতে বলা হয় তবে এই পৃথিবীর কোন দেশটি তুমি বেছে নেবে?

আমি মনে মনে ভাবলাম যে মিশরের কথা বলি, ওখানে পিরামিড রয়েছে যা দেখার সাধ আমার বহুদিনের। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম পৃথিবীর ভূসর্গ কাশ্মীরের কথা বললে কেমন হয়, ভারত অমাদের পার্শবর্তী দেশ ওখানে তাজমহল রয়েছে। আর কোন চিন্তাভাবনা না করেই বললাম, ভারতকেই বেছে নেবো বলে ভাবছি।

হেগস্ট্রম একটু হেসে বললেন, আমিতো ভেবেছিলাম তুমি ইউরোপ অথবা আমেরিকার কথা বলবে। ঠিক আছে, তোমার পাসপোর্ট না থাকলে অফিসের

চিঠি নিয়ে যাবে এবং কালকেই পাসপোর্ট অফিসে আবেদনপত্র জমা দেবে। তুমি আমাদের সাথে ভারত সফরে যাবে।

আমি বললাম এতো লোক থাকতে তুমি ভারত সফরে আমাকে সঙ্গী করছো কেন?

হেগস্ট্রম বললেন, তোমার এই প্রশ্নের জবাব পরে কোন সময় তোমাকে আমি দেবো।

পরদিন পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে আবেদনপত্র জমা দিলাম। দু সপ্তাহ পরই পাসপোর্ট হাতে পেলাম। এরই মধ্যে হেগস্ট্রম দেশের বাইরে যাবেন বলে সবাইকে জানালেন। যাবার পূর্বে কয়েকটা দিন তিনি ব্যস্ততায় কাটালেন।

১৯৭৩ সালের ৭ আগষ্ট হেগস্ট্রম ও তাঁর মিসেস এবং আমি ঢাকা বিমান বন্দর থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। দিল্লী পৌঁছে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস থেকে প্রেরিত গাড়ীতে চেপে হেগস্ট্রমের পরিচিত একটি রেষ্ট হাউজে উঠলাম। রেড ক্রসের ঐ গাড়ীটি কয়েকদিন হেগস্ট্রমের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।

পরদিন দিল্লীর কুতুব মিনার ও লাল কেল্লা দেখতে দেখতে সারাদিন কেটে গেলো। ৯ আগষ্ট অতি প্রত্যুষে তাজ এক্সপ্রেসে চেপে আমরা আগ্রা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। এটি একটি প্যাকেজ ট্যুর। সকাল দশটা নাগাদ আগ্রা পৌঁছলাম। সম্রাট শাহজাহানের অমর কীর্তি তাজমহল দেখে বিমোহিত হলাম। ফতেপুর সিক্রিতে সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভা অনুষ্ঠানের স্থানটি দেখলাম। নবরত্ন সভার রত্নদের মধ্যে আইনে আকবরীর রচয়িতা আবুল ফজল ও সঙ্গীতজ্ঞ মিঁয়া তানসেনের কথা স্মরণে আসায় অতীতবিধুরতায় মনটা উদাসীন হয়ে উঠলো। একইসাথে হেগস্ট্রমের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাবনত হলাম, কারণ তাঁর ইচ্ছাতেই আমি ভারতে আসতে পেরেছি এবং আমার স্বপ্ন জগতের এসব স্থাপনা অবলোকন করতে পারছি। এসব ঐতিহাসিক কীর্তিসমূহ পরিদর্শন শেষে দুপুরের পর ট্রেনে চেপে রাত আটটার মধ্যেই দিল্লী ফিরে আসলাম।

পরদিন সকালে দিল্লী এয়ারপোর্ট থেকে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। যতদূর মনে পড়ে দু ঘন্টার ফ্লাইটে দুপুর নাগাদ শ্রীনগর পৌঁছুলাম। শ্রীনগর নেমেই আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন টের পেলাম। হেগস্ট্রম বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললো, এখানে যেমনটি প্রাণ ভরে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারছি তা কিন্তু দিল্লীতে পারিনি।

কাশ্মীর রেড ক্রসের একটি জীপে চেপে এয়ারপোর্ট থেকে শ্রীনগর শহরের মধ্য দিয়ে ডাল লেকের পারে এসে পৌঁছুলাম। ওখানে অপেক্ষমান দুজন ব্যক্তি আমাদের মালামাল একটা শিকারায় অর্থাৎ ডাল লেকে চলাচলকারী ছোট নৌকায় তুলে দিল। আমরাও শিকারায় উঠলাম। শিকারাটি একশত গজ দূরে নোঙরকৃত একটা হাউজ বোটের পাশে গিয়ে ভিড়লো।

আমরা হাউজ বোটে উঠলাম। ডাল লেকের হাউজবোটটি অত্যন্ত মনোরম করে সাজানো। লেকের স্বচ্ছ পানি, মাঝ বরাবর এক খণ্ড সবুজ দ্বীপভূমির চারকোণে চারটি বৃক্ষ, ওটার নাম চারমিনার। বোটের সামনে বিস্তৃত পাহাড়। বোটে উঠেই মনটা জুড়িয়ে গেল। হাউজ বোটে তিনটি কক্ষ একেবার পরিপাটি করে সাজানো। এ ছাড়াও ড্রইং রুম ও ডাইনিং রুম তো রয়েছেই। রুমগুলো সব রংবেরংয়ের কাশ্মীরী কার্পেট দিয়ে মোড়া। কক্ষের দেয়ালগুলোও বিভিন্ন প্রকার এ্যান্টিকস দিয়ে সাজানো। বোটের ছাদে নানা রকমের আরাম কেদারা সাজানো রয়েছে যেখানে বসে প্রকৃতির অবারিত দৃশ্যাদি অবলোকন করা যায় অবলীলায়।

হাউজবোটের মালিক প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি ভাল ইংরেজী বলতে পারেন বিধায় অল্পক্ষণের মধ্যেই হেগস্ট্রমের সাথে তাঁর ভাব হয়ে গেল। ভদ্রলোক বললেন যে তিনি সৌদি আরবে রাজপরিবারে শেফ হিসাবে দীর্ঘদিন চাকুরি করেছেন এবং অবসরের পর জমানো অর্থ দিয়ে এই হাউজবোটটি নির্মাণ করেছেন এবং ব্যবসা করে যাচ্ছেন। হাউজবোটে আমাদের সম্মানার্থে একদিন তিনি ডিনারের আয়োজন করবেন বলে জানালেন। তিনি আরো জানালেন যে হাউজবোটে অবস্থান করাটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিধায় ধনী লোকেরাই এখানে অবস্থান করে তবে রাজনৈতিক কারণে ভ্রমণ পিপাসুরা এখানে সহজে আসতে পারছেনা, ফলে আমাদের ব্যবসা লাটে উঠার উপক্রম হয়েছে।

আমার জন্য একটা কক্ষ বরাদ্দ দিয়ে হেগস্ট্রম বললেন, তোমার স্বপ্নের কাশ্মীর, কেমন লাগছে? আমি বললাম, কেমন লাগছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না তবে এটুকু বলতে পারি যে ইউরোপ আমেরিকার কথা না বলে কাশ্মীর আসতে চেয়ে আমি মোটেই কোন ভুল করিনি। আমার কল্পনার চেয়েও ঢের বেশী সুন্দর এই কাশ্মীর। পৃথিবীতে এমন মনোরম জায়গা যে রয়েছে তা এখানে না আসলে বুঝতেই পারতাম না।

হেগস্ট্রম বললেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে তোমাকে তোমার প্রার্থিত পছন্দের একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছি।

আমি হেগস্ট্রমকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আমার প্রতি তোমার এই অবারিত স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা আমি কোনদিন ভুলবো না।

আমরা চারদিন হাউজবোটে অবস্থান করলাম। অবশ্য এর মধ্যে টুরিষ্ট গাড়ীতে চেপে সোন্‌মার্গ ও গুলমার্গ ভ্রমণ করে এলাম। ওখানে পাহাড়ের উপর জমাটবাঁধা বরফ দেখতে পেলাম যা আগে কখনো দেখিনি। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর আমরা তিনজন বোটের ছাদের উপর বসে অধিক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করেই কাটিয়েছি। রাতের স্বচ্ছ আকাশে অগণিত সমুজ্জ্বল তারকারাজী দেখতাম আর হেগস্ট্রম ও মিসেস হেগস্ট্রমের সাথে কথা বলতাম। এখানেও কথার মধ্যে সিপিপি প্রসঙ্গ বার বার এসে যেতো।

একদিন রাতে মিসেস হেগস্ট্রম দুষ্টমী করে বললেন, বিগত দুটি বছর বাংলাদেশে শুধু সিপিপি-র কথাই তোমার কাছ থেকে শুনেছি, এবার কাশ্মীরে বেড়াতে এসেও তোমরা সিপিপি-র কথাই বলছো, সিপিপি এমন কি জিনিস যার কথা ফুরোতে চায় না?

হেগষ্টম কিছুটা ভাবগম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন, যদি বলি সিপিপি একটি আশীর্বাদ, যদি বলি লক্ষ প্রাণের আকুতি ও অনুভূতির মোহনার নাম সিপিপি, যদি বলি মানবতার মখমলে জড়িত একটি প্রেরণার নাম সিপিপি, যদি বলি একটি অপার্থিব দানের নাম সিপিপি তবে তুমি কি তা বিশ্বাস করবে?

মিসেস হেগস্ট্রম হা করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন, আমি জানি সিপিপি-কে তুমি কতটা ভালবাস। তোমার সাথে দীর্ঘ সংসার জীবনে আমি দেখেছি যে তুমি কতটা সৃষ্টিধর্মী মানুষ। বিগত দুটি বছরে তুমি আমাকে বলতে গেলে কোন সময়ই দাওনি কিন্তু তাতে আমি অখুশী নই। তবে মাঝে মধ্যে সত্য কথাগুলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ থেকে বেড়িয়ে আসে। তুমি রাগ করোনা।

হেগস্ট্রম তারকালোকে ছেয়ে থাকা আবছা আলো অন্ধকারের দেয়াল পেরিয়ে দূরে পাহাড়ের গায়ে কোন প্রগৈতিহাসিক শিলালিপির মর্ম ভেদ করছেন বলে মনে হলো। শীতল হিমেল হাওয়া মৃদুমন্দ তালে বয়ে যেতে থাকলো।

হঠাৎ উদাসীনতা ঝেড়ে ফেলে নড়েচড়ে বসে হেগস্ট্রম বললেন, জীবনেতো অনেক ভাল কাজ করেছি, অনেক সৃষ্টিময়তা নিয়ে উল্লাস করেছি তবে ওগুলোতে কোন আনন্দ খুঁজে পাইনি। বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক কাজটা যখন আমার উপর অর্পণ করা হয় তখন ভেবেছিলাম যে এই কাজটাও অন্যান্য আর দশটা কাজের অনুরূপই হবে। কিন্তু বাংলাদেশে গিয়ে এতো মানুষের প্রাণহানী ও বিধ্বস্ত উপকূলভূমি দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। ইতিপূর্বে আমি এমনটি আর কোথাও দেখিনি। যে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝড়ে মৃত্যুবরণ করলো তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমি যেনো জবানবন্দী দিতে শুরু করলাম। আমি করজোড়ে উচ্চ বয়ানে বললাম, তোমাদের এই অকাল মৃত্যুর দায় আমি এড়াতে পারি না, বিশ্ববাসীর কেউ এড়াতে পারে না। আমার দিব্যদৃষ্টি প্রসারিত হতে থাকলো। উপকূলের হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ মানুষের মধ্যেই সমাধানটা খুঁজে পেলাম। আমি কিছুই করিনি শুধুমাত্র আমার হৃদয়ের অভিলাসটা ঐসব হাজার যুবকের হৃদয়ে ঢেলে দিতে পেরেছি। হারুন তুমি কি বিশ্বাস করবে যে কি অপার আনন্দ হিল্লোল আজ আমার হৃদয়ে বয়ে যাচ্ছে? সিপিপি আমার জীবনের সেই অর্জন যা আমাকে আমৃত্যু আনন্দ ও শান্তিতে অভিষিক্ত করবে।

সেই রাতে হেগস্ট্রমের মতো কঠিন বাস্তববাদী মানুষের মনের মণিকোঠা থেকে নিসৃত এমন আবেগপ্রবণ কথাগুলো শুনে আমার দু নয়ন অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। হেগস্ট্রমের কথাগুলো আমি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করলাম। মনে হলো দূর আকাশের সব তারাগুলো আজ আরো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী কাল দুপুরে হেগস্ট্রম দম্পত্তির ফ্লাইট। তাঁরা দিল্লী হয়ে সুইডেন যাবেন আর আমি সড়ক পথে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে পরিশেষে বাংলাদেশে ফিরবো। হাউজ বোটের মালিক আমাকে বলে রেখেছেন যে আমি যদি চাই তবে আরো দু একদিন হাউজবোটে অবস্থান করতে পারি তবে এজন্য কোন ভাড়া দিতে হবে না।

সকালবেলা নাস্তার পর হেগস্ট্রম ছোট আকারের একটা ব্যাগ আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এতে যে ইন্ডিয়ান রূপী ও ডলার রয়েছে তাতে কমপক্ষে পনেরো দিন ভারতের বিভিন্ন জায়গা তুমি পরিভ্রমণ করতে পারবে। তবে যত পারো দেখবে, কেনাকাটা কম করবে।

আমি বললাম, ব্যাগটাতো রূপী আর ডলার দিয়ে ভর্তি। আমারতো এতো অর্থের প্রয়োজন হবে না। তুমি বরঞ্চ আমার প্রয়োজন মাফিক অর্থটুকু দাও।

হেগস্ট্রম বললেন, ওগুলো আমি হিসাব করেই তোমাকে দিয়েছি। কাছে রাখ কাজে লাগবে। আরো একটি কথা তোমাকে বলার রয়েছে। তুমি বলেছিলে এতো মানুষ থাকতে তোমাকে কেন আমাদের সাথে নিয়ে ভারতে নিয়ে এলাম। সেদিন উত্তরটা দেইনি, আজ দিচ্ছি শোন। তুমি আমাকে যতটুকু চিনতে পেরেছো তার চেয়ে বেশী আমি তোমাকে চিনেছি এবং আমার মনে হয়েছে যে আমি তোমার কাছে ঋণী এবং প্রতিদানে তোমাকে আমার কিছু দেওয়া উচিৎ। সেই বোধ থেকেই তোমাকে আমাদের সাথে নিয়ে এসে কিছুটা সময় একত্রে কাটালাম।

আমি মুখে শুধু ধন্যবাদ উচ্চারণ করলেও মনের গভীর থেকে উৎসারিত সুগভীর কৃতজ্ঞতা দিয়ে তাঁকে আরো একবার অভিষিক্ত করলাম।

পরদিন যথাসময়ে কাশ্মীর রেড ক্রসের গাড়িতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গেলাম এবং হেগস্ট্রম দম্পতিকে বিদায় জানালাম। এরপর তিনি আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, সিপিপিকে দেখো এবং ভাল থেকো।

হেগস্ট্রমকে বিদায় দিয়ে গভীর মনোবেদনা নিয়ে হাউজবোটে ফিরে এলাম। বিকেল বেলা বাইরে বেরুলাম এবং পরদিন জম্মু যাব বলে বাসের টিকিট কাটলাম। হাউজবোটের মালিক বললেন যে আরো দু একটা দিন কিন্তু থেকে যেতে পারেন।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আবার যদি কখনো শ্রীনগর আসি তবে আপনার সাথে দেখা করবো।

পরদিন সকালে বাসে উঠলাম। বাসের যাত্রী কম অর্ধেক সিটই খালি। বাস ছাড়ার পর টের পাচ্ছি যে কত ধানে কত চাল। গাড়ী পাহাড়ের উপর উঠছে তো উঠছেই। জানালা দিয়ে তাঁকিয়ে ভয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম। এতো সুউচ্চ পাহাড়ী পথে আমি ইতিপূর্বে কখনো চলিনি। রাজ্যের সকল ভয় যেনো আমার কাঁধে ভর করেছে। সাধারণত জম্মু যেতে বারো ঘন্টার পথ। কিন্তু ঐ সময়টাতে বন্যা হওয়ায় বাইপাস ব্যবহার ও ধীর গতিতে চলার কারণে সময় বেশী লাগবে বলে জানতে পারলাম। বাইপাসে উঠা আরো মারাত্মক, এতো ভয় পেলাম যে পেটের ভেতরে মোচড় দিয়ে পেট ডাকা আরম্ভ করলো।

রাত আটটার পর পাহাড়ী পথের কোন একটি প্রশস্ত জায়গায় বাস থামলো। রাতের খাবারের জন্য বাস এখানে বেশ কিছুক্ষণ থাকবে। আমি এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করে আমার পেটটাকে শান্ত রাখার ব্যবস্থা করলাম। সারা রাত ঘুমোতে পারলাম না। অতি প্রত্যুষে অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টা পর জম্মু পৌঁছুলাম। পেটের অবস্থা ভাল না থাকায় জম্মুতে একদিন থেকে পরেরদিন হিমাচল প্রদেশে সিমলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সিমলা পৌঁছে পাহাড়ের উপরে একটা হোটেলে উঠলাম। রেজিষ্টারে নাম লেখার পর বাংলাদেশী উল্লেখ করায় ম্যানেজার ওখানে ইন্ডিয়া লেখার জন্য বললো। আমি বললাম যে বংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়া লিখবো কেন? বেশ কিছুক্ষণ বোঝানোর পর ম্যানেজারের ভ্রান্তি দূর হলো। সিমলার হোটেলে বানরের উৎপাত অত্যাধিক হওয়ায় হোটেলের জানালা খোলা রেখে বাইরে যেতে আমাকে নিষেধ করা হলো।

সিমলাতে দুদিন থাকার পর তৃতীয় দিন সকালে বাসে চেপে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। বাসে আমার সিটের পাশেই একজন কানাডিয়ান টুরিষ্টকে সহযাত্রী হিসাবে পেলাম। সে অনেকদিন যাবত এই এলাকায় সফর করছেন বলে জানালেন। তাঁর সংগৃহীত কতিপয় এ্যান্টিকস্ আফগানিস্তানে বানর কিভাবে চুরি করে নিয়ে গেছে সেই গল্প শোনালেন। সন্ধার পূর্বেই দিল্লী পৌঁছে গেলাম। কানাডিয়ান সহযাত্রীর পরামর্শে তাঁর সাথে পুরানো দিল্লীর একটি সাদামাটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেলে উঠেই বুঝতে পারলাম যে আমার সহযাত্রীটি একজন নেশাখোর ব্যক্তি। ভেবেছিলাম যে অন্তত দুদিন দিল্লীতে থাকবো তারপর কলিকাতা যাব কিন্তু ঐ কানাডিয়ান নেশাখোর টুরিষ্টের সাহচর্য এড়ানোর জন্য পরদিনই ফ্লাইট সমন্বয় করে কলিকাতা চলে এলাম। কলিকাতায় দুদিন অবস্থানের পর ঢাকায় ফিরে এলাম।

হেগস্ট্রমের নির্দেশ মেনে ভ্রমণটাই বেশী করেছি এবং কেনাকটা কম করেছি। ঢাকায় ফেরার পর বাসায় গিয়ে দেখলাম যে তখনো আমার কাছে চার হাজার ইন্ডিয়ান রূপী ও তিন শত ডলার রয়ে গেছে। আসলে হেগস্ট্রমের দেয়া ডলারগুলো আমার খরচই করতে হয়নি। পরদিন অফিসে গিয়ে আমার সহকর্মীদের সাথে ইন্ডিয়া ভ্রমণ ও হেগস্ট্রমের সাথে আমর দূর্লভ অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। সবাই অভিভূত হয়ে আমার কথা শুনলেন।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং কর্মমুখর সিপিপি

এরপর আবার সিপিপি-র কাজে মনোসংযোগ করলাম। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবার একে আরো কর্মমূখর করে তোলার পালা। একটার পর একটা কাজ সামনে আসছে আর আমি পূর্ণ মনোসংযোগ সহকারে অবলীলায় তা করে যাচ্ছি। পূর্বের চেয়ে কাজ বহুগুণে বেড়ে গেছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। মডিউল ও সিডিউল এবং একই সাথে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরী করাটা জরুরি হয়ে পড়লো। মাসাধিকাল সময় নিয়ে এ সমস্ত কাজ সমাধা করা হলো। এর মধ্যে ওয়্যারলেস সেট চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে একটি ম্যানুয়েল তৈরীর প্রয়াস নিলাম। এই ম্যানুয়েল প্রণয়নে খন্দকার আব্দুল হক আমাকে সহযোগিতা করলো।

ইউনিয়ন বা ইউনিট পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সাংগঠনিক সমস্যাদির সমাধানকল্পে প্রতি মাসেই কমপক্ষে সাতদিন বিভিন্ন থানায় সফর করতে হচ্ছিলো।



সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ

ক্রমান্বয়ে অফিসের ব্যস্ততা এতো ব্যাপকতর হলো যে সকাল নয়টায় অফিসে গিয়ে রাত আটটার পূর্বে অফিস থেকে বের হতে পারতাম না।

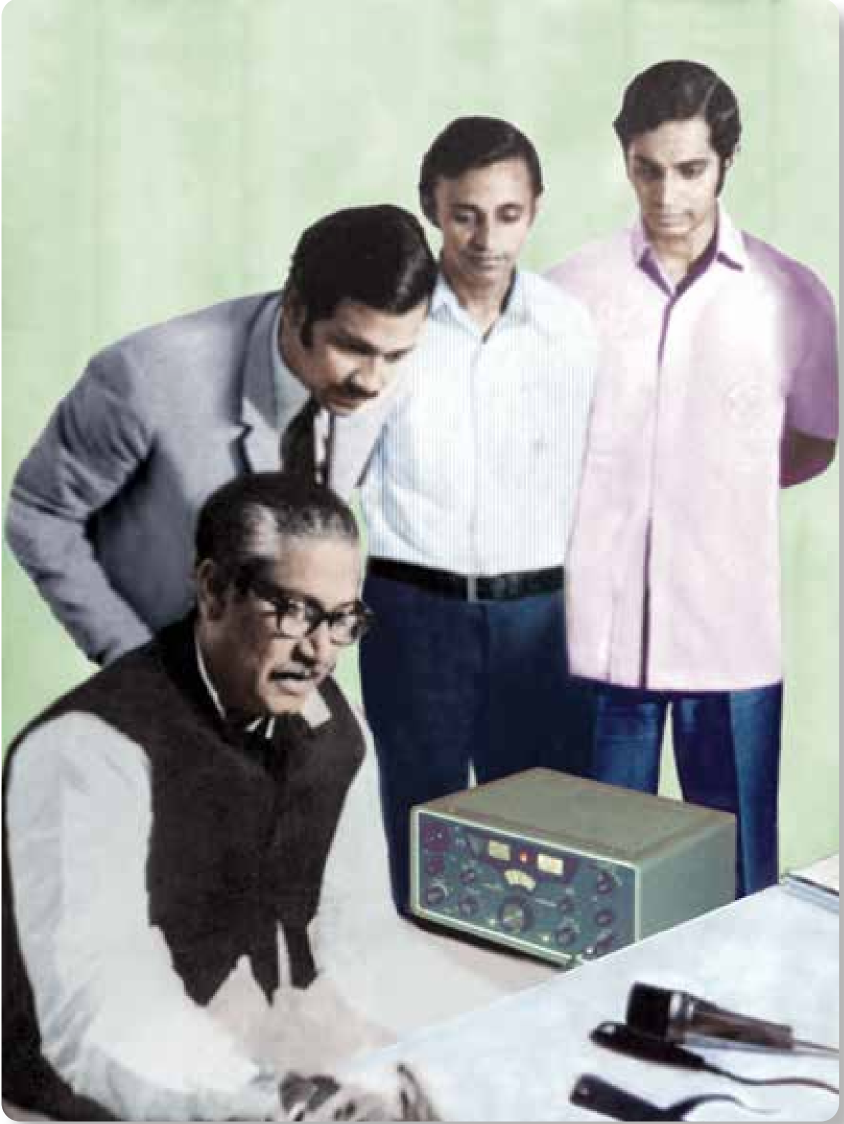
এর মধ্যে ১৯৭৩ সালে একটি ঘূর্ণিঝড়ে পটুয়াখালী ও ভোলার নীচু অঞ্চলসহ সুন্দরবন এলাকা প্লাবিত হলো এবং সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হলো। ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্গত এলাকা ভোলা সফর করলেন। ভোলায় অবতরণের পর প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদেরকে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত দেখলেন। কর্মসূচির পরিচালক সাইদুর রহমানের অনুরোধক্রমে বঙ্গবন্ধু রেড ক্রসের হেলিকপ্টারে আরোহণ করলেন।

ঐ সময়ে সাইদুর রহমান ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার জন্য বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করলেন এবং বঙ্গবন্ধু বক্তব্য প্রদানে রাজী হলেন। এর কয়েকদিন পর বঙ্গবন্ধু সিপিপি-র ওয়্যারলেস মারফত স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে একটি অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ দেন।

বেইলী রোডে রমনা পার্কের পূর্ব দিকের গেটটির সম্মুখে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রেডিও সেট স্থাপন করা হলো। রেডিও সেট স্থাপন ও চালনার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ দিনই আমি বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ লাভ করেছিলাম। তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর সবার মতো আমাকেও মোহিত করেছিল।

উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রতিটি সিপিপি অফিসের সামনে শত শত স্বেচ্ছাসেবক সমবেত হয়েছিল এবং বড় মাইকে ঐ ভাষণ প্রচার করা হয়েছিল। সর্বসাকুল্যে ১২ থেকে ১৫ মিনিট তিনি অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ দিলেন। তিনি মানবসেবার কথা বললেন, পারিবারিক প্রস্তুতি ও সামাজিক প্রস্তুতির কথা বললেন। তিনি বৃক্ষ রোপণের কথা বললেন। বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণে সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবকদের মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল।

ঐ সময়টাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী আব্দুল কাদের সিপিপি কার্যক্রম দেখাশুনা করতেন। পরবর্তীতে খসরুজ্জামান চৌধুরী ডেপুটি সেক্রেটারী হিসাবে আব্দুল কাদেরের স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি সিপিপি-র কার্যক্রম অত্যন্ত যত্নশীল হয়ে দেখাশুনা করতেন।



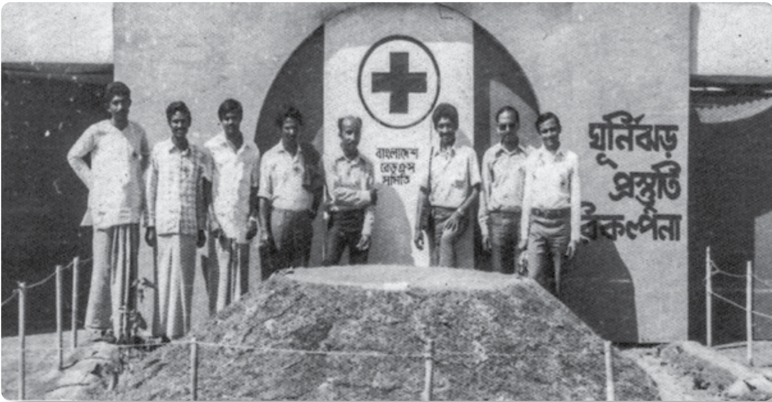
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **১৯৭৩** *সালে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ওয়্যারলেসে কথা বলছেন। সোসাইটির উপ-মহাসচিব সাইদুর রহমান, সিপিপি কর্মকর্তা হারুন আল রশিদ ও গোলাম রব্বানী পেছনে দন্ডায়মান*

তিনি প্রায়ই বলতেন যে যেখানে হাজার হাজার মানুষ বিনা পারিশ্রমিকে রাতদিন আর্ত মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে সেখানে সিপিপি-র সেই সব অকুতোভয় বীর পুরুষদেরকে আমি সম্মানের সাথে স্মরণ করি। সিপিপি-র কর্মকান্ড আমার কাছে সবসময়ই অগ্রাধিকার পাবে।

এক পর্যায়ে খসরুজ্জামান চৌধুরী আমাকে তাঁর অফিস রুমে বসে সিপিপি-র কার্যক্রম সম্পাদনের নির্দেশ দিলেন এবং আমি সচিবালয়ে তাঁর অফিস রুমে আলাদা টেবিল বিছিয়ে বেশ কিছুদিন সিপিপি-র কার্যক্রম সমাধা করলাম। তাঁর সাথে আমার যোগাযোগটা এতই গভীর হয়ে উঠেছিল যে পরবর্তী সময়ে তা পারিবারিক বন্ধুত্বের রূপ লাভ করেছিল।

ঐ সময়ে উপকূলীয় বিভিন্ন জেলা সদর ও থানা সদরে সকল সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রম নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো। সিপিপি-র বাস্তবায়ন বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে ঐ সকল প্রদর্শনীতে আমরা যোগদান করতাম। সিপিপি ষ্টল সবসময়ই প্রথম পুরস্কারে ভূষিত হতো।

সিপিপি ষ্টলে প্রদর্শিত সাংকেতিক যন্ত্রপাতি, সাংকেতিক পতাকা, স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তায় ব্যবহৃত পোষাক, ওয়্যারলেস সেট পরিচালনা-পদ্ধতি, মুজিব কিল্লার মডেল, নানা প্রকারের পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি দেখে হাজার হাজার মানুষ ঘূর্ণিঝড় পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েছে। বরিশাল, ভোলা, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, হাতিয়া, দৌলতখান ইত্যাদি বহু জায়গায় প্রদর্শনীতে



জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে স্থাপিত সিপিপি ষ্টলের সামনে মুজিব কিল্লার মডেল

সিপিপি অংশগ্রহণ করেছে। ঐ সময়ে আমাদের প্রিয় আর্টিষ্ট জাহিদ ভাই ও রেড ক্রস যুব সদস্য শেখ মাহতাব আহমদ প্রতিটা প্রদর্শনীতে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে।

এরপর ১৯৭৪ সালের ঘটনা। সিপিপি-র বাৎসরিক অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে হঠাৎ করেই একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিল। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেল যে এবার বাজেটে সিপিপি-র জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকছে না। আমরা অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর তদানীন্তন বাংলাদেশ রেড ক্রসের চেয়ারম্যান জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা বললেন, এটা কেমন করে হয়। সদ্য প্রতিষ্ঠিত কর্মসূচি চলবে কি করে? বিষয়টি অনতিবিলম্বে সুরাহা করা প্রয়োজন। আগামীকালই আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছে যাব। সাইদুর রহমান ও হারুন তোমরা আমার সাথে গণভবনে যাবে এবং আমার সাথে তোমরাও তোমাদের অসুবিধার কথা জানাবে।



বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির প্রথম চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে গাজী গোলাম মোস্তফা, সাইদুর রহমান এবং আমি গণ ভবনে গেলাম এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাত করলাম। ঐ সময়ে বঙ্গবন্ধু সর্দিজ্বরে ভূগছিলেন। প্রশস্ত একটি কক্ষে তিনি একাই ছিলেন। আবার তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম।

রাজনৈতিক কিছু কথাবার্তার পর গাজী গোলাম মোস্তফা বললেন যে সিপিপি-র বাৎসরিক বরাদ্দ এবার বাজেটে অন্তর্ভূক্ত হয় নাই এমতাবস্থায় সিপিপি-র চলার মতো অন্য কোন সংস্থানও নাই। আপনি অনুগ্রহপূর্বক অর্থ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিলে বিষয়টির সুরাহা হবে।

বঙ্গবন্ধু বললেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, বিভিন্ন খাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এবার অর্থের সংকুলান করা যাবেনা। তোমরা আন্তর্জাতিক রেড ক্রস থেকে টাকা সংগ্রহ কর।

আমরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। কর্মসূচির জন্য অর্থের বিকল্প সংস্থানের জন্য আমরা চিন্তা-ভাবনা শুরু করলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে কয়েকদিন পরেই জানা গেল যে অর্থ মন্ত্রণালয় সিপিপি-র জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে। আমরা আনন্দিত হলাম। সিপিপি-র প্রতি বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতার প্রমাণ আমরা আবারও পেলাম।

তদানীন্তন বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা সিপিপিকে অত্যন্ত আপন করে নিয়েছিলেন। সিপিপি যখন সরকারের সাথে যৌথভাবে পরিচালনার মর্যাদা লাভ করে তখন তিনি বলছিলেন যে রেড ক্রস এতো পরিশ্রম করে যে অনন্য প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুললো তা থেকে রেড ক্রসের অংশীদারিত্ব কখনোই অবহেলিত না হয়। নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হলে প্রায়ই তিনি সিপিপি অফিসে আসতেন এবং কন্ট্রোল রুমে যেয়ে ঝড়ের গতিপথ পর্যবেক্ষণ করতেন। আমাদের কাজের ব্যস্ততা দেখে তিনি ভাল ভাল খাবার আনিয়ে আমাদেরকে খাওয়াতেন। সিপিপি-র প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের পরিচয় আমরা বহুবার তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে সিপিপি-র সকল প্রকার আবর্তক ব্যয়ভার সরকারী অনুদানে নির্বাহ করা হলেও ১৯৭৩ সালের পরেও আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের প্রত্যক্ষ আনুকূল্য সিপিপি-র উপর দীর্ঘদিন ন্যস্ত ছিল। ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সচল রাখা, স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ, সাংকেতিক যন্ত্রপাতির যোগান দেয়া ইত্যাদি কার্যক্রম ২০০৫ সালে আমার বিদেশে মিশনে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি প্রত্যক্ষ করেছি। রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন ছাড়াও হেগস্ট্রমের দেশ সুইডিস রেড ক্রস ও বৃটিশ রেড ক্রস সিপিপি প্রতিষ্ঠার পর থেকে একনাগাড়ে বিরতিহীনভাবে

সিপিপি-র বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। এজন্য ঢাকায় আন্তর্জাতিক রেড ক্রস দপ্তরে সিপিপি ডেলিগেট হিসাবে একজন ডেলিগেট ছিলেন যিনি সিপিপি-র কাজে সহায়তা প্রদান করতেন।

সুইডিস রেড ক্রস ও বৃটিশ রেড ক্রসের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ প্রতি বছরই ঢাকায় এসে সিপিপি-র সাথে মতবিনিময় করে সিপিপি-র জন্য বাৎসরিক বাজেট নির্ধারণ করতেন। এ ছাড়াও রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন, জেনেভা থেকে একজন টেলিকম ডেলিগেট সিপিপি-র ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক দেখাশুনার কাজে দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিলেন।



জেনেভা থেকে আগত আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের প্রতিনিধিগণের সাথে হারুন আল রশিদ সিপিপি-র কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করছেন

এরপর ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে কর্মসূচির পরিচালক সাইদুর রহমান বাংলাদেশ রেড ক্রসের উপ-মহাসচিব হিসাবে যোগদান করেন। ঐ সময়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর এমদাদ হোসেন সিপিপি-র ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

জনাব সাইদুর রহমান দুই বছরের কম সময়কাল সিপিপি-তে পরিচালক হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকলেও প্রতিষ্ঠানটিকে সাংগঠনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন। বলতে গেলে যোগ্য একজন সহকারী হিসাবে তিনি হেগস্ট্রমকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সিপিপি-কে একটি টেকসই প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সাইদুর রহমানের অবদান স্মরণীয়।

কর্মসূচির পরিচালক এমদাদ হোসেন প্রশাসনিক কাজে বেশী ব্যস্ত থাকতেন বিধায় সাংগঠনিক ও স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা উন্নয়নের পুরো বিষয়টা আমাকে দেখতে হতো। এখানে একটা কথা না বললেই নয় যে এমদাদ হোসেন অপারেশনাল কাজে আমার উপর এমন আস্থা রাখতেন যে শত জটিলতার মধ্যে আমি যেটা বলতাম সেটাই তিনি যথার্থ বলে ধরে নিতেন। উন্নয়নমূলক সকল কাজ করার জন্য তিনি আমাকে অগ্রীম সবুজ সংকেত দিয়ে রেখেছিলেন। সিপিপি-র কৈশোর অবস্থায় এমদাদ হোসেন সংস্থাটির হাল এমন শক্ত করে ধরেন যে তিনি অবসরে যাবার পূর্বপর্যন্ত তা আর ছাড়েননি। সিপিপিতে এমদাদ হোসেনের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।



সিপিপি-র ওয়্যারলেস দিয়ে উপকূলীয় এলাকার কর্মকর্তাদের সাথে কথপোকথন

১৯৭৪ সালের শেষের দিকে হেগস্ট্রম আবার বাংলাদেশে এলেন। তখন সিপিপি-র অফিস বাবর রোডে অবস্থিত ছিল। সকাল বেলা অফিসে ঢুকেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। অফিসটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এরপর এমদাদ হোসেন ও অন্যান্য কর্মকর্তারা অফিসে আসার পর সবাইকে নিয়ে তিনি সিপিপি-র গল্প শুনলেন। ঐ সময়ে তিনি কয়েকটা দিন মাত্র বাংলাদেশে ছিলেন। সাইদুর রহমানকে নিয়ে তিনি তাঁর পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করলেন। এরপর হেগস্ট্রম আর কখনো বাংলাদেশে আসেননি।

১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে দুঃসংবাদ পেলাম যে হেগস্ট্রম সুইডেনের ষ্টকহোমে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই নিদারুণ দুসংবাদে আমরা শোকাভিভূত হলাম। আমরা জেনে অভিভূত হলাম যে মৃত্যুর পূর্বে হেগস্ট্রমের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের নামে

তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং জোয়াকিম ও মাইকেল নামে দুই পুত্র সন্তান রেখে যান। সংবাদটি সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদেরকে জানানো হলো। বাংলাদেশের অকৃত্রিম একজন বন্ধু মানব দরদী ও সিপিপি-র রূপকার হেগস্ট্রমের বিদেহী আত্মার চির শান্তি আমরা কামনা করলাম।

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাইদুর রহমান রেড ক্রসের চাকুরি ইস্তফা দিয়ে অক্সফামে বাংলাদেশের প্রধান হিসাবে যোগদান করলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে অক্সফামের অর্থানুকূল্যে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে এক মাস ব্যাপী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণে যোগদানের জন্য আমাকে ও গোলাম রব্বানীকে মনোনয়ন প্রদান করলেন।

অক্সফোর্ড পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত ঐ প্রশিক্ষণটি ছিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠানিক সর্বপ্রথম প্রশিক্ষণ। ঐ প্রশিক্ষণে প্রথম দিকে তাল মিলিয়ে চলাটা আমাদের জন্য কিছুটা কঠিন হলেও পরবর্তীতে সবার সাথে একাত্ম হতে পেরেছিলাম। ঐ প্রশিক্ষণের কোর্স সমন্বয়কারী ইয়ান ডেভিস দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে তিনি আমাদেরকে স্ট্র্যাটফোর্ডে নিয়ে যান এবং সেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক জুলিয়াস সিজার দেখার সুযোগ করে দেন। ঐ সুযোগে সেক্সপিয়ারের বাড়িটিও দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

অক্সফোর্ডের প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে এসে দেখলাম যে মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সিপিপি-র কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। সিপিপি প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়কালীন পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবকেরা সাফল্যের সাথে আগাম সতর্ক সংকেত ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উপকূলের জনমানুষকে সহায়তা প্রদান করে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে।

১৯৮১ সালে মিসেস হেগস্ট্রম ঢাকায় এলেন এবং তাঁর স্বামীর অবদান সিপিপিকে দেখলেন। ঐ সময়ে তিনি বলেছিলেন যে হেগস্ট্রম সিপিপি-কে তাঁর সন্তানের মতই ভালবাসতেন এবং তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন বলে মনে করতেন। ঐ সময়ে মিসেস হেগষ্টম বরিশালে সিপিপি অফিসে গিয়ে বরিশাল অঞ্চলের সকল কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে হেগস্ট্রমের স্মৃতিচারণ করেছিলেন।

১৯৮৫ সালে একটি প্রবল ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূলবর্তী সন্দীপ, হাতিয়া, উড়ির চর এলাকায় আঘাত হানে এবং জানমালের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। ঝড়ে উড়ির চরের প্রায় সকল বসতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঐ ঝড়ের বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১৫৪ কিলোমিটার হলেও জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল দশ থেকে পনেরো ফুট, ফলে এগারো হাজারের অধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

১৯৮৫ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর আমি সিপিপি-র কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তাসহ সন্দীপ ও উড়ির চর সফর করে এতো মানুষের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য একটা জরিপ সম্পাদন করলাম। ঐ জরিপে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পেলাম।

এগুলো হলো, ঝড়ের আগাম সতর্ক সংকেতের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া, মহাবিপদ সংকেতের সময় প্রচারিত অপসারণ নির্দেশ অবহেলা করা, উড়ির চরের মতো বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়কেন্দ্র না থাকা ইত্যাদি।

এই জরিপের ফলে একটা বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে উপকূলীয় বেশীরভাগ সাধারণ মানুষ ঘূর্ণিঝড় সংকেতের অর্থ বোঝে না। যারা বোঝে তাঁদের বেশীরভাগ মানুষ ভাগ্যের উপর নিজেদেরকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে এবং সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক প্রচারিত নির্দেশাবলী না মেনে নির্লিপ্ত থাকে।

অতঃপর এই জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসূচির পরিচালক এমদাদ হোসেনের সাথে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। এই আলোচনায় সুনির্দিষ্ট একটা যুক্তি উপস্থাপন করলাম। আর তা হলো অনতিবিলম্বে উপকূলীয় সর্বস্তরের মানুষের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে বৈচিত্রপূর্ণ ও বিরতিহীন সচেতনতা কার্যক্রম শুরু করা। একই সাথে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে দলগত উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে থানাভিত্তিক তিন দিনের ক্যাম্প আয়োজন করার গুরুত্বও ব্যাখ্যা করলাম।

দৃষ্টান্ত হিসাবে তদানীন্তন জুনিয়র রেড ক্রসের ক্যাম্পে আমার ভূমিকার কথা উল্লেখ করলাম। উল্লেখ্য যে ১৯৭৫ সাল থেকে জুনিয়র ও যুব রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্টের সবকটি ক্যাম্পে ফিল্ড ড্রামা সহ সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠন ও পরিচালনার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। ক্যাম্পের আনন্দঘন পরিবেশে নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে যুব রেড ক্রসের সদস্যরা কিভাবে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উন্নয়ন ঘটায়

তা আমি অত্যন্ত কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। এই সকল অভিজ্ঞতার আলোকেই আমি সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ক্যাম্পের আয়োজনের প্রস্তাব পেশ করলাম। এমদাদ হোসেন আমার দুটে প্রস্তাবই সমর্থন করলেন এবং বললেন যে, তুমি কাজ শুরু করতে পার।

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের সর্বপ্রথম ধাপ হিসাবে একটা যুৎসই মাঠ মহড়ার নকশা ও রূপচিত্র তৈরী করলাম। স্ক্রিপ্ট রচনা করে মহড়াটির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শব্দ ও সংগীত সংযোজন করে নতুন করে প্রফেশনাল রেকর্ডিং ষ্টুডিওতে রেকর্ডিংয়ের কাজ সম্পন্ন করলাম। এমদাদ হোসেন রেকর্ডকৃত অডিও ক্যাসেট সকল থানায় পাঠিয়ে দিয়ে মহড়াটি বিভিন্ন ইউনিয়নে অনুষ্ঠান করার জন্য অফিস নির্দেশ প্রদান করলেন।

এরপর দ্বিতীয় ধাপ হিসাবে একটি নাটক মঞ্চায়নের কথা ভাবলাম। কলেজ জীবনে বেশ কয়েকটা নাটক মঞ্চায়নের সাথে জড়িত ছিলাম বলে নিজেই একটা নাটক রচনায় মনোযোগী হলাম। মনে মনে ভাবলাম জুনিয়র রেড ক্রসের জন্য 'আদি থেকে বিংশতি', 'ল্যান্ড অব পিস', 'রেড ফ্লাওয়ারস', 'শাশ্বত রেড ক্রস' ইত্যাদি ফীল্ড ড্রামা ও নাটকগুলোতো আমিই রচনা করেছি, তবে সিপিপি-র জন্য একটা কার্যকরী নাটক রচনা করতে পারবো না কেন?

আদা জল খেয়ে নামলাম এবং মাসাধিক কাল সময়ের মধ্যে বাস্তবতার নিরিখে একটা নাটক রচনা করে ফেললাম। নাটকটির নাম 'সোনার চর' রাখলাম এবং এমদাদ হোসেনকে স্ক্রিপ্ট পড়ার জন্য অনুরোধ করলাম।

এমদাদ হোসেন বললেন, নাটকের স্ক্রিপ্ট পড়ার প্রয়োজন নাই, পড়ে ফেললে মঞ্চে অভিনীত নাটক দেখার মজাটা আমি হারিয়ে ফেলবো।

'সোনার চর' নাটকটির মাধ্যমে সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের ধারা যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি তাঁদেরকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করার কাজটিও সুসম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া জনমানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টিও যথাযথভাবে তুলে আনা হয়েছে বলে আমার মনে হলো। এই নাটকটি কাঠামোগত ও কারিগরী দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর করে নির্মাণ করা হলো।

দশ-পনেরো হাজার মানুষ একসাথে বসে নাটকটি দেখতে চাইলে কোনরূপ অসুবিধা ছাড়াই ভালভাবে উপভোগ করতে পারবেন এবং প্রতিটি চরিত্রের প্রতিটি

কথা বা শব্দ সকল দর্শকগণ স্পষ্টভাবে শুনতে পারবেন যদিও উন্মুক্ত মঞ্চে নাটকের যথাযথ শব্দবিন্যাস সর্বসময়েই একটা সমস্যার বিষয়।

এরপর স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য বাৎসরিক সম্মেলনের রূপরেখা, প্রস্তাব ও বাজেট প্রনয়ণ করা হলো। এবার এমদাদ হোসেন ও আমি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের সিপিপি ডেলিগেট মিঃ পিডার ড্যামের সাথে একান্ত বৈঠক করে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরলাম। পিডার ড্যাম এ বিষয়ে রাজী হলেন এবং প্রাক্কলিত অর্থ বরাদ্দ দিলেন।

সিপিপি-তে আমার প্রথম কর্মস্থল হাতিয়া থেকে সম্মেলন শুরু করলাম। সময়টা ছিল ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাস। সিপিপি-র পরিচালক ও সকল কমকর্তাগণ হাতিয়াতে এলেন। কর্মকর্তা ফজলুল করিম, রফিকুল আলম এবং শামসুল আলমকে নিয়ে আমি কয়েকদিন পূর্বেই হাতিয়াতে পৌঁছুলাম। ঢাকা থেকে দুইশত পঞ্চাশটি তাঁবু, বারশত কম্বল এবং শতাধিক বড় আকারের পলিথিন শীট হাতিয়াতে নিয়ে আসা হলো।

হাতিয়া কলেজ মাঠে তাঁবু টানানো হলো। মাঠের মধ্যখানে একটি বড় প্যান্ডেল ও একটি মঞ্চ তৈরী করা হলো। নাটকের পঁচিশ জন অভিনেতা ও একজন অভিনেত্রী বাছাই করে রিহার্সেল শুরু করলাম। একই সাথে অন্যান্য কার্যক্রমের প্রস্তুতিও সমানভাবে এগিয়ে চললো।

সম্মেলন শুরু হওয়ার পূর্বদিনই দূরবর্তী ইউনিয়ন থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা উপস্থিত হলেন। পরেরদিন সকালের মধ্যে হাতিয়ার মোট ১২৮০ জনের মধ্যে ১২৬৫ জন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত হলেন। প্রথম দিনের সূচি অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনের পর সকালের নাস্তা পরিবেশন করা হলো। তারপর বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে সবাই প্রশিক্ষণে যোগদান করলেন। ২০ জন সিপিপি কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করলেন।

এই সম্মেলনে প্রাথমিক চিকিৎসার ওরিয়েন্টেশনের জন্য তদানীন্তন বাংলাদেশ রেড ক্রসের যুব রেড ক্রিসেন্টের সদস্যগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তাঁরা সানন্দে ক্যাম্পে আমাদের কাজে অংশগ্রহণ করেছিল।

রাতের খাবার পরিবেশনের পর হাতিয়ার স্থানীয় শিল্পীদের সমন্বয়ে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হলো। এই অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকেরাও অংশগ্রহণ





সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক মাঠ মহড়ার দৃশ্য







সোনার চর নাটকের কতিপয় দৃশ্য







সোনার চর নাটকের কতিপয় দৃশ্য

করলেন। দ্বিতীয় দিন আবার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সবাই যোগদান করলেন। বিকেলবেলা ঘূর্ণিঝড়ের মাঠ-মহড়া অনুষ্ঠিত হলো। মাঠ-মহড়াটিতে প্রচুর স্থানীয় জনসাধারণের সমাগম হয়েছিল। রাতে বহুল প্রতীক্ষিত নাটক 'সোনার চর' অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চে সেট তৈরী ও লাইটিংয়ের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চললো। ঢাকার প্রখ্যাত লাইটিং বিশেষজ্ঞ রবিউল আওয়াল এই নাটকের আলোক প্রক্ষেপণের কাজটি করবেন।

সন্ধ্যার পর পরই অসংখ্য মানুষের সমাগম ঘটলো। মঞ্চ ও প্যান্ডেলের মধ্যবর্তী ফাকা জায়গাটি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দখল করে নিয়েছে। পরিচালক এমদাদ হোসেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রথম সারিতে উপবিষ্ট। নির্ধারিত সময়ে নাটক শুরু হলো। চমৎকার শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে একের পর এক দৃশ্য মঞ্চায়িত হতে থাকলো। এক পর্যায়ে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ ঘটলো এবং নায়িকা সোনার চরে গিয়ে বসতি গড়লো। অতঃপর সোনার চরকে ঘিরে নাটক এগিয়ে চললো। পরিশেষে আলোর খেলার মাধ্যমে মঞ্চে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বয়ে গেল। নায়িকার করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে নাটকটি চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়ে শেষ হলো।

হাতিয়ার সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক প্রণব পোদ্দার মঞ্চে ছুটে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিয়ে বললেন, এই নাটকটি ইতিপূর্বে দেখলে আমার পরিবারের একটি লোকও ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারাতো না। এই মঞ্চে আজ একটা বিপ্লব সাধিত হলো। এই নাটক সারা উপকূলব্যাপী বার বার প্রদর্শন করতেই হবে।

রফিক বললেন, এমন একজনও পাওয়া যাবে না যে নাটকটি দেখে চোখের জল সংবরণ করতে পেরেছে।

এমদাদ হোসেন এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার নাটকের গভীরতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। নাটকটি আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ও উপকূলবাসী সবার জন্য অত্যন্ত শিক্ষামূলক একটি পদক্ষেপ। এটাকে চলমান রাখতে হবে।

নাটকটির সর্বপ্রথম মঞ্চায়নে সিপিপি-র যে সকল কর্মকর্তাগণ অভিনয় করলেন তাঁরা হলেন সামসুল আলম, ফজলুল করিম, আব্দুল ওয়াদুদ, মুস্তাক আহমেদ, আবুল কাশেম সরকার, বশীর আহমেদ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, খন্দকার আব্দুল হক, শহীদ উল্লাহ্ প্রমূখ। এ ছাড়াও রেডিও ওয়ার্কশপ সহকারী আব্দুল মজিদ,

স্থানীয় একজন কিশোরী ও সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ নাটকটিতে অভিনয় করলেন।

পরের দিন স্বেচ্ছাসেবকদের নিকট থেকে নাটকটি সম্বন্ধে তাঁদের মতামত গ্রহণ করলাম। তৃতীয় দিনও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হলো এবং সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার মাধমে তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করা হলো। অতঃপর দুপুরের পর প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা ও কুইজ অনুষ্ঠিত হলো। সন্ধ্যার পর সর্বশেষ অনুষ্ঠানে যারা ভাল ফলাফল করেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই বিশেষ বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হলো। এভাবে একটার পর একটা কর্মসূচির মাধ্যমে তিনদিন পর সম্মেলন শেষ হোল।



সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মেলনে তাঁবুর মধ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণের দৃশ্য

এমদাদ হোসেন বললেন, এখন মনে হচ্ছে যে এই ধরনের বহুমাত্রিক উদ্দেশ্যের সমাহারে বলিষ্ট কার্যক্রম সম্বলিত সম্মেলন সিপিপি-র জন্য অপরিহার্য।

পরের দিন মালামাল গুছিয়ে স্থানীয় দুটি বড় ট্রলারে তোলা হলো এবং সন্দীপে গিয়ে নামানো হলো। এভাবে সন্দীপের সম্মেলন শেষ করে একে একে তজুমুদ্দিন, চরফ্যাসন, গলাচিপা, কলাপাড়া ও পাথরঘাটায় গিয়ে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। এর মধ্যে পাথরঘাটা সম্মেলনে তদানীন্তন বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির উপ-মহাসচিব জনাব এ এস এম আকরাম উপস্থিত ছিলেন।

পাথরঘাটা সম্মেলন সমাপ্তির পর রাতে সিপিপি-র সকল কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে একটা পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নে দেখা গেল যে এই ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠান কষ্টকর হলেও এর অর্জিত ফলাফল অবিশ্বাস্যভাবে সন্তোষজনক।

প্রথমত: প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতার উন্নয়ন যা সচরাচর তাঁদেরকে দীর্ঘদিনেও প্রদান করা সম্ভবপর হয় না। দ্বিতীয়ত: স্বেচ্ছাসেবকদের দলগত উদ্দীপনা বৃদ্ধি এবং তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করা, তৃতীয়ত: ঘূর্ণিঝড়ের মাঠমহড়া ও ঘূর্ণিঝড়ের উপর স্থানীয় গান ও নাটক প্রদর্শনের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা বৃদ্ধি। চতুর্থত: সিপিপি-র কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সেবামূলক কাজে এক অপরের সাথে নিবিড় সেতুবন্ধন সৃষ্টি। মূল্যায়নে ক্যাম্পের খাবারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা উত্তমভাবে সম্পাদিত হওয়ায় এই দায়িত্বে নিয়োজিত গোলাম রব্বানীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো।

অতঃপর অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী বৎসরে এই কার্যক্রম পুনরায় পরিচালিত হবে ঘোষণা দিয়ে কর্মসূচির পরিচালক এমদাদ হোসেন মূল্যায়ন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানলেন। আমরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এই ভেবে যে একটা নতুন ও সফল কার্যক্রম সিপিপি-তে অন্তর্ভূক্ত হলো।



সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মেলনে মত বিনিময় করছেন হারুন আল রশিদ

সুন্দরবন ভ্রমণ

পাথরঘাট সম্মেলনের সফল সমাপ্তির পর আনন্দের অতিশয্যে সাব্যস্ত করা হলো যে আমরা সবাই সুন্দরবনের অপরূপ দৃশ্য দেখার জন্য কচিখালী যাব এবং সেখানে পিকনিক করে বিকেলে পাথরঘাটা ফিরে আসবো। ক্যাম্প গোছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ব্যতীত সকলেই আমরা একটা ট্রলার নিয়ে সকালে সুন্দরবনের কচিখালী অভিমূখে রওয়ানা হলাম।

আমাদের সাথে উপ-মহাসচিব এএসএম আকরাম, পরিচালক এমদাদ হোসেন, কর্মকর্তা সালাউদ্দিন, পাথরঘাটা সিপিপি থানা টিম লীডার আইয়ুব মল্লিক, সুন্দরবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ দুইজন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক, লাইটম্যান রবিদা এবং রেড ক্রিসেন্টের যুব সদস্য ঢাকার আলাউদ্দিন, রেজাউল করিম বাবু, হোসাইন মোঃ জোবায়ের ও মুকিমুল হুদা লেনিন এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করলেন। পাথরঘাটার কর্মকর্তা সামসুল আলম এই ভ্রমণের সকল ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করেছেন এবং তাঁর কিশোর বয়সী পুত্রকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

সকাল আটটায় রওয়ানা হওয়ার তিন ঘন্টা পর যখন আমরা উন্মুক্ত সাগর ও সুন্দরবনের সঙ্গমস্থলে উপনীত হলাম তখন যুব সদস্য জোবায়ের আমার কাছে এসে বললো, বোটটা মনে হয় অনেক নিচুতে নেমে গেছে কারণ পাথরঘাটা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় আমি ট্রলারের গলুইতে বসে পানির নাগাল পাইনি কিন্তু এখন হাত দিয়ে পানি ছুঁতে পারছি। আমি ওর কথার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ডেকের হ্যাচ খুলে যা দেখলাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেলো। দেখলাম যে পানিতে ট্রলার ভরে গেছে, আর অল্পক্ষণ চললেই এটা নির্ঘাত ডুবে যাবে। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা মাঝিরা টের পায়নি কারণ ট্রলারটি দুইটি চেম্বারে বিভক্ত এবং ইঞ্জিন চেম্বারে পানি প্রবেশ করেনি।

অবস্থা বেগতিক দেখে সবাই হৈচৈ শুরু করলো। সালাহ্ উদ্দিন পেছন থেকে ছুটে এসে লাইফ জ্যাকেটটি নিয়ে গায়ে দিয়ে ফেললো। রবিদা সাতার জানেন না, তিনি আলু ভর্তি বালতি থেকে আলু ট্রলারের উপর ঢেলে দিয়ে বালতিটা বাঁচার উপকরণ হিসাবে বেছে নিলেন। এতো লোকের দৌড়াদৌড়িতে পানি

ভর্তি ট্রলারটি এপাশ ওপাশ দুলতে শুরু করলো। আমি প্রমাদ গুনলাম, ট্রলারটা বোধহয় ডুবেই যাবে। যে অবস্থানে ঘটনাটি ঘটছে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত সাগর, পূর্বদিকে কূল কিনারা দেখা যাচ্ছে না, শুধুমাত্র পশ্চিম দিকে চার থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বে সুন্দরবনের উপকূল দেখা যাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম এখানে ট্রলারডুবি হলে যত বড় সাঁতারুই হই না কেন, সবাইকে নির্ঘাত ডুবে মরতে হবে।

ঐ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে অতীতের এক বেদনাবিধুর স্মৃতি আমার স্মরণে এলো। আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন আমার দুই বছরের বড় এক বোন, আমার দুই বছরের ছোট এক বোন এবং আমার মায়ের কোলে পাঁচ মাসের এক বোন সহ আমাদের পুরো পরিবার এক মর্মান্তিক নৌকাডুবির শিকার হলো। ভরা বর্ষাকালে উন্মত্ত ধলেশ্বরী নদীর মাঝখানে এই নৌকাডুবির ঘটনাটি ঘটলো। আশ্চর্যজনকভাবে নৌকা থেকে ছই আলাদা হয়ে গেল এবং আমার পিতা আমাকে ও আমার দুই বোনকে নিয়ে ছইয়ের উপর উঠে যেতে সমর্থ হলেন। অন্যদিকে আমার মা পাঁচ মাস বয়সের বোনটিকে একহাতে কোলে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে ছই ধরে ভাসতে থাকলেন। প্রচন্ড ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে বড় বড় ঢেউ আমাদেরকে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় তিন ঘন্টাকাল পানিতে ভেসে থেকেও সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে আল্লাহতালার অসীম দয়ায় আমরা সবাই প্রাণে বেঁচে গেলাম।

ঐ ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে পরবর্তী সময়ে আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন যে কোন বিপদেই তুমি ধৈর্যহারা হবে না এবং নিশ্চিত থাকবে যে তোমার সামনে পরিত্রাণের কোন না কোন পথ খোলা রয়েছে, বিপদে বিচলিত না হয়ে ঐ খোলা পথটি তোমাকে খুঁজে বের করে নিতে হবে।

হয়তোবা ঐ স্মৃতিময়তা থেকেই হঠাৎ করে আমার দিব্যজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটলো এবং আমি একটা বজ্রনিনাদে চিৎকার করে বলে উঠলাম, কেউ সামান্যতম নড়াচড়া করবে না, নড়াচড়া করলে তাকে পানিতে ফেলে দেব। আমাদের কিছুই হয়নি। আল্লার রহমতে আমরা নিরাপদে উপকূলে পৌঁছুতে পারবো। এখন থেকে আমার নির্দেশ এখানে কার্যকর হবে এবং কেউ অযথা কোন কথা বলতে পারবে না।

আমার হুঙ্কারে কাজ হলো। ট্রলালের নড়াচড়া বন্ধ হলো। আমার নির্দেশমতো

মাঝিরা ট্রলারের গতিপথ পরিবর্তন করে পশ্চিমমূখী করে নিয়ে ধীরগতিতে যেতে থাকলো। আমি আলাউদ্দিন এবং বাবুকে যতটা সম্ভব পানি সেচে ফেলতে বললাম। ওরা আমার কথা মতো কাজে লেগে গেল।

কালবিলম্ব না করে এবার জোবায়েরকে নিয়ে হ্যাচে নামলাম, উদ্দেশ্য পানি কোনদিক দিয়ে ঢুকছে তা বের করা। ট্রলারের ভিতরে পানি বুক সমান হয়ে গেছে। পানিতে ডুব দিয়ে যতটুকু পারা যায় তলাটা পরীক্ষা করলাম, কিছু পেলাম না। এরপর হঠাৎ করেই পানি ঢোকার উৎস খুঁজে পেলাম। ট্রলারের সম্মুখভাগের নিচে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে তিন চারটি জায়গা দিয়ে পানি ঢুকছে দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম যে বিগত তিন-চার ঘন্টাব্যাপী ক্রমাগত পানি ঢোকার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি অতি সত্বর একটা চাকু ও একখন্ড কাপড় দেয়ার জন্য জোবায়েকে বললাম। ও মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ওর কাঁধে ঝুলানো গামছা এবং ওর শখের সুইস নাইফটা আমার হাতে তুলে দিল। আমি গামছা কেটে কেটে টুকরো কাপড় চাকু দিয়ে সজোরে কাঠের ফাঁকে গুঁজে দিতে থাকলাম। পুরো চারটে ফাঁক বন্ধ করতে আমার পনেরো মিনিটের বেশী লাগলো না। এদিকে তিন চার জনে একত্রে পানি সেচের কারণে ট্রলারের পানি কমে আসতে থাকলো। প্রায় পঞ্চাশ মিনিট শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় থাকার পর ট্রলারটি সুন্দরবন উপকূল বরাবর চলে এলো। তবে পানি কম বলে একেবারে পাড়ে ভিড়তে পারলো না। আমি পরম করুণাময় আল্লাহতালার প্রতি শোকরগুজার করে স্বল্প পানিতে নামার প্রস্তুতি নিতেই একজন স্বেচ্ছাসেবক জোর গলায় বললো এখানে নামবেন না কারণ গত কয়েকদিনে এখানে থেকে দুইজন মানুষকে বাঘে নিয়ে গেছে। আমি ভয় না পেলেও পা গুটিয়ে ট্রলারেই বসে রইলাম।

এদিকে উপ-মহাসচিব আকরাম ও পরিচালক এমদাদ হোসেন দারুণভাবে ভয় পেয়েছেন তা তাদের চোখে মুখে এখনো বিদ্যমান। আইয়ুব মল্লিক সটান বিছানায় উপর হয়ে পড়ে রয়েছেন দেখতে পেলাম। আমি তাঁদের সবাইকে আশ্বস্ত করে বললাম যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, আর পানি উঠবে না।

আকরাম সাহেব বললেন, এই ট্রলার পরিবর্তন করো, এই ট্রলারে আর যাব না।

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে আমাদের ট্রলারে আর কোন সমস্যা নেই। আর এখানে কোন ট্রলারও পাওয়া যাবে না।

তবুও অন্য কোন ট্রলার পাওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্য বন্দুকসহ দুইজন স্বেচ্ছাসেবক পাড়ে নেমে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলো। সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা আমাদের মূল গন্তব্যের দিকেই এগিয়ে যাব কারণ কচিখালী ওখান থেকে মাত্র ঘন্টাখানেকের পথ। আমরা উপকূলের কাছাকাছি দিয়েই দক্ষিণ দিকে চলতে থাকলাম। এক পর্যায়ে একটা জেলে নৌকা দেখতে পেলাম কিন্তু তারা আমাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে একটা খাল বরাবর বনের ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর নেমে যাওয়া দুইজন স্বেচ্ছাসেবকদেরকে তুলে নিয়ে কচিখালী ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের ঘাটে পৌঁছুলাম। ওখানে গার্ডরা রাইফেল উঁচিয়ে আমাদেরকে চার্জ করলো এবং বললো যে কেন আমরা বিনা অনুমতিতে এখানে এসেছি?

আকরাম সাহেব উঠে ট্রলারের ডেকে দাঁড়িয়ে বললেন যে এখানকার ফরেষ্ট কনজারভেটরের সাথে কথা বলেই আমরা এখানে এসেছি এবং তিনি আমার ঘনিষ্ট জন। এই বক্তব্য শোনার পর তাঁরা আমাদেরকে বরণ করে নিলেন। আমরা আমাদের দুঃখের কাহিনী তাঁদেরকে শোনালাম। এরপর চাল গোস্ত মসল্লা মিশিয়ে একটা রান্না হলো। আমরা সবাই মিলে তা খেলাম এবং সুন্দরবনে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেখা না পেলেও এক দল ছুটন্ত হরিণ দেখে উল্লসিত হলাম। সূর্য হেলে পড়ার পর ট্রলারে উঠে পাথরঘাটার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। এমদাদ হোসেন পাথরঘাটার কর্মকর্তা সামসুল আলমকে নির্দেশ দিলেন এটা জানার জন্য যে কেন এমন একটি ত্রুটিপূর্ণ ট্রলার আমাদেরকে দেয়া হলো যেটি নিয়ে আমরা ডুবতে বসেছিলাম। শামসুল আলম বললো যে বিষয়টি আলাপ করে অবিলম্বে জানানো হবে। এরপর আমরা যখন পাথরঘাটায় ফিরে এসে পৌঁছুলাম তখন রাত আটটা বেজে গেছে।

এরপর ১৯৮৬ সালে কক্সবাজার, মহেশখালী, কুতুবদিয়ায় সম্মেলন অনুষ্ঠান করা হলো। তবে সকল থানাতে সম্মেলন করা সম্ভবপর না হলেও 'সোনার চর' নাটকটি মঞ্চায়ন করা হলো। নাটকটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে বিদেশী ডেলিগেটদের অনুরোক্রমে এর ইংরেজী ভার্সনও আমাকে তৈরী করতে হয়েছিল। নাটকটির চুরাশিতম মঞ্চায়নের হিসাব আমার কাছে ছিল, এরপর আরো দু একবার ইংরেজী ভার্সনে এর মঞ্চায়ন হয়েছিল।

পরবর্তী নানাবিধ কার্যক্রম

১৯৮৮ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন টিম লীডারেদের একটি সম্মেলনে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক গণসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনায় আসে। পর্যালোচনায় দেখা গেলো যে সিপিপি-র গণসচেতনতা কার্যক্রম সীমিত সংখ্যক মহড়ানুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সীমিত মানুষের এই কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নতুন একটা বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হলো। প্রস্তাবিত এনজিও-টির মূল কাজ হিসাবে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ও প্রশমন বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস চালাবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এনজিও-টির প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আমার কাঁধে বর্তালো।

একটা বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ১৯৯০ সালে 'এ্যাসোসিয়েশন ফর ডিজাষ্টার মিটিগেশন' (এডিএমডি) নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করা হলো। নতুন প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটির চেয়ারম্যান হিসাবে আমাকে মনোনীত করা হলো। ভাইস চেয়ারম্যান হলেন নাসির উল্লাহ এবং ইকবাল আঃ রহিম কাজী, ট্রেজারার হলেন এ জে এম গোলাম রাব্বানী এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন লুৎফুল মতিন। নির্বাহী কমিটির অপর সদস্যবৃন্দ হলেন ডেইজী সুলতানা, আলেয়া ফেরদৌসী, হাফিজ মনসুর এবং শফিকুল ইসলাম। এডিএমডি ১৯৯৩ সাল থেকে কাজ শুরু করলো। এনজিও পরিচালনা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে প্রথম দিকে কিছুটা অসুবিধা হলেও সত্বরই সকল সমস্যা অপসারিত হলো। আমাদের উদ্দেশ্য ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি হলেও কর্ম পরিকল্পনায় আনুষঙ্গিক বহুবিধ কাজ নিয়ে সামনে এগুতে হলো।

পটুয়াখালী জেলার তদানীন্তন বৃহত্তর গলাচিপা থানার বড়বাইজদিয়া, ছোটবাইজদিয়া, মৌডুবী, রাঙ্গাবালী, চালিতাবুনিয়া, চর মোন্তাজ, চর কাজল, চর বিশ্বাস এবং কলাপাড় থানার লালুয়া ও লতাচাপলী ইউনিয়নসমূহে মহিলা ও পুরুষ সমতা বিধান করে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট ফোরাম ও সাত সদস্য বিশিষ্ট ফোরাম কমিটি গঠন করে কার্যক্রম শুরু হলো। এই সকল কার্যক্রমের মধ্যে জীবন-জীবিকার উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কাজ সন্নিবেশিত থাকলেও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিতে গণসচেতনতা বৃদ্ধির কাজটি ছিল মুখ্য।

ফোরামের সদস্যদেরকে দুর্যোগ প্রস্তুতি, সন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসাসহ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান, গ্রামীণ মেলার আয়োজন করা, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে স্কুল সাইক্লোন স্কোয়াড গঠন, গ্রামীণ মহিলাদেরকে নিয়ে উঠান বৈঠক, জেলেদের প্রশিক্ষণ, এলাকার ইমাম ও স্কুল শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ঘূর্ণিঝড়ের মহড়া, গীতিনাট্য অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঐ ইউনিয়নসমূহের বিশাল জনগোষ্ঠীকে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ও প্রশমন বিষয়ে সচেতন করা হলো।

কলাপাড়ার কুয়াকাটাতে ২০০০ সালে এডিএমডি এর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। লোকসঙ্গীত অনুষ্ঠান এডিএমডি এর উল্লেখযোগ্য একটি কাজ ছিল। পটুয়াখালীর কাউছার বয়াতীকে সাথে নিয়ে নতুন নতুন গান রচনা করে একটি শক্তিশালী গানের দল গঠন করা হলো। এরপর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তা পরিবেশন করা হলো।

কাউছার বয়াতীর মৃত্যুর পর পটুয়াখালীর মাজেদ বয়াতীর দলকে নিয়ে আবার একটা গীতিনাট্য তৈরী করা হলো। এই গানের দল গলাচিপা, কলাপাড়া, আমতলী, তালতলী ইত্যাদি থানার বিভিন্ন জায়গায় গান পরিবেশন করে একটা বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ও প্রশমন বিষয়ে জনমানুষকে সচেতন করতে সমর্থ হলো। মাজেদ বয়াতীর ঐ গানের দল পরবর্তীতে সিপিপি-র সাংস্কৃতিক অঙ্গ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়।

গীতিনাট্যটি এমনভাবে রচনা করা হয়েছিল যে তাতে গানের সাথে নাটকের অংশও সংযোজন করা হয়েছিল। এডিএমডি এর এই গীতিনাট্যটি মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। এডিএমডি এর এই মহতী কাজের সাথে প্রথম পর্যায়ে যারা জড়িত ছিলেন তারা হলেন চর মন্তাজের মোঃ হানিফ, বড় বাইজদিয়ার আসাদুজ্জামান বাবুল ও ফারুক হোসেন, ছোট বাইজদিয়ার বশির আহমদ শরৎ ও কামরুন্নাহার, চর বিশ্বাসের মোজাফ্ফর হোসেন, চর কাজলের রফিকুল ইসলাম, মৌডুবীর কামরুল হাসান, চাইলতাবুনিয়ার জাহাঙ্গীর হোসেন, ললুয়ার হেমায়েত উদ্দিন, লতাচাপলীর শফিকুল আলম প্রমুখ। পরিতাপের বিষয় যে, ২০১৫ সালের পর প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবসহ একাধিক কারণে এডিএমডি এর এই কার্যক্রম স্থগিত অবস্থায় রয়েছে।

এরপর **১৯৯১** সালের ২৯ এপ্রিল এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে বয়ে গেল এবং প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষের প্রাণহানী ঘটলো।

এই ঘূর্ণিঝড়ের সময় সংকেত প্রচারে তেমন বড় কোন ত্রুটি না থাকলেও পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থলের অভাবেই বেশীরভাগ মানুষ প্রাণ হারালো। এই ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রাম কক্সবাজার অঞ্চলের ২৩ জন নিবেদিতপ্রাণ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক কর্মরত অবস্থায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আবারও প্রমাণ করলেন যে মানবতার সেবায় তাঁরা কতটা নিষ্ঠাবান।



১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে নিহত স্বেচ্ছাসেবকদের পরিবারের মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম (অব:) এম.পি। পাশে দণ্ডায়মান হারুন আল রশিদ, পিডার ড্যাম, এ এস এম আকরাম, বিয়োন এ্যাডার ও ফজলুল ওহাব।

এই ঘূর্ণিঝড়ের পর মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা ও জরিপের পর বেশ কয়েকটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছিল যার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে বহুসংখ্যক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হলো।

WMO-ESCAP Pannel on Tropical Cyclone এর কর্তৃক আয়োজিত ১৯৭৬ সালে দিল্লিতে এবং ১৯৯৯ সালে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সভায় আমি অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই। ঐ সভাগুলোতে বিভিন্ন আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত প্রচার বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সক্ষমতা এবং দুর্বলতা ইত্যাদি যাচাই বাছাই করা হয়, স্যাটেলাইট ব্যবহার, যন্ত্রপাতির যোগান ও ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ব্যবহারিক বিভিন্ন মডেলের উন্নয়ন নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। ঐ প্যানেলে আমরা সিপিপি-র অগ্রগতির কথা এবং আবহাওয়া দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত সময়োচিত আগাম সংকেতের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছি।

স্যাটেলাইট বা রাডার থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি স্বল্প সময়ের মধ্যে সিপিপি কিভাবে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে অগণিত মানুষের জীবন রক্ষায় ভূমিকা রাখছে সে সকল কথা শুনে আবহাওয়াবিদ ও প্যানেল সদস্যরা একাধারে যেমন বিস্মিত হয়েছেন অন্য দিকে সিপিপি-র কর্মতৎপরতার সাথে তাঁদের কাজের একটি সুদৃঢ় সেতুবন্ধন দেখে তাঁরা উল্লসিতও হয়েছেন।

সিপিপি-র উপ-পরিচালক থাকাকালীন আইএফআরসি-এর আমন্ত্রণে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০০০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত চীন দেশে ফ্লাড রিলিফ ডেলিগেট হিসাবে কর্মকান্ড পরিচালনা জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়। এই মিশনটি প্রাপ্তির জন্য সোসাইটির তৎকালীন মহাসচিব আলী হাসান কোরাইশীর অবদান আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। আমার অগোচরে তিনি জেনেভা রেড ক্রসের সদর দপ্তরে চীন দেশে ফ্লাড রিলিফ মিশনে আমার অন্তর্ভূক্তির জন্য জোরালো ভূমিকা পালন করেন।

আল্লাহতালার অসীম রহমতে চীন দেশে ফ্লাড রিলিফ মিশনটা আমার ভাগ্যে জোটে। জেনেভাতে ব্রিফিংয়ের পর আমি বেইজিং পৌঁছি। হুবেই, আনহুয়ী, হুনান, লাইওনিং এবং ইউনান প্রদেশসমূহ আমার কাজের আওতাভূক্ত করে দেওয়া হয়। অবশ্য ইউনান প্রদেশের কুমনিং এবং লাইওনিংয়ে ভূমিকম্প পরবর্তী অবস্থা নিরূপণ ও ত্রাণ কাজ সম্পাদনই ছিল সেখানে অবস্থানের মূখ্য উদ্দেশ্য।

চীনে কর্মসম্পাদনের সময় আমার সহকর্মীগণ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের গল্প শুনে আশ্চর্য হয়ে আমাকে নানারকম প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তুলেছিল। হুবেই প্রদেশের ওহান রেড ক্রসের ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল মিসেস ইউয়ান জিং উল্লাস প্রকাশ

করে বললেন যে কখনো সময় পেলে তিনি শুধুমাত্র সিপিপি দেখতে বাংলাদেশে যাবেন। চীন দেশে আমার অবস্থান ও কর্মতৎপরতা বড়ই বৈচিত্রময় ছিল।

চীনে আমার মিশন শেষ করে ফিরে আসার কিছুদিন পর পদোন্নতি পেয়ে আমি সিপিপি-র পরিচালক (অপারেশন) পদে যোগদান করি এবং পরবর্তী সময়ে পরিচালক (প্রশাসন) হিসাবেও কর্ম সম্পাদন করি।

২০০১ সালে ভারতের গুজরাটে সংঘটিত ভূমিকম্পের পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত একটি 'এ্যাসেসমেন্ট টিম' এর সদস্য হিসাবে গুজরাটে কর্ম সম্পাদন করি।

২০০২ সালে আমাকে সিপিপি থেকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক হিসাবে বদলী করা হয়।

২০০৩ সালের নভেম্বরে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের 'জেনারেল এ্যাসেম্বলী'-তে যোগদান করি।

২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে সুনামী আঘাত হানার পর আইএফআরসি কর্তৃক গঠিত 'র‍্যাপিড এ্যাসেসমেন্ট টিম' এর একজন সদস্য হিসাবে শ্রীলংকায় মাসাধিককাল কাজ সম্পাদন করি।

অতঃপর ২০০৫ সালের জুন মাসে আইএফআরসি-এর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ডেলিগেট হিসাবে ইন্দোনেশিয়াতে সুনামী পরবর্তী কর্ম সম্পাদনের জন্য বান্দা আচেতে যোগদান করি।

এরপর ২০০৮ সালের জুন মাসে ইন্দোনেশিয়ায় কর্মরত ডেনিশ রেড ক্রসের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ডেলিগেট হিসাবে যোগদান করি এবং ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে মিশন শেষ করে ঢাকায় ফিরে আসি। ডেনিশ রেড ক্রসের মিশনে আমার কর্ম-এলাকা ছিল সুমাত্রা দ্বীপের চালান জেলার সন্নিকটে টুনাম নামের ছোট্ট একটি শহরের পার্শ্ববর্তী ও সমুদ্র তীরবর্তী চৌদ্দটি গ্রাম। সুনামীতে ঐ সকল গ্রামের সকল প্রকার স্থাপনা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। দুর্যোগ প্রশমনমূলক নানাবিধ কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মানুষের বিপদান্নতা হ্রাস করাই ছিল আমার মিশনের উদ্দেশ্য। ইন্দোনেশিয়া মিশন থেকে ফিরে আসার পর আমি আর বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে যোগদান করিনি কারণ এর পূর্বেই আমি অবসর গ্রহণ করেছিলাম।

সিপিপি-র প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কিছু কথা

আমার কর্মজীবন বৈচিত্রময় বলে আমি মনে করি। কখনো বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ, কখনে প্রশিক্ষণ প্রদান কখনো বা রিসোর্স পারসন হিসাবে আমি বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেছি। তবে যেখানেই গেছি সেখানেই সিপিপি-র কথা বলতে ভুল হয়নি। রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন। মানব সেবার আন্দোলন। আর এই অন্দোলনের মধ্যমণি হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবকেরা।

তবে প্রাসঙ্গিকতার যুক্তি টেনে নিয়েই বলছি যে বিশ্বের কোটি কোটি স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে তুলনা করলে সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবকদের স্বরূপ ও অবস্থান আলাদা একটা পর্যায়ে সমাসীন। কোন কোন সময়ে হেগস্ট্রমের মতো আমারও মনে হয়েছে যে চরম প্রতিকূল পরিবেশের বাস্তবতার মধ্যেও অবলীলায় তাঁরা যে কর্ম সম্পাদন করে তা কোন অপার্থিব প্রেরণার দ্বারা লালিত।

স্বেচ্ছাসেবককেরা কেন বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে তা সবিস্তারে জানার একটা কৌতুহল আমার চাকুরি জীবনের শুরু থেকেই ছিলো। দীর্ঘ চাকুরি জীবনে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক গল্পচ্ছলে আমাকে বলেছিলেন যে স্বেচ্ছাসেবা আমাদের



সিপিপি কর্মকর্তা ও থানা টিম লীডার বার্ষিক সম্মেলন

ধর্মের একটি অনুশাসন। অতীত কালে যে সকল ধর্ম প্রচারক ও সুফি সাধক আরব বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমাদের দেশে এসেছিলেন তাঁরাও স্বেচ্ছাসেবার মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন এবং স্বেচ্ছাসেবায় মানুষজনকে উৎসাহিত করেছেন। মানবসেবার মধ্যে করুণাময় আল্লাহতালার সন্তুষ্টি বিরাজমান তাতো সকলেরই জানা রয়েছে।

আসলে উপকূলীয় মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবার অনুপ্রেরণাটা ঐতিহ্যগত। সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের হওয়ায় স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করে থাকেন।

অন্যদিকে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট কর্মধারার মধ্যে সৃষ্টি হওয়াতে সিপিপি বিশ্বব্যাপী মানবসেবার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত, এটাও স্বেচ্ছাসেবকেরা সাতটি মূলনীতির পরিচর্যার কারণে ভাল করেই জানেন এবং গর্ববোধ করেন। সর্বোপরি, বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কর্মসূচিটি ভালবেসে অনুমোদন দিয়ে গেছেন সেটাও স্বেচ্ছাসেবকদের সার্বক্ষণিক প্রেরণার একটি উৎস।

সিপিপি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথভাবে পরিচালিত একটি সংস্থা হওয়াতে এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে এমন কিছু বিরল মূল্যবোধের সংমিশ্রণ ঘটেছে যা আপাতদৃষ্টিতে চোখে দেখা না গেলেও স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তরে তা বিরাজমান। বাংলাদেশ সরকার সিপিপিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে, অঙ্গীকার এবং সম্মানে ভূষিত করে এটাও স্বেচ্ছাসেবকদের একটি বিশাল প্রাপ্তি ও অনুপ্রেরণা।

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকেরা কাজ করে এ কথা আমরা সবাই বলি। তবে এটা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ার পর সাধারণত পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যে ক্রমান্বয়ে আবহাওয়ার অবনতি ঘটিয়ে পরিশেষে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে উপকূলে আঘাত হেনে থাকে।

এই দিনগুলোতে বৃষ্টি, বাদল ও ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের সার্বক্ষণিক কর্মব্যস্ত থাকতে হয় এবং ঘুম ও বিশ্রাম নেয়ার সময় থাকে না। ঝড় বৃষ্টির সময় সবাই যখন ঘরের ভেতরে থাকে তখন রেইন কোট ও লাইফ জ্যাকেট গায়ে চড়িয়ে সাংকেতিক যন্ত্রপাতি কাঁধে ঝুলিয়ে তাঁরা ঐ বৃষ্টি বাদলে ভিজে ভিজে অবিরাম কাজ করে যায়।

তাঁরা জানে যে, এ কাজে সামান্যতম ভুলও করা যাবে না কারণ বিষয়টি মানুষের জীবন নিয়ে খেলা, এখানে দায়িত্বের অবহেলা করার কোন অবকাশ নেই। এই রকমের কষ্টকর ও দুরন্ত প্রকৃতির কাজ তাঁরা করতে পারেন শুধুমাত্র তাঁদের অসামান্য মনোবলের জন্য; যার উৎস মানবসেবা ও মানবতার কল্যাণের সেই শাশ্বত দর্শন। তাই যদি না হবে তবে দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে কেন?

শুধুমাত্র ১৯৯১ সালের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে দায়িত্বরত অবস্থায় ২৩জন স্বেচ্ছাসেবক তাঁদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এই প্রমাণটি করে গেছেন যে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকেরা আর্ত-মানবতার সেবায় কাজ করে, অন্য কোন স্বার্থের জন্য নয়। কলাপাড়ার শাহ আলমের মতো স্বেচ্ছাসেবকরা প্রাণ গেলেও কর্তব্যে ফাঁকি দিতে জানেন না।

অনেকেই বলে থাকেন যে প্রশিক্ষিত একটি স্বেচ্ছাসেবক দলের নিরাপত্তার এমন কি ঘাটতি ঘটে যে তাদেরকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়?

এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর কাছে আগাম সতর্ক সংকেত পৌঁছে দেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদেরকে একবার নয় বারবার তাঁদের দোরগোড়ায় যেতে হয়। যখন অপসারণ নির্দেশ দেয়া হয়, বড় চ্যালেঞ্জটির উদ্ভব তখনি ঘটে। সাধারণত মহাবিপদ সংকেত প্রদানের পর অপসারণ নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে যখন ঝড়ো হাওয়ার আধিক্য ও প্রবল বৃষ্টিপাত থাকে। এই সময়টাতেই বিপদাপন্ন মানুষদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সংবাদ জানানো ও তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আবার স্বেচ্ছাসেবকদেরকে তাঁদের দোরগোড়ায় যেতে হয়।

ঐ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এমন দূরূহ কাজটি করতে যে সময়ের প্রয়াজন হয় তা অনেকসময় ঘূর্ণিঝড়ের মূল বাতাস বলয় ও জলোচ্ছ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়, ফলে স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রবল পানির তোড়ে নিজেদেরকে আর ধরে রাখতে পারেন না।

১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে কুতুবদিয়া, চকোরিয়া ও মহেশখালীতে এমন ঘটনাই ঘটেছিল। তা ছাড়া যে সকল দ্বীপাঞ্চল ও চর এলাকায় বেঁড়ীবাঁধ নাই সেখানেও স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তা ঝুঁকি বিদ্যমান।

সিপিপি-তে আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

এর মধ্যে প্রথমটি হলো, মানুষ যাতে পূর্বে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংস ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার কথা ভুলে না যায়। সিপিপি-র আগাম সংকেত প্রচার অর্থহীন হয়ে যাবে যদি মানুষ সময়োচিত সাড়া প্রদানে ব্যর্থ হয়।

মোট কথা হলো সংকেত প্রচার এবং উপকূলবাসীর সাড়া প্রদান এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য যত বেশী হবে ঘূর্ণিঝড়ে জীবনহানী ও ক্ষয়ক্ষতি ততটাই বেশী হবে। এই পার্থক্য কমানোর জন্য কার্যকরী ও বৈচিত্রপূর্ণ মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করে সারা বছরব্যাপী গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম চালাতে হবে।

দ্বিতীয়টি হলো, উপকূলীয় বেঁড়ীবাধের সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে যত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে তার নব্বই ভাগই জলোচ্ছ্বাস বা অপসারিত পানির মাত্রাতিরিক্ত উচ্চ প্লাবন ও সঞ্চালনের জন্য ঘটেছে। এই তথ্যটি কোন কেস ষ্টাডি বা সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত নয়, নিরেট বাস্তবতা। উপকূলীয় ভূক্তভোগীদের নিকট থেকেই এই তথ্য আমি জেনেছি।

সাগরের পানি আটকানোর জন্যই সারা উপকূলব্যাপী বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এই সকল বেড়ীবাঁধ মাটির তৈরী বিধায় কোন প্রকার ফাঁকফোকর পেলেই পানি প্রবেশ করে ওগুলোকে অতি সহজেই বিধ্বস্ত করে ফেলে এবং অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়ের সময় সাগরের পানি প্রবল বাতাসে অপসারিত হয়ে বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে বেড়ীবাঁধ তা আর ধরে রাখতে পারে না।

পৃথিবীর অনেক দেশ ভৌগলিকভাবেই সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতার নিচে অবস্থিত হলেও শুধুমাত্র শক্ত সামর্থ বাঁধের কারণে পানির তোড়ে তা ভাঙ্গতে বা বিনষ্ট হয়ে যায় না। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ও প্রশমনের ক্ষেত্রে আমাদের উপকূলীয় এলাকার বেড়ীবাধের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

তৃতীয়টি হলো, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। এটা অনস্বীকার্য যে, যে পরিমাণ আশ্রয়কেন্দ্র উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান তা ঘূর্ণিঝড়ের প্রাক্কালে সকল বিপদাপন্ন মানুষের আশ্রয়ের সংকুলান হয় না। প্রায় ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয় না বিধায় এগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়।

এ সকল সমস্যার সমাধান কল্পে উঁচু ভিটায় ঝড় নিরোধক শক্ত পাকা ঘর তৈরীর একটা প্রকল্প গ্রহণ করে যেতে পারে। নির্দিষ্ট ডিজাইনের এ সকল শক্ত ঘর তৈরীর জন্য সুদবিহীন ঋণ প্রদান করা গেলে উপকূলীয় কয়েক লক্ষ পরিবার তা গ্রহণ করবে বলে ধারণা করা যায়। তিন থেকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমস্ত উপকূলব্যাপী এক লক্ষ শক্ত ঘর তৈরী হলেও নিজের পরিবার তথা আশেপাশের আরো দু একটি পরিবার ঐ ঘরে অবলীলায় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। এই ধরনের প্রকল্প চালু করা গেলে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ক বর্তমান সমস্যা বহুলাংশে নিরসন হবে বলে আশা করা যায়।





বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

আমরা জানি যে, ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে ৫ লক্ষেরও অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিলেন যদিও এই সংখ্যাটি অনেকেই ১০ লক্ষের কথাও বলেন। ১৯৯১ সলের ঘূর্ণিঝড় ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। এরপর ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা, মোহছেন, কোমেন, রোয়ানা, মোরা, টিটিলী, ফনি, আম্ফান, ইয়াস ইত্যাদির মধ্যে বেশকয়েকটা ঝড় অতি প্রবল ঝড়ের প্রচণ্ডতা নিয়ে বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে। কিন্তু এটা একটা সৌভাগ্য ও আর্শ্চয্যের বিষয় যে ঘূর্ণিঝড়ে জীবনহানীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় এখন কতই না নগণ্য। বাস্তব ও দৃশ্যমান এই সাফল্যটা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে, আর তা করতে হলে উপরোল্লিখিত ন্যূনতম তিনটি উপাদানের কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

বিষয়টির অবতারণা করা হলো এই জন্য যে ১৯৭০ সালের অনুরূপ কোন অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় যদি ত্রিশ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস নিয়ে জনপদে আঘাত হানে তবে অবস্থাটা কেমন হবে তা ভাবতে হবে বৈকি? সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবকদের অগ্রীম সংকেত প্রচার শতভাগ বাস্তবায়িত হবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও এলাকার সকলেই কি নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার সুযোগ পাবে? আমরা কি নিশ্চয়তা দিতে পারবো যে অনেক এলাকার দুর্বল বেড়ীবাঁধ ডিঙ্গিয়ে সাগরের লোনা পানি জনপদে প্লাবন ঘটাবে না? আমরা না চাইলেও ভবিষ্যতে এমন কিছু যদি ঘটেই যায় তবে শতভাগ কাজ করার পরও সকল গ্লানি সিপিপি-র কাঁধে গিয়ে পরুক তা কিন্তু আমরা কেউ চাইবো না।



সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত 'গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম ফর ডিজাষ্টার রিস্ক রিডাকসন' সম্মেলনে লেখকের পোষ্টারের নিচে দণ্ডায়মান বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উপ-মহাসচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, আমেরিকান রেড ক্রসের বাংলাদেশের প্রতিনিধি মিঃ অচলা নাভোরত্নে এবং লেখক হারুন আল রশিদ

উপসংহার

আমার জীবনের একটা দীর্ঘসময় আমি সিপিপি ও রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। অবসর গ্রহণের পরও এই সংস্থা দুটির কোন কাজ করার ক্ষেত্রে আমি কখনো বিমুখ হইনি।

মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের পর ক্যাম্পগুলোতে সিপিপি প্রতিস্থাপনের জন্য আমি রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন, আমেরিকান রেড ক্রস ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করি এবং অদ্যাবধি কর্ম সম্পাদন করে চলেছি।

জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও যে আমি মানব সেবার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত থেকে কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পারছি সে জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতালার শুকরিয়া আদায় করছি এবং একই সাথে আমার কাজের মূল্যায়ন যারা করছেন তাঁদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিপিপিতে আমার দীর্ঘদিনের সংশ্লিষ্টতায় আমি আমার অনেক সহকর্মী ও হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের সান্নিধ্যে আসার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছি। সিপিপি-র সকল স্বেচ্ছাসেবক তাঁদের শ্রম, সময় ও মেধা দিয়ে সিপিপি-কে প্রতিষ্ঠিত করায় একজন সহযোগী হিসাবে তাঁদের সবার প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সিপিপি-র কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকগণ অনেকেই আজ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁদের নিষ্ঠা ও নিরলস কর্মতৎপরতার প্রমাণ সিপিপি-র ইতিহাস খুললেই খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁদের নিষ্ঠা ও ত্যাগের কথা নতুন প্রজন্মের স্বেচ্ছাসেবকেরা জানবে এবং অনুপ্রাণিত হবে এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে সিপিপি-র অতীত দিনের নিবেদিতপ্রাণ ও প্রাঞ্জল মানুষদের পরিচয় বের করে তাঁদের আদর্শের প্রতিফলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সিপিপি-র নিজস্ব একটি প্রদর্শনশালা বা আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা গেলে নিবেদিতপ্রাণ মানুষেরা কালের অতলে হারিয়ে গেলেও বর্তমান প্রজন্মের সবাই তাঁদের সম্পর্কে

জানতে পারবে এবং এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম একে অপরের সাথে সেতু বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারবে। আশা করি আমাদের এই প্রত্যাশারও উন্মেষ ঘটবে অচিরেই।

সিপিপি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পার হয়ে সংস্থাটি এর অগ্রযাত্রা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছে। সিপিপি এখন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থায় পৃথিবীর রোল মডেল। অনেক দেশই এখন সিপিপি-র অনুকরণে তাদের প্রস্তুতি ব্যবস্থা ঢেলে সাজাচ্ছে। বর্তমান সময়ে সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় সিপিপি পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ও সামর্থবান। সিপিপি ক্রমবর্ধমান ভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সাম্প্রতিক ভার্চুয়াল প্রক্রিয়াদির কল্যাণে দূরবর্তী কোন দ্বীপাঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবকরাও এখন যে কোন সময়ে সিপিপি সদর দপ্তরসহ অন্য স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে অতি সহজেই কার্যকরী যোগাযোগ রাখতে সমর্থ। সিপিপি-র এই অবিশ্বাস্য অগ্রযাত্রা আরো গতিময়তা লাভ করুক সেই কামনা সবার মতো আমিও অন্তরে লালন করি। সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবকেরা জীবন বাজী রেখে লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানোর ব্রত নিয়ে যে অনন্য কাজ করে চলেছে সেজন্য সিপিপি-কে কোনদিন নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করলেও তা যথেষ্ট হবে না বলে আমি মনে করি।



কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কর্মরত হারুন আল রশিদ



এ কে এম হারুন আল রশিদ

১৯৪৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রেড ক্রসের কাজে যোগদান করেন। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের ডেলিগেটদের সাথে নিয়ে এবং তাঁদের সাথে একাত্ম হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধাহত মানুষের জন্য সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের সহায়তায় তিনি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ঐ কর্মসূচিতে একাদিক্রমে ২৬ বছর কর্মসম্পাদনের পর তিনি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ এবং সমাজভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি বিভাগের পরিচালক হিসাবে দায়িত্বপালন করেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত হয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের ডেলিগেট হিসাবে চীন, ভারত, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন।

অবসর গ্রহণের পরও তিনি সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। বর্তমানে হারুন আল রশিদ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট, আমেরিকান রেড ক্রস ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বিতারিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শক হিসাবে কাজ করছেন।

ISBN: 0 00 000 000 0000